বুদ্ধদেব বসু

বিপন্ন বিস্ময়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

এই উপন্যাসের আদি লেখন নিম্নোক্তভাবে প্রথম প্রকাশিত হয় :

প্রথম খণ্ড — 'বিপন্ন বিস্ময়' নামে, ১৯৫৯-এর শারদীয় সংখ্যা 'উল্টো রথ'-এ।

দ্বিতীয় খণ্ড — 'শ্রীপতি ও আরতি' নামে, ১৯৬৮-এর শারদীয় সংখ্যা 'প্রসাদ'-এ।

গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে উপন্যাসটিতে বহু পরিবর্তন করেছি, কোনো-কোনো অংশ নতুন ক'রে লিখেছি। প্রথম খণ্ডের চতুর্থ ও দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদও নতুন।

বু. ব.

অমিয় দেব

স্নেহাস্পদেষু

উৎসাহদানের জন্য ধন্যবাদ

প্রথম খণ্ড

১

জুন মাসের এক বিকেলবেলায় শ্রীপতির ঘরে তার কয়েকটি বন্ধু হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়লো।

'তাহ'লে আছিস তুই! বাব্-বাঃ!' মোটা গলায় নিজের জানানি দিয়ে দুর্গাদাস এগিয়ে এলো ঘরের মধ্যে। 'শুয়ে আছিস যে? ঘুমুচ্ছিস?'

শ্রীপতি আগন্তুকদের দিকে একবার তাকালো, কিন্তু উঠে বসার কোনো লক্ষণ দেখালো না। পাজামা আর গেঞ্জি প'রে শুয়ে আছে সে, এক হাত কপালে রেখে। হাতটা কপাল থেকে সরালো না পর্যন্ত।

'বাঃ, কেমন সোঁদা-সোঁদা গন্ধ দিচ্ছে রে,' আবার কথা বললো দুর্গাদাস, 'ঘরটা ড্যাম্প মনে হচ্ছে? তা জানলা দুটো খুলে দে না—একটু আলো আসুক।' দুর্গাদাস নিজেই খটাখট শব্দে জানলা দুটো খুলে দিয়ে, শ্রীপতির তক্তাপোশের কাছে ফিরে এলো, কিন্তু কথা বলা মুহূর্তের জন্যেও থামলো না। '—আমরা গিয়েছিলাম সিনেমা দেখতে, তিনটে হাউসে টিকিট না-পেয়ে তারপর যে-কোনো একটায় ঢুকে পড়লাম—ফিল্মটা জঘন্য—শেষ পর্যন্ত ব'সে থাকাই গেলো না, অন্ধকারে বেরোতে গিয়ে বন্দনা আবার মস্ত মোটা এক ভদ্রলোকের পা মাড়িয়ে দিলে—ভদ্রলোক জুতো-টুতো খুলে আরাম ক'রে ব'সে ছিলেন—হঠাৎ ইঁদুরের মতো গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, শুনে আমার এমন হাসি পেলো—হাঃ—হাঃ—'

ঘটনাটা মনে ক'রেই দুর্গাদাসের এমন হাসি পেয়ে গেলো যে সে-হাসি আর থামলো না; কথা থামাতে হ'লো। ভালো ক'রে

হাসবার জন্য কোমরে হাত দিয়ে বেঁকে দাঁড়ালো সে, শ্রীপতি তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো।

বন্দনা, ফর্শা চেহারার ছিপছিপে মেয়েটি, কাছে এসে বললো, 'ওর কথা বিশ্বাস করবেন না, শ্রীপতি—সব বানিয়ে বলছে। আমি একবার হোঁচট খেয়েছিলাম শুধু—আসলে "শুধু" নয়, প্রায় প'ড়ে যাচ্ছিলাম, হিমেন্দু আমাকে পেছন থেকে ধ'রে ফেললে—আর তা-ই থেকে এতখানি বানিয়ে নিয়েছে ঐ হতভাগা। আসতে-আসতে বাস্-এই বানাচ্ছিলো আর বলছিলো, "গিয়ে এটা শ্রীপতিকে খুব জমিয়ে বলা যাবে—আঃ!"—আর ঐ দেখুন, লজ্জাও নেই, এখনো হাসছে। ঠিক বলছি কিনা জিগেস করুন হিমেন্দুকে—কলকাতাসুদ্ধু সবাই জানে যে হিমেন্দু তালুকদার কখনো ঠাট্টা ক'রেও মিথ্যে বলে না!'

'অঃ!' একটু অবজ্ঞার আওয়াজ করলো দুর্গাদাস, 'যা একখানা ব্যাপার, তা সত্যি হ'লেই বা কী, আর মিথ্যে হ'লেই বা কী! আজ দুপুরবেলার সিনেমায় বন্দনা সেন হোঁচট খেয়েছিলেন, না এক ঘাড়-ছাঁটা ভদ্রলোকের পা মাড়িয়ে ছিলেন তা নিয়ে গবেষণা করার মতো ঐতিহাসিক কেউ জন্মাবে ব'লে তো মনে হয় না!' ঠোঁট কুঁচকে হিমেন্দুর দিকে একবার আড়চোখে তাকালো দুর্গাদাস, তারপর হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বলতে লাগলো, 'তা, শ্রীপতি, তোর খবর কী বল তো? কতদিন হ'য়ে গেলো তোকে কফি-হাউসে দেখি না, "সুনন্দা"য় দেখি না, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দেখি না—হয়েছে কী তোর? আর আচ্ছা ভদ্রতা শিখেছিস তো, আমরা এই রোদ্দুরে তেতে-পুড়ে তোর কুশলচিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ছুটে এলাম, আর তুই কিনা শুয়েই আছিস। ওঠ—বসতে দে আমাদের।'

'বোস তাহ'লে।' শ্রীপতি আস্তে-আস্তে উঠলো; গায়ে একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে চেয়ার এগিয়ে দিলো বন্ধুদের। নিজে তক্তাপোশে ব'সে ঝাপসাভাবে বললো, 'বন্দনা, হিমেন্দু—আপনারা বসুন।'

ঝুপ ক'রে শ্রীপতির পাশে ব'সে পড়লো দুর্গাদাস, চারমিনার বের

করলো পকেট থেকে, কিন্তু শ্রীপতি হাত নেড়ে তা ফিরিয়ে দিলো।
'সে কী! খাবি না?'

'ছেড়ে দিয়েছি।'

'ছেড়ে দিয়েছিস—কবে থেকে? কী মুশকিল—তুই না-খেলে আমার চলবে কী ক'রে? এই দ্যাখ—ঠিক ছুটো আছে আর, এদিকে পকেট ফাঁকা—ভেবেছিলাম তোর ওপরেই চালিয়ে দেবো আজকের মতো, তা তুই—ছেড়ে দিলি এর মধ্যে!' হঠাৎ, একটু থেমে, শ্রীপতির মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে হুর্গাদাস বললো, 'তোর হয়েছে কী? অসুখ?'

'না, অসুখ করেনি। আমি হঠাৎ একটা আবিষ্কার করেছি।'

'কী আবিষ্কার?'

'যে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে শুয়ে থাকা।'

হুর্গাদাসের হাসির শব্দে ঘর ফেটে পড়লো।

'ওঃ! যা বলেছিস এটা! গ্র্যাণ্ড! ক্যাপিট্যাল! মাস্টারপীস! তোকে একটা পুরস্কার দেয়া উচিত এর জন্যে!'

পাশাপাশি ছুটো বেতের চেয়ারে ব'সে ছিলো হিমেন্দু আর বন্দনা; মেঝেতে প'ড়ে-থাকা খবর-কাগজের ছুটো আলাদা পাতা টেনে নিয়ে বন্দনা দেখছিলো খেলার খবর, আর হিমেন্দু চাকরির বিজ্ঞাপন; হাসির শব্দে তু-জনেই মুখ তুললো, কিন্তু কেউ কারো দিকে তাকালো না। 'কী? কী হয়েছে?' বাঁশির মতো আওয়াজে বন্দনা ব'লে উঠলো, 'কী বলেছে শ্রীপতি? আমি শুনবো।'

'শ্রীপতি একটা বিরাট আবিষ্কার করেছে। শুয়ে থাকাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ।'

কথাটা শুনে বাঁকা হাসি ফুটলো হিমেন্দুর ঠোঁটে। তার চোখে চশমা, গায়ের রং ফ্যাকাশে, নিচু গলায় কথা বলে। এতক্ষণে প্রথম কথা বললো সে, 'আপনি কাজেও তা-ই করছেন?'

'আপনারা দেখলেন তো এসে,' তক্ষুনি জবাব দিলো শ্রীপতি।

'আজ সকাল থেকে শুয়ে আছি, কাল সারাদিন তা-ই ছিলাম, 'পরশুও তা-ই, আর তার আগের দিনও তা-ই। শুয়ে-শুয়ে অনেক কথা ভেবেছি। কিছু করতে গেলেই চেষ্টার দরকার হয়, আর চেষ্টা জিনিশটাই কুৎসিত। পাহাড়ে চড়া থেকে চায়ের পেয়ালা মুখে তোলা পর্যন্ত এমন কোনো কাজ নেই, যার পেছনে চেষ্টা খাটাতে না হয়। আর চেষ্টা মানেই নিজেকে ভুলে যাওয়া, জগৎকে ভুলে যাওয়া, সব-কিছু ভুলে থাকা। সেই নারদ মুনির গল্প আছে না?—কৃষ্ণ তাঁর হাতে একভাঁড় তেল দিয়ে বলেছিলেন, "এটা নিয়ে ত্রিভুবন ঘুরে এসো, কিন্তু দেখো একফোঁটাও তেল যেন না পড়ে।" মুনি ত্রিভুবন ঘুরে এলেন, একফোঁটা তেলও পড়লো না, কিন্তু এতখানি সময়ের মধ্যে একবারও কৃষ্ণকে মনে পড়লো না তাঁর—আর তিনি হলেন গিয়ে সাধকশ্রেষ্ঠ, ভক্তচূড়ামণি! তবেই বোঝো কাজ ব্যাপারটা কী কদর্য!' আস্তে একবার হাসলো শ্রীপতি, তার দাঁতের সারি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো। তার শরীরের গড়ন নড়বড়ে-মতো, রোদে-পোড়া ধরনের গায়ের রং, কিন্তু চোখ দুটি গভীর। বয়সে অন্যদের চাইতে কিছু বড়োই হবে—সাতাশ, কি আটাশের কাছাকাছি, দেখতে আরো বেশি মনে হয়।

হিমেন্দু নিচু গলায় বললো, 'তাই আপনি স্থির করেছেন যে কিছুই করবেন না—শুধু শুয়ে থাকবেন?' বন্দনা পাশে থাকার জন্যে শ্রীপতিকে সোজাসুজি দেখতে পাচ্ছিলো না হিমেন্দু, ঘাড় বেঁকিয়ে তার দিকে তাকালো।

'শুধু শুয়ে থাকবো। ভারি আরাম, জানেন, আর ভারি—পবিত্র। "বড়ো ব্যস্ত আছি"—এই কথাটা প্রতিদিন কত লক্ষ বার উচ্চারিত হচ্ছে ভাবুন তো। বন্ধু তিন মাস ধ'রে অসুখে ভুগে-ভুগে মারা গেলো, একবার তাকে দেখতে যাওয়া হলো না—ব্যস্ত ছিলাম। বিধবা মাসি চিঠি লিখলে তার ছেলেটাকে কোথাও ঢুকিয়ে দিতে পারি কিনা—নয়তো আর চলছে না—জবাব দিতে ভুলে

গেলাম, এত ব্যস্ত। রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম এক বাচ্চা ছেলেকে একটা ষণ্ডামার্ক লোক বেদম মারছে—তিন সেকেণ্ডও দাঁড়ালাম না সেখানে—ব্যস্ত। বাস্-এ চলেছি—এক গেঁয়ো বুড়ি টালিগঞ্জে যাবার জন্য চিৎপুরের বাস্-এ উঠে ব'সে আছে—কণ্ডাক্টার তাকে এস্প্লানেডে নামিয়ে দিলে—কিন্তু বাস্-এর অতগুলো লোকের মধ্যে কেউ নেমে গিয়ে তাকে ঠিক বাস্-এ তুলে দিলে না—যদিও সকলেই বুঝলো যে হয়তো আর পয়সা নেই বুড়ির, হেঁটে-হেঁটেও পৌঁছতে পারবে কিনা সন্দেহ, হয়তো চাপাই পড়বে রাস্তা পার হ'তে গিয়ে—এত ব্যস্ত সবাই। অথচ এরাই—মানে এই আমরাই—পাঁচ টাকা, পঞ্চাশ টাকা কি পাঁচশো টাকা বাড়তি পেলেই দিব্যি স্বচ্ছন্দে সব-কিছুরই সময় পাই—তা পাই ব'লেই অন্য কিছুর আর সময় থাকে না। যদি এমন আইন থাকতো যে কোনো বুড়িকে রাস্তা পার ক'রে ঠিক বাস্-এ তুলে দিলে পাঁচ সিকে পারিতোষিক দেয়া হবে—'

'উঃ!' বন্দনা সেই কাগজটাকেই উল্টে-পাল্টে দেখছিলো এতক্ষণ, হঠাৎ সেটা ছুঁড়ে ফেলে ব'লে উঠলো, 'বড্ড খিদে পেয়েছে আমার।'

বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়ালো হিমেন্দু। '—যাবে এখন? যেতে চাও?'

'গেলে হয়। মাথাটাও ধ'রে উঠলো এইমাত্র।' বন্দনা ন'ড়ে উঠলো, যেন উঠে দাঁড়াবে, কিন্তু দুর্গাদাস মাথায় টোকা দিয়ে তাকে বসিয়ে দিলে।

'আরে বোসো, বোসো, "সুনন্দা"র মীটিঙে যাবে না, সে কী হয়? আজ খুব জোর হবে শুনেছি। তা শ্রীপতি—ও-রকম কোনো আইন থাকলে আমি তো রোজ দশ বার ক'রে বুড়ি পার করতাম, সত্যিকার বুড়ি পাওয়া না-গেলে মনে-মনে বানিয়ে নিতাম কাউকে। বেশ হ'তো। কী জানিস—বন্দনা খুব একটা খাঁটি কথা বলেছে,

একেবারে লাখ কথার এক কথা—মাঝে-মাঝে খিদে পায় যে। তুই কি খিদে পেলেও শুয়ে থাকছিস?'

'কাল রাত্রে আমার ভালো ঘুম হয়নি—' শ্রীপতি এমনভাবে বলতে লাগলো যেন দুর্গার কথাটা কানেই যায়নি তার, বা সেই কথারই উত্তর দিচ্ছে—'অনেকবার উঠেছি, অনেকবার জল খেয়েছি। আর, বেশি জল খেলে যেখানে যেতে হয় সেখানেও যেতে হয়েছে মাঝে-মাঝে। জানিস তো, আরশোলা দেখলেই আমি হিংস্র হ'য়ে উঠি; ঐ জঘন্য জীবটাকে জুতোর তলায় চেপ্টে বধ ক'রে একটি অনাবিল আনন্দ অনুভব করি। তা প্রথম বার গিয়ে দেখি, বাথরুমে প্যানের গায়ে, নোংরা জলের ঠিক গা ঘেঁষে, একটি পুষ্ট খয়েরি রঙের আরশোলা অবস্থান করছে—মাঝে-মাঝে শুঁড়গুলো নড়ছে তার—বেশ পরিতৃপ্ত চেহারাটি দেখলাম—আমার মনে হ'লো ঐ জায়গাটা তার প্রধান ভাঁড়ার ঘর। আমি ফ্লাশ টানলাম, তোড়ে জল এলো, আরশোলাটা পাগলের মতো কিলবিল ক'রে হাবুডুবু খেলো—ভারি মজার দেখতে—একটু সময় তাকে আর দেখা গেলো না, ভাবলাম এতক্ষণে নিশ্চিন্তে পাতালে পৌঁচেছে—কিন্তু ও হরি! জল স'রে যেতেই দেখি, যায়নি তো—ঠিক তেমনি আছে, পেছল বাটিতে মাছির মতো আটকে আছে, নোংরা জলের গা ঘেঁষে, শুঁড় নেড়ে-নেড়ে পথ্য চেটে নিয়ে মোটা হচ্ছে। আশ্চর্য—ওরা কি জলে ডোবে না?—নেংটি ইঁদুর হ'লে ম'রে যেতো ঐ জলে। ঘরে ফিরে ঘুমের চেষ্টা করলাম—বৃথা চেষ্টা—ঘণ্টাখানেক পরে আবার বাথরুম। এবারেও সেই আরশোলা—ঠিক সেই একই জায়গায়! আমি ফ্লাশ টানলাম—কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে আবার—তেমনি জলের ঘূর্ণি, যদি হঠাৎ পঞ্চাশটা বড়ো-বড়ো সমুদ্রের ঢেউ অনবরত আমার ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায় তাহ'লে আমার যা অবস্থা হবে আরশোলার অবস্থাও ঠিক তা-ই;—কিন্তু দু-বারই দেখলাম বেশ বহাল-তবিয়তে টিকে আছে সে, মূর্ছা গেছে বা ক্লান্ত হয়েছে এমন কোনো লক্ষণও

দেখলাম না। এবারেও ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু এর পরে যখন বাথরুমে যেতে হ'লো মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে আরশোলাটা এখনো যদি ওখানে থেকে থাকে—'

বন্দনা শ্রীপতির দিকে মুখ ফিরিয়ে গালে হাত দিয়ে শুনছিলো তার কথা—হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না। আরশোলার গল্প বলছেন কেন?'

শ্রীপতি একটুক্ষণ বন্দনার দিকে তাকিয়ে রইলো; লক্ষ করলো তার গালের গোলাপি রং, কপালের মসৃণ আভা। তারপর দুর্গাদাসের দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ছেড়ে বললো, 'কিন্তু পারলাম না। আমার যেন খুন চেপে গেলো মাথায়—গুমোট বাথরুমে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তিন, চার, পাঁচ বার ফ্লাশ টানলাম পর-পর—কিন্তু ঐ ক্লেদাক্ত নিঃশব্দ জন্তুটা যেন অমর। এক-একবার মনে হয় দম ফুরিয়েছে ওটার, মিনিটখানেক পরেই আবার শুঁড় ন'ড়ে ওঠে—একটু দুর্বলভাবে, তা ঠিক, কিন্তু ন'ড়ে তো ওঠে, সে যে বেঁচে আছে তার বিজ্ঞাপন দিতে ভোলে না! কী অদ্ভুত জীব—একবার বলে না, "আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি, আমাকে মারতে চাও কেন?" একবারও তেড়ে আক্রমণ করে না আমাকে, মুখে কোনো ভয়, কষ্ট, যন্ত্রণা ফোটে না—কী অদ্ভুত! চোখ নেই, মুখ নেই, মনে হয় যেন বোধ বা আত্মাও নেই—শুধু এক টুকরো প্রাণ—বোবা, অন্ধ, মূঢ়, অমর, বীভৎস প্রাণ—শুধু প্রাণ! আমার ইচ্ছে করলো ঐ প্যানের গায়েই লাথি মেরে শেষ করি ওটাকে, ওকে বধ করার জন্য আমিও নেমে যাই ঐ নোংরার মধ্যে—কিন্তু ঘেন্না করলো, ভগবানের কথা ভেবে বড্ড ঘৃণা হ'লো আমার।' বলতে-বলতে ঠোঁটে ফেনা উঠে এলো শ্রীপতির, জামার হাতায় ঠোঁট মুছে সে চুপ করলো।

'এর মধ্যে আবার ভগবান এলেন কোত্থেকে? কী বলছেন আপনি? হিমেন্দু, এই গল্পটার অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দাও।'

বন্দনার মুখের দিকে তাকিয়ে হিমেন্দুর স্বভাবত গম্ভীর মুখ আরো

গম্ভীর হ'লো। হয়তো একটু পরে সে কিছু বলতো, কিন্তু দুর্গাদাস হঠাৎ বন্দনার পাশে ব'সে বললো, 'এর অর্থ আর কে না বোঝে?—তা শ্রীপতি, তুই কি সত্যি এই তিন দিন ধ'রে না-খেয়ে আছিস?'

'ব্যস্ত—ঐ একটা কারণেই পৃথিবীর লোক ব্যস্ত! মাষ্টার, কেরানি, চাষি, মজুর, দালাল, উকিল, চাকুরে, শেয়ার-বাজারের রাজা-উজির থেকে শেয়ালদার ভিখিরি পর্যন্ত—সকলেরই ঐ এক কাজ, এক চিন্তা, এক ধ্যান—সকলেই বাঁচতে চায়, আঁচড়ে, কামড়ে, ছেঁচড়ে, কাৎরে, ছটফট ক'রে, কিলবিল ক'রে, নর্দমা ঘেঁটে, বিষ্ঠা চেটে—যেমন ক'রে হোক, সম্ভবপর শেষতম মুহূর্তটি পর্যন্ত বাঁচতে চায়; প্রথমে নিজে বাঁচতে, তারপর নিজেরই মতো আরো কতগুলো জন্তু ছড়িয়ে দিতে পৃথিবীতে। সেইজন্যই প্রত্যেকবার বাস্ থামা মাত্র ভিখিরি হাত বাড়িয়ে বিকট স্বরে ককিয়ে উঠছে, আর কোম্পানির ডিরেক্টর মশাই এরোপ্লেনে সাত রাজ্যি সফর করছেন। সময় নেই—কারোরই সময় নেই। বাঁচার জন্য অনবরত এই চেষ্টা করতে গিয়েই অনবরত ভুলে থাকতে হচ্ছে আমরা বেঁচে আছে। যদি সত্যি আমরা বুঝতাম যে বেঁচে আছি, যদি বুঝতাম কী আশ্চর্য এই জীবন, কী অফুরানভাবে অমূল্য, তাহ'লে কি কেউ কখনো পারতাম মিথ্যে বলতে, চুরি করতে, অন্যকে বঞ্চিত করতে, কখনো একটা রূঢ় কথা ব'লেও কারো মনে ব্যথা দিতে পারতাম কি? জানিস দুর্গা, আজ সারাদিন শুয়ে-শুয়ে ভাবছিলাম, এই সংসারে এমন কোনো কাজ আছে কিনা, যাতে চুরি নেই, জোচ্চোরি নেই, মিথ্যা নেই, যাতে ঠকতেও হয় না, ঠকাতেও হয় না, হ'তে হয় না অপমানিত বা অপমানকারী, উৎপীড়িত বা উৎপীড়ক, ঈর্ষান্বিত বা ঈর্ষার লক্ষ্য—যেখানে সকলে মিলে-মিশে ভালোবেসে নির্মল হৃদয়ে কাজ করা যায়, মনে একরকম বুঝে মুখে অন্য রকম বলতে হয় না, কাউকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় না। বলতে পারো তোমরা, আছে এমন কোনো কাজ?'

'ও-রকম কোনো কাজ যারা খুঁজে পায় তাদেরই বোধহয় আমরা সাধু-সন্নেসি বলি,' হালকা হেসে জবাব দিলো হিমেন্দু। 'আর কখনো বলি কবি।'

'আর অন্যেরা? অন্য কোটি-কোটি, কোটি-কোটি মানুষ? যাদের একসঙ্গে পঞ্চাশজনকে কাজ করতে হবে? পঞ্চাশ, দু-শো, হাজার জনকে? আপিশে, কারখানায়, আদালতে, বাণিজ্যে, যুদ্ধে, রাষ্ট্রচালনায়? তারা জীবন ভ'রে মিথ্যাচরণ করবে, জোচ্চোরি করবে নিজের সঙ্গে আর অন্যের সঙ্গেও, এইটেই মেনে নিচ্ছো তাহ'লে? আর ঐ কবির কথা বলছেন—তাঁরই বা আহার জুটবে কোত্থেকে? সন্ন্যাসী বলছেন—কিন্তু সত্যি কি তিনি বনে গিয়ে বায়ুভক্ষণ ক'রে থাকবেন?'

'আপনি যা বলছেন সে-রকম কথা জৈন দর্শনে আছে শুনেছি,' বললো হিমেন্দু।

'জৈন? তা হবে—আমি ও-সব কিছু জানি না। তবে কোথায় একবার পার্শ্বনাথের কথা পড়েছিলাম—তীর্থংকর পার্শ্বনাথ।··· দাঁড়াও, মনে করি। হ্যাঁ—পার্শ্বনাথ দেখলেন প্রাণীহত্যা না-ক'রে বেঁচে থাকা যায় না। আমরা মাটিতে একবার পা ফেললে কত ক্ষুদ্র কীট ধ্বংস হ'য়ে যায়। একবার হাত নাড়লে বিনষ্ট হয় কে জানে বাতাসে কত অদৃশ্য জীবাণু। এক বিন্দু জলপান করলেও অসংখ্য প্রাণীর হন্তা হ'তে হবে। অতএব তিনি পানাহার ত্যাগ করলেন, দেহের গতি রুদ্ধ করলেন—স্তব্ধ, নিশ্চল, নির্বাক ও কঠিন হ'য়ে থেকে মাত্র একুশ দিনের দিন লাভ করলেন তাঁর বাঞ্ছিত মৃত্যুকে। আশ্চর্য না—ও-রকম ক'রে মরতে পারা—এর চেয়ে মহান আর কি কিছু হ'তে পারে? আর এই ধর্ম থেকেই নাকি এক বণিক জাতির সৃষ্টি হয়েছে, যারা তাদের গুদোমে হাজার-হাজার মন চাল আটকে রেখে দেশে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে। কী পাপ করেছে মানুষ, কিছুতেই কোনো সত্যকে নিতে পারে না কেন মনের মধ্যে—

যীশুর বাণী থেকে যোদ্ধা হ'তে শিখলো সে, শিখলো তিল-তিল ক'রে পাই-পয়সা জমিয়ে-জমিয়ে চার পুরুষ পরে আফ্রিকাতে হীরের খনি কিনতে, গীতার বাণী থেকে অন্ধতা শিখলো, বুদ্ধের বাণী থেকে নিষ্ঠুরতা, আর অবশেষে সাম্য আর বিশ্বমৈত্রীর বাণী থেকে শিখলো মানুষগুলোকে যন্ত্রে ফেলে নিংড়ে-নিংড়ে তার মনুষ্যত্বের মজ্জাটুকু বের ক'রে নেবার কৌশল। কেন মানুষ উপদেশ দিতে যায়, দীক্ষা দিতে চায়, কেন চায় অন্যকে ভালো করতে—সে নিজেকে নিয়ে একলা থাকতে পারে না কেন—কেন পারে না তিল-তিল ক'রে নিজে ভালো হ'তে!'

'বাব্-বাঃ, তুই যা উপদেশ দিলি এতক্ষণ! এর পর আর—' কিন্তু শ্রীপতির মুখের দিকে তাকিয়ে দুর্গাদাস হঠাৎ থেমে গেলো। ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম জমেছে শ্রীপতির কপালে, এক গোছা চুল কানের পাশে ন্যাতার মতো লেপ্টে আছে, ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'তোর অসুখ নাকি রে? বল তো সত্যি ক'রে?' হাত বাড়িয়ে তার কপাল ছুঁতে যাচ্ছিলো দুর্গাদাস, কিন্তু শ্রীপতি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এখন কেটে পড়, দুর্গা, আমি শুয়ে পড়ি।'

'কেন? শোবেন কেন এখনই? এই সন্ধেবেলায়?'

বন্দনার এই কথা শুনে হা-হা ক'রে হেসে উঠলো দুর্গাদাস। —'তা যা-ই বলো, ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বন্দনা যেমন বলতে পারে তেমন আর কেউ পারে না। সত্যি শ্রীপতি—ঢের ঢের শোয়া হয়েছে তোর, এখন চল একটু ঘুরে আসবি আমাদের সঙ্গে। তোর কাছে কেন এসেছি তা-ই তো বলা হয়নি এতক্ষণ। "সপ্তর্ষি"র বৈঠক বসছে "সুনন্দা"য়, রথীন্দ্র রায় দারুণ কী-একটা পড়বে নাকি সেখানে—একেবারে বোমা ফাটাবে। তোকে নেবার জন্যেই এলাম আমরা—রথীটাকে ছাতু ক'রে দিতে হবে—বড্ড বাড় বেড়েছে ওর—তুই ছাড়া আর কেউ তা পারবে না। বিকাশ, মালিনী, শঙ্কর, অভিজিৎ, পূরবী—সবাই আসছে। আর শোন—'

'আমার বড্ড খিদে পেয়েছে, আমি বাড়ি যাই।'

হিমেন্দু আবার উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু বন্দনা উঠলো না।—'বন্দনা, চলো!'

বন্দনা দুর্গাদাসের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি আজ আর যাবো না মীটিঙে — আমার মাথা ধরেছে, পা কামড়াচ্ছে। হিমেন্দুও যাবে না, ওর সঙ্গে আমার দরকার আছে একটু। আর শ্রীপতি, আপনি ঐ বিচ্ছিরি আরশোলার কথা এত ভাবেন কেন বলুন তো, সেইজন্যেই তো ঘুম হয় না রাত্রে! আর সেইজন্যেই বাড়িতে কেউ এলে দশ মিনিট পরে চ'লে যেতে বলেন,' বলতে-বলতে বন্দনা উঠে দাঁড়ালো।

তার পাশে দাঁড়িয়ে হিমেন্দু বললো, 'তাহ'লে আর দেরি কোরো না, চলো।'

'না, না, যাবে কোথায়—পাগল!' দুর্গাদাস খপ ক'রে বন্দনার একটা হাত ধ'রে ফেললো। 'খিদে পেয়েছে তো হয়েছে কী—বাড়ি ছাড়া আর কোথাও কি খাবার নেই? মাথা-ধরার জন্যে অ্যাস্পিরিনও আছে দোকানে। এই পাশেই আছে হালদার-কেবিন—মোগলাই পরোটা ফেমাস ওদের। এখন কথা হচ্ছে—কার পকেটে কী আছে দেখাও।'

তিনজনের তল্লি মিলিয়ে তেরো আনা হ'লো। 'ধুশ!' মুখে একটা ভঙ্গি করলো দুর্গাদাস, 'বললাম তখন দশ আনার সীটেই চলো, ফশ করে পাঁচ সিকের টিকিট কিনে ফেললো হিমেন্দু। কী? না বন্দনার মাথা ধরবে। আরে বাপু, সেই তো মাথা ধরলোই, ফিলিমটাও দেখা গেলো না—এখন টাকাটা থাকলে কী গ্র্যাণ্ড হ'তো ভাবো দেখি। শ্রীপতি, তুই-ই খাওয়া আমাদের!'

টেবিলের দেরাজ ঘেটে তিনটি একটাকার নোট বের করলো শ্রীপতি। প্রত্যেকটিই ময়লা, কুঁচকোনো, হাতে-হাতে ঘুরে কাগজ পাৎলা হ'য়ে গেছে। দুটো পাকিয়ে গুলির মতো ছুঁড়ে দিলো

দুর্গার দিকে, আর-একটা ফিরিয়ে রাখলো দেরাজে।

নোট দুটো হিমেন্দুর হাতে দিয়ে দুর্গাদাস বললো, 'তুমি বন্দনাকে কিছু খাইয়ে দাও এ দিয়ে, আমি শ্রীপতিকে নিয়ে "সুনন্দা"য় আসছি।'

'আমি কোথাও যাব না!'

'যাবি না মানে?'

'মানে — যাবো না!'

'তোকে যেতেই হবে। চ্যাংদোলা ক'রে তুলে নিয়ে যাবো, জানিস?'

'তোর ভাঁড়ামি আর ভালো লাগছে না। কেটে পড়।'

'কেন, যাবেন না কেন?' বন্দনা অবাক হ'য়ে শ্রীপতির দিকে তাকালো, 'আপনার প্রাণের বন্ধু এত ক'রে বলছে, আর তবু আপনি —'

এমন সময় বাইরের দরজায় হাঁক শোনা গেলো — 'শ্রীপতি আছো?' আর সঙ্গে-সঙ্গে আরো দু-জন মানুষ ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। ততক্ষণে দিনের আলো আবছা হ'য়ে এসেছে, ঘরের ভেতরটা অস্পষ্ট, তবু সেই দু-জনকে চিনতে কারোরই এক মুহূর্ত দেরি হ'লো না। মিনিটখানেক চুপ ক'রে থাকলো সবাই, তারপর হঠাৎ সরু গলার আর্ত স্বরে স্তব্ধতা ফেটে গেলো। তক্তায় ব'সে প'ড়ে হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো বন্দনা।

২

হিমেন্দু ছুটে এসে বন্দনার পাশে ব'সে পড়লো, দুর্গাদাস কয়েক পা হেঁটে গিয়ে আলো জ্বেলে দিলে। বাল্‌বে শেড নেই, আকাঁড়া ইলেকট্রিক আলোয় দেয়ালের ঝুলকালিও স্পষ্ট দেখা গেলো।

'এই যে—তুইও এসে গেছিস, গৌতম—বাঃ। আরতি, তোমাকে কাল তিন বার টেলিফোন ক'রে পাইনি। কোথায় থাকো সারাদিন?'

'অত টেলিফোন কেন? জরুরি দরকার ছিলো?'

একটু লাল হ'য়ে হাসলো দুর্গাদাস। সুন্দর দাঁত তার, মুখখানাও কমনীয়, ঠোঁটের ওপর পাৎলা গোঁফ বেশ মানিয়েছে। রোগা, কিন্তু দেখতে তেমন রোগা লাগে না; চলাফেরা কথাবার্তা সবই খুব চটপটে আর সপ্রতিভ ব'লে হ্যাণ্ডলুমের চেক-শার্টে ঢাকা বুকটা বরং চওড়াই দেখায়।

'দরকার তেমন কিছু না—এই আজকের "সপ্তর্ষি"র বৈঠকের খবরটা দেবার জন্য। তা খবর তুমি পেয়ে গেছো দেখছি।'

'খবর দেবার তুমি ছাড়া কি লোক নেই আমার?'

'তা কেন থাকবে না—বাঃ। তা ওরা আমাকে বলেছিলো, তাই চেষ্টা করেছিলাম।'

'তার জন্যে তিনবার টেলিফোন! আর কোনো ব্যাপারে তো এ-রকম কর্তব্যজ্ঞান তোমার দেখা যায় না, দুর্গাদাস। তা বাড়ির কাউকে ব'লে দিলে না কেন?'

'কী যেন—মনে পড়েনি, সে-কথা,' দুর্গাদাস মাথার চুল টেনে

হাসলো। 'আসলে টেলিফোনে আমি কেমন নার্ভাস হ'য়ে যাই। বেশি কথা বলতে পারি না।'

'তা-ই নাকি? কিন্তু আমার সঙ্গে তো আধ ঘণ্টা ধ'রেও কথা বলেছো এক-একদিন!'

'তার মধ্যে কুড়ি মিনিটই অবশ্য তুমি বলেছো,' দুর্গাদাস মৃদু গলায় হেসে উঠলো।

আরতি নিঃশব্দে একবার চোখ ফেললো দুর্গাদাসের চোখে। কঠিন আর উজ্জ্বল সেই চোখ। লম্বা মেয়েটি, দোহারা গড়ন, গায়ের, রং কালোর দিকে, কিন্তু মুখের চামড়া আঙুরের মতো মসৃণ। হালকা নীল শাড়ির সঙ্গে মান্দ্রাজি সিঁদুরের টিপ পরেছে কপালে, হাতের বটুয়া কালোতে জরিতে কাজ-করা। দাঁড়িয়েছে কোমরের কাছে দুই হাত ভাঁজ ক'রে, সোজা হ'য়ে, মাথা উঁচু রেখে। পাথরের মূর্তির মতো ভারি, মন্থর ও গর্বিত মনে হয় তাকে, কথা বলার সময় মুখে বেশি রেখা পড়ে না, শুধু মাঝে-মাঝে চোখ দুটি ঝকঝক ক'রে ওঠে; দেখে মনে হয় বাড়িতে আগুন লাগলেও সে আস্তে-আস্তে চলবে আর গলার আওয়াজও চড়াবে না। সব মিলিয়ে এমন-কিছু আছে তার মধ্যে, এক ধরনের ঝকঝকে ঠাণ্ডা আত্মস্থতা, যা মানুষকে চুম্বকের মতো টানে, আবার ধাক্কা দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়েও দেয়।

'তাছাড়া, আর-একটাও কথা ছিলো—আমার সেই "বিনয় সরকারের বৈঠক" ব'লে বইটা—'

'তুমি কী করবে ও-বই দিয়ে?'

'পাতা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ঘুড়ি ওড়াবো বোধহয়।'

'পরীক্ষা দেবে ভাবছো নাকি?'

'দেবো না এমন কথা ভাবছো কেন?'

'কিন্তু—পড়ার সময় আর কি কখনো হবে তোমার?'

'সে-কথা বরং আমিই তোমাকে জিগেস করতে পারি।'

'তুমি আমার কথা কিছু জানো না, দুর্গাদাস। একটু ভেবে কথা বোলো।'

দুর্গাদাস এক পলক তাকালো আরতির দিকে, তক্ষুনি হাত নেড়ে বললো, 'ও-সব থাক। তাহ'লে বইটা কাল নিয়ে এসো কফি-হাউসে। না কি তোমার বাড়ি গিয়ে নিয়ে আসতে হবে?'

'কিন্তু ও-বই তো আমি অন্য একজনকে দিয়ে দিয়েছি।'

'দিয়ে দিয়েছো? জন্মের মতো?'

'ধ'রে নাও জন্মের মতোই।'

'কী মুশকিল—বইটা আমার নিজেরও নয়, আজকাল আর ছাপাও নেই—তা যাকগে, ভালোই হ'লো, একটা অন্তত "জন্মের মতো" সম্বন্ধ পাতানো গেলো তোমার সঙ্গে।'

'ভাবিসনে, দুর্গা, বইটা আমার কাছে আছে, ফেরৎ পাবি—' একটু দূর থেকে গৌতম মুখ ফেরালো ওদের দিকে।

আরতি আর দুর্গাদাস যতক্ষণ কথা বলছিলো, ততক্ষণ আরো দুটি ছোটো-ছোটো দৃশ্য অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো ঐ ঘরে। গৌতম এগিয়ে এসেছিলো শ্রীপতির কাছে, টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিচু গলায় কথা বলছিলো তার সঙ্গে। টেবিলটাতে এক হাত চেপে শ্রীপতি শুনছিলো—বা শুনছিলো না—অন্ততপক্ষে কোনো জবাব দিচ্ছিলো না, তাকিয়ে ছিলো একমনে টেবিলটার দিকেই—যেন তার ঘাড়ে এমন ব্যথা হয়েছে যে মাথা তুলতে পারছে না। কান দুটো বড়ো-বড়ো তার, মাথা নিচু থাকার জন্য তা আরো বেঢপ দেখাচ্ছে, কপালের একদিকে নেমে এসেছে না-আঁচড়ানো চুল। ওদিকে তক্তাপোশে মুখ ঢেকে ব'সে আসে বন্দনা, পাশে অসহায় হিমেন্দু। প্রথমে খুব বেগে কান্না এসেছিলো বন্দনার—প্রায় ডুকরে উঠেছিলো—আস্তে-আস্তে তা গুনগুনানিতে পরিণত হ'লো, এতক্ষণে থেমে এসেছে। ঘরের অন্য চারজনকে তাকে লক্ষ না-করার ভান করতে হচ্ছে—তা ছাড়া আর কী করতে পারে

তারা, এ-রকম অবস্থায় সমবয়সী তরুণরা পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে পারে না—দুর্গাদাস তার কান্নার আওয়াজ কানে নিয়েও অবিরাম বকবক ক'রে গেছে। চোখ দিয়ে অনেক জল পড়েছে বন্দনার—এমন সত্যিকার কান্না বেশ কিছুদিন পরে কাঁদলো সে, কিন্তু মনে হচ্ছে আরো কিছুক্ষণ কাঁদতে পারলে মনটা বেশ হালকা হ'তো।

মুখ থেকে আস্তে-আস্তে হাত সরিয়ে নিলো বন্দনা, সোজা হ'য়ে বসলো। চুল ঠিক ক'রে নিলো হাত দিয়ে, বটুয়া থেকে রুমাল বের ক'রে চোখে, নাকে বুলিয়ে নিলো। হিমেন্দু তার কানের কাছে ফিশফিশ ক'রে বললো, 'চলো, যাই এবার।'

তার দিকে মুখ ফেরালো বন্দনা।—'আমার দিকে তাকাও তো ভালো ক'রে। খুব বিশ্রী দেখাচ্ছে আমাকে?'

'না, না, বিশ্রী দেখাবে কেন?'

'কেন আবার কী? একে তো আমি দেখতে ভালো নই, তার ওপর কেঁদে-কেটে আরো বিশ্রী হ'য়ে গিয়েছি। কিন্তু তুমি কিছু বোঝো না—তোমাকে জিগেস করা না-করা সমান।'

'বন্দনা, তুমি আর থেকো না এখানে। চলো—'

'ও-রকম "চলো চলো" কোরো না তো, হিমেন্দু!' এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো বন্দনা; যেখানে গৌতম শ্রীপতির সঙ্গে কথা বলছিলো সেখানে গিয়ে গৌতমের মুখোমুখি দাঁড়ালো। গৌতম কথা বন্ধ ক'রে তাকালো তার দিকে, কিছু বললো না।

'কী মশাই, চিনতে পারছেন না আমাকে? আমি বন্দনা সেন, দশ মাস আগে পর্যন্ত যাকে একবেলা চোখে না-দেখলে রাত্রে ঘুম হ'তো না আপনার, যার বাড়িতে রাত এগারোটা অবধি প'ড়ে থাকতেন নানা ফিকিরে বন্ধুদের এড়িয়ে, যার মা-র হাতের বিস্তর পোলাও পায়েস কোপ্তা মুড়িঘণ্ট হজম করেছেন আপনি, আর যার সঙ্গে দেখা করার জন্য বৃষ্টির মধ্যে তিন মাইল রাস্তা হেঁটে-হেঁটে

চ'লে এসেছিলেন একবার! হ্যাঁ—সেই বন্দনা সেন। চিনতে পারছেন না?'

মুহূর্তে বন্দনাকে ঘিরে কয়েকটি মনোযোগ গ'ড়ে উঠলো। হিমেন্দু উঠে এসে দাঁড়ালো তার পাশে, মনের কষ্টে নীলচে দেখাচ্ছে তার মুখ। শ্রীপতি—এতক্ষণ পর মাথা তুলে—একদৃষ্টে বন্দনাকে দেখছে, কেমন একটা অদ্ভুত হাসিতে তার ঠোঁট আর মুখ বিকৃত হ'য়ে আছে। দুর্গাদাস, আরতিকে ভুলে, ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখছে—শুধু বন্দনাকে নয়, শ্রীপতিকেও—তার সব-সময় হাসিখুশি মুখে যেন আস্তে-আস্তে বিষাদ ছড়িয়ে পড়লো। শুধু আরতি তাকিয়ে রইলো সামনের দেয়ালটার দিকে—স্তব্ধ, একা, কঠিন, আর গৌতমের ঠোঁট দুটি কিছু-একটা বলার জন্য ন'ড়ে উঠেই আবার বুজে গেলো।

'কী, কথা বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে? কিন্তু কথা তুমি বলতে পারো না তা তো নয়, ঐ তোমার ঠোঁট দুটি থেকে অনেক মধু ঝ'রে পড়তে শুনেছি আমি—"আমার সোনালি চাঁদ, আমার রুপোলি পাখি, আমার হরিণের দ্বীপ; আমার ময়ূরের বন, আমার রোদ, আমার আলো, আমার বৃষ্টি—" ঠিক বলছি না?' একটা বাঁকা হাসি যেন কান্নার মতো ভেঙে দিয়ে গেলো বন্দনার মুখ, তার হালকা শরীরটির মধ্যে ঝড় উঠলো, নিশ্বাস পড়লো জোরে-জোরে, চুল উড়ে পড়লো কপালে, ফর্শা রং লাল হ'তে-হ'তে প্রায় কালো দেখালো। 'আর ও-সব কথাই আরেকজনকে বলছো এখন—না কি নতুন কিছু বানিয়েছো? না কি নানা বই থেকে টুকে-টুকে খাতায় লিখে রাখো ও-সব?—ঠিক তেমনি, সকলের চোখের সামনে, আমার চোখের সামনে, নির্লজ্জের মতো জোড়ে ঘুরে বেড়াও! কিন্তু তোমাকে নির্লজ্জ বললে কিছুই বলা হয় না, গৌতম। তুমি পাষণ্ড, তুমি নরাধম, তুমি নরকের কীট। অন্ততপক্ষে কলকাতা ছেড়ে চ'লে যেতে পারো। অন্ততপক্ষে ঐ মেয়েটাকে বিয়ে ক'রে ভদ্র হ'তে

পারো। আমি যেখানে যাই ভয়ে-ভয়ে থাকি পাছে তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়। কিন্তু কখনো দেখা হ'য়ে যাক তা আমি চেয়েওছিলাম মনে-মনে। আজ এদের সকলের সামনে তুমি কাঁদালে আমাকে—কী বোকার মতো কাঁদলাম আমি, কী অপমান হ'লো আমার!—কিন্তু এই অপমানের প্রতিশোধও আমাকে নিতে হবে—সব-কিছুর প্রতিশোধ আজ হ'য়ে যাক—এদের সকলের সামনে তোমার মুখে জুতো মারবো আমি, তারপর তুমি সখীকে নিয়ে এখান থেকে বেরোবে।'

বেগে নিচু হ'লো বন্দনা, তার হাতে এক পাটি লাল স্যাণ্ডেল ঝলসে উঠলো। হিমেন্দু আর দুর্গাদাস দু-দিক থেকে ধ'রে ফেললো তাকে। দুর্গাদাস গম্ভীর গলায় বললো, 'ছি বন্দনা, এ-সব কী হচ্ছে! ফ্যালো! মাথা-খারাপ হ'লো নাকি তোমার? গৌতম, তুই চ'লে যা!'

'আমাকে কারো পছন্দ না-হ'লে তিনি চ'লে যেতে পারেন, আমি কারো কথায় চ'লে যেতে বাধ্য নই।'

'এ আবার কী-রকম জবাব হ'লো? সত্যি তুই বাজে হ'য়ে যাচ্ছিস, গৌতম—তোর কি হৃদয় ব'লে কিছু নেই আর?' দুর্গাদাস হাত ধ'রে বন্দনাকে তক্তাপোশের কাছে নিয়ে এলো। 'একটু বোসো তুমি, বন্দনা। শান্ত হও। জল খাবে?'

ছুটে হিমেন্দু কুঁজো থেকে জল নিয়ে এলো। প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে একটা রুমাল বের করলো দুর্গাদাস। সেটা নেড়ে-নেড়ে হাওয়া দেবার চেষ্টা করলো।

'থাক—হাওয়া লাগবে না।'

'জল খাও তবে।'

'খাচ্ছি।' জল খেয়ে, চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে কিছুটা শান্ত হ'লো বন্দনা। দুর্গাদাস শ্রীপতির দেয়া সেই ময়লা নোট দুটো বের ক'রে বললো, 'হিমেন্দু একটা ট্যাক্সি ক'রে ওকে বাড়ি নিয়ে যাও।'

'আমি এখন যাবো না।'

'কী অদ্ভুত!' হিমেন্দু করুণ চোখে বন্দনার দিকে তাকালো, কিন্তু বন্দনা তা লক্ষ না-ক'রে বললো, 'আমিও কারো কথায় চ'লে যেতে বাধ্য নই। আমিও এখানে থাকবো।'

'কিন্তু আমরা যে মীটিঙে যাবো এক্ষুনি।'

'আমার কি সেখানে যাওয়া বারণ?'

'বাঃ, বারণ হবে কেন,' দুর্গাদাস খামকা একটু লাল হ'লো হঠাৎ, 'আমরা তো বলছিলাম—' দুর্গাদাস চেষ্টা করলো ঘরের আবহাওয়াকে আবার বেশ সহজ ক'রে আনতে—'তা বেশ হ'লো, সবাই মিলে যাওয়া যাবে—খুব ভালো—কিন্তু তুমি আবার হঠাৎ রেগে-টেগে যাবে না তো, বন্দনা?'

'না, এখন আর রাগ নেই আমার—আর কেনই বা রাগ—নিজের মনের ওপর সত্যি তো হাত নেই মানুষের। ওর দোষ কী বলো—আমিই অন্যায় করেছি, অভদ্রতা করেছি, যদি বলো ক্ষমা চাইতেও পারি ওর কাছে। চাইবো?'

দুর্গাদাস, যে দু-বছর ধ'রে বন্দনাকে অনবরত দেখে আসছে, সেও স্তম্ভিত হ'লো এই কথা শুনে। ব্যস্ত হ'য়ে বললো—'না, না, ক্ষমা চাইবে কেন, ক্ষমা চাইবার কী হয়েছে—আর-কিছু না, বেশ—বেশ সহজ হ'য়ে থাকো এই আরকি বলছি আমি।'

'ক্ষমা চাইবার কিছু হয়নি তা নয়,' ঘরের অন্য দিক থেকে আরতির গলা শোনা গেলো, 'কিন্তু আমরা তোমাকে ক্ষমা করলাম, বন্দনা। সত্যি ভারি অসভ্য মেয়ে তুমি—কিন্তু আমরা ক্ষমা করলাম।'

হিমেন্দু আরতির দিকে তাকালো একবার, একবার বন্দনার দিকে তাকালো। তারপর আস্তে-আস্তে কয়েক গজ মেঝে পার হ'য়ে আরতির সামনে দাঁড়িয়ে বললো, 'মাপ করবেন, আপনার সঙ্গে আমার বেশি আলাপ নেই, কিন্তু না-ব'লে পারছি না আপনার আজকের ব্যবহার অত্যন্ত অসংগত।'

ঠাণ্ডা চোখে হিমেন্দুকে বিদ্ধ করলো আরতি। একটু পরে কথা বললো, 'আমাকে বলছেন?'

হিমেন্দু ঢোঁক গিলে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, আপনাকেই। কিছু বলার আগে কথাটা কী, তা ভেবে দেখা কি উচিত নয়?'

'আপনার কথাটা খাঁটি, বন্দনাকে বুঝিয়ে দিলে ওর উপকার হবে। বুঝিয়ে দিতে কিছু সময় লাগবে অবশ্য, কিন্তু আপার ধৈর্য আছে দেখতে পাচ্ছি—আপনি পারবেন।'

হঠাৎ কানের মধ্যে শোঁ-শোঁ শব্দ শুনলো হিমেন্দু। শুকনো গলায় চেষ্টা ক'রে উচ্চারণ করলো—'আপনি বন্দনার পায়ের নখের যোগ্য নন। তাকে অপমান করার চেষ্টা করলে আপনি নিজেই ছোটো হ'য়ে যাবেন—তাছাড়া কিছু লাভ হবে না।'

শরীরটিকে ঈষৎ পেছনে হেলিয়ে ছোট্ট ক'রে হেসে উঠলো আরতি। ছোটো, তীক্ষ্ণ হাসি; থেমে যাবার পর একটুও রেশ রইলো না তার, সঙ্গে-সঙ্গে আরতির মুখে পাষাণের স্থৈর্য ফিরে এলো।

তাড়াতাড়ি কাছে এসে দাঁড়ালো দুর্গাদাস।—'কী মুশকিল, আবার ঝগড়া বাধালে নাকি তোমরা?—ঈশ, কেন যে এ-সব গোলমাল তোমরা ভালোবাসো!—এখন থামো সবাই—শোনো—তা আরতি, হিমেন্দুর সঙ্গে এই বোধহয় প্রথম দেখা হ'লো তোমার?'

'কিন্তু আশা করি এই শেষ নয়,' ঠোঁটের কোণে হাসলো আরতি।

'আমার বন্ধু, হিমেন্দু তালুকদার, আর ইনি আরতি মৈত্র।—আর কিন্তু ও-সব কথা না! এবার চলো।'

সভ্য সমাজের প্রথা-অনুযায়ী হিমেন্দু আর আরতি নমস্কার বিনিময় করলে। হিমেন্দু বন্দনার কাছে ফিরে গিয়ে বললো, 'আমি বলছিলুম কী, তুমি বাড়ি ফিরলেই ভালো হয় এবার। সেই কখন বেরিয়েছো—'

'কী বললে তুমি আরতিকে ?'

'বললাম যে সে তোমার পায়ের নখের যোগ্য নয়, আর—'

'আরতি দেখতে খুব সুন্দর, না ? কী সুন্দর দাঁড়িয়েছে, দ্যাখো ! আর গৌতম, সেও তো বেশ লম্বা, স্বাস্থ্য ভালো—কেমন কোঁচা লুটিয়ে ধুতি পরেছে আজ—চমৎকার মানাবে দু-জনকে। আচ্ছা, আমি যদি আজ থেকে আরতিকে ভালোবাসতে আরম্ভ করি, কেমন হয় ? তাহ'লে নিশ্চয়ই আরতিও আমাকে ভালোবাসবে, আর আরতি যদি—'

'চলো, উঠে পড়ো এবার। বন্দনা !' ঘরের মধ্যে নড়াচড়া শুরু হ'য়ে গেলো, ঠিক বন্দনার পাশ দিয়ে গৌতম চ'লে গেলো দরজার দিকে, আর তাকে যেতে দেখামাত্র বন্দনাও উঠে দাঁড়ালো। দীর্ঘশ্বাস চেপে হিমেন্দুও উঠলো একটু পরে।

দুর্গাদাস পেছনে প'ড়ে শ্রীপতির কাছে ফিরে এলো। এখনো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে সে, টেবিলে একটা হাত রেখে, এতক্ষণ তার ঘরের মধ্যে যা-কিছু ঘ'টে গেলো তা যে সে অনুধাবন করেছে এই মুহূর্তে তেমন কোনো চিহ্ন তার মুখে নেই। তার মুখটা গরম আর লালচে দেখাচ্ছে, যেমন হয় জ্বর হ'লে।

'শ্রীপতি, তুই যাবি না ?'

'আমার কিছু ভালো লাগে না, দুর্গা। সাহিত্য ভাবতে ঘেন্না করে। রাজনীতি ভাবতে ঘেন্না করে। যা-কিছু নিয়ে মাতামাতি করিস তোরা—জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, দর্শন—সব ভাবতে ঘেন্না করে। আমাকে তোরা ছেড়ে দে।'

শ্রীপতির চোখের মধ্যে একটু তাকিয়ে থাকলো দুর্গাদাস, তারপর তার হাত চেপে ধ'রে বললে, 'আরে চল, চল।'

শ্রীপতি স্যাণ্ডেলে পা ঢুকিয়ে দিলো।

৩

মনোহরপুকুর আর রসা রোডের মোড়ে 'সুনন্দা'। একতলায় চায়ের দোকান, দোতলার একটি ঘরে (বাকি অংশে মালিক থাকেন) মাছের্-ঝোল-ভাত পরিবেশন করা হয়, ফরমাশ দিলে ঢাকাই পরোটা চিংড়ির কাটলেট মাংসের কোপ্তা ইত্যাদি শৌখিন খানাও। এই দোতলার ঘরে আজ 'সপ্তর্ষি'র বৈঠক বসেছে।

'সুনন্দা'র মালিকের নাম গিরীশ কুণ্ডু, কিন্তু দোকানটি আসলে চালায় 'সপ্তর্ষি'র তরুণ সাহিত্যিকেরা। 'সপ্তর্ষি' নামে পত্রিকা বের করে তারা—বছরে তিন বার কি চার বার বেরোয়; কেউ কলেজে বা য়ুনিভার্সিটিতে পড়ছে, কেঁউ চাকুরে, আর কেউ বা চাকরি খুঁজছে—তু-চারজন বিয়ে ক'রে পুত্রমুখও দেখেছে এর মধ্যে; কিন্তু যে যা-ই করুক আর যার অবস্থা যেমনই হোক, দিনরাত্রির মধ্যে কতগুলো ঘণ্টা তাদের 'সুনন্দা'য় কাটানোই চাই। তু-বছর আগে দোকানটির পত্তন হওয়ামাত্র সেটিকে তারা 'ক্যাপচার' করেছিলো; এখন তাদের অবাধ গতিবিধি সেখানে, ধারের সুবিধে প্রচুর, এক-এক পেয়ালা চা নিয়ে দিব্যি তু-তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়;—অনেক সম্পাদকীয় কাজ সেখানে সম্পন্ন হ'য়ে থাকে, অনেক তর্কাতর্কি হয়, কেউ-কেউ দোতলার ঘরে ব'সে কবিতাও লেখে;—এই একটা বিষয়ে তারা হাল আমলের ফরাশি লেখকদের মতো, এ-কথা ভাবতে বেশ গর্ব হয় তাদের। গিরীশ কুণ্ডু এদের যথোচিত ভয়-ভক্তি ক'রে চলেন, নিজেই গরজ ক'রে সুব্যবস্থা ক'রে দেন এদের বৈঠকের জন্য; কেননা মোটের ওপর এদের কাছ থেকে যা টাকা পাওয়া যায় সেটা তুচ্ছ নয়, আর তার ওপর—আর

সেটাই বড়ো কথা—এদের সুবাদে অল্প সময়েই নাম ছড়িয়েছে 'সুনন্দা'র, ইণ্টেলেকচুয়েলদের সংসর্গে থাকার একটা প্রেস্টীজ আছে তো।

সরু সিঁড়িতে বারকয়েক ঠোক্কর খেয়ে দুর্গাদাস তার সঙ্গীদের নিয়ে যখন দোতলায় পৌঁছলো তখন সভা আরম্ভ হ'তে আর দেরি নেই।

মাঝারি ঘরে জন-চল্লিশ সাহিত্যচারী বসেছে। মাথার দিকে বক্তার জন্য টেবিল-চেয়ার, ঘরের অর্ধেক পর্যন্ত ভেনেস্তা চেয়ার পাতা হয়েছে, তারপর দু-সার বেঞ্চি, তারপর দাঁড়াবার জন্য ফাঁকা জায়গা খানিকটা। জুন মাসের সেই পরিষ্কার সন্ধ্যায় পাগলের মতো হাওয়া দিচ্ছিলো কলকাতায়, কিন্তু ঐ ঘরটার দক্ষিণ বন্ধ, পাখা যথেষ্ট নেই, বাইরে থেকে আসামাত্র প্রথমেই একটা ভারি আর জমাট উত্তাপ বন্দনাকে আঘাত করলো।

—'উঃ, কী গরম এখানে!' বন্দনা এগিয়ে গেলো পাখার কাছে; একটি ছেলেকে দেখে বললে, 'আমাকে বসতে দেবেন, অভিজিৎ?'

'দেরিতে এলে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে, এখানে লেডীজ় সীট নেই।'

'এটা তো মানবেন যে দাঁড়িয়ে থাকার পক্ষে আমার চাইতে অনেক বেশি যোগ্য আপনি?'

'আপনি যদি নিজেই তা স্বীকার করেন তাহ'লে আর কথা কী,' মুচকি হেসে ছেলেটি চেয়ার ছেড়ে দিলো বন্দনাকে। আর বন্দনার ঠিক পেছনে লম্বা বেঞ্চিতে জায়গা ক'রে নিলো হিমেন্দু।

অন্য চারজন পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে রইলো। আরতির সেই এক ভঙ্গি—ঋজু, হাত দুটি কোমরের কাছে ভাঁজ-করা, দেয়ালে ঠেশান দিলে না পর্যন্ত—সে যেন জানে দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে বিশেষ ভালো দেখায়। গৌতম থাকলো তার পাশে, সকৌতুকে নিরীক্ষণ করতে লাগলো রথীন্দ্র রায়কে, যে তার স্বরচিত নিবন্ধের ছোটো-

ছোটো পাতাগুলো গোছাতে-গোছাতে ততক্ষণে উঠে দাঁড়াচ্ছে। দেয়ালে ঠেশান দিয়ে, আরতি আর গৌতমের সঙ্গে খানিকটা ব্যবধান রেখে, পাশাপাশি দাঁড়ালো শ্রীপতি আর দুর্গাদাস, দুর্গাদাস শ্রীপতির কাঁধে হাত রাখলো।

রথীন্দ্র তার কাগজ থেকে পড়া শুরু ক'রে দিলো। কোনো ভূমিকা করলো না, কাগজ থেকে চোখও তুললো খুব কম, শুধু মাঝে-মাঝে হাত-নাড়ার দ্বারা বুঝিয়ে দিলো যে সে নিতান্তই স্বগতোক্তি করছে না। বেঁটে ছেলেটি, মুখখানা গোলগাল, ঠোঁট পাৎলা আর হাঁ-টা মস্ত, আর পড়ার সময় সেই ঠোঁটের কাজ অনাবশ্যকরকম বেশি হচ্ছিলো, অনেকে যেমন পান চিবোতে মুখ নাড়ে, তেমনি ভঙ্গি সহযোগে কথাগুলো বেরোতে লাগলো তার মুখ দিয়ে।

'আজ আমরা এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা মানে বাংলাদেশের তরুণতর লেখকরা। জগতের কথা অনেক ভেবেছি আমরা ; ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়াকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন বুনেছি। ধূসর সেই স্বপ্নজাল, তা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা এখন আমাদের কর্তব্য। আমরা এখন স্বাস্থ্য ফিরে পেতে চাই।

'সুস্থ হ'তে হ'লে সকলের আগে দরকার নিজেদের বাঙালি ব'লে উপলব্ধি করা। বাংলা আমাদের দেশ ; জগতের মধ্যে, এমনকি ভারতের মধ্যেও আমাদের আছে একটি বিশিষ্ট বাঙালি জীবনধারা ; যুগ-যুগ ধ'রে পদ্মা-গঙ্গা-মেঘনার কোলে আমরা লালিত হয়েছি। ইংরেজ বণিকের তৈরি এই কলকাতা শহর, ইংরেজ বণিকের আমদানি এই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, আর চায়ের টেবিলে এলিয়ট রিলকে পিকাসো শলোকহ্ব হেমিংওয়ে ডালি-র নাম আওড়ানো—সেই যুগ-যুগ ধ'রে প্রবাহিত জীবনধারার কাছে এ-সবের মূল্য কতটুকু ?'

'রাবিশ!' ব'লে উঠলো দুর্গাদাস। 'ঠিক সাত দিন আগে ডালি-র নাম শুনেছে। বাজে বকছে।'

শ্রীপতি কিছু বললো না, চোখও ফেরালো না দুর্গাদাসের দিকে। আরতি ঘাড় বেঁকিয়ে একবার দুর্গাদাসের দিকে তাকালো।

'আমাদের যুগসন্ধি আমাদেরই, আমাদের সমস্যাও আমাদের—অন্য কোনো দেশে তার উত্তর নেই। হতাশা, ক্লান্তি, অনাস্থা, দুরভিলাষ—পশ্চিমী রোগের এই সব উপসর্গ, যার সংক্রমণ এমনকি উপনিষদ-ভক্ত রবীন্দ্রনাথও এড়াতে পারেননি, তার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন থেকে আমাদের পূর্ববর্তীরা বহুকাল কাটিয়ে গেছেন—কিন্তু আমরাও কি তা-ই থাকবো? সুস্থ, সুখী, বলিষ্ঠ জীবন—তা কি আমরা নিজেরা কোনোদিন উপার্জন করতে পারবো না—তা কি আমাদের ধার ক'রে আনতেই হবে য়ুনেস্কো অথবা মস্কো থেকে?'

ঘরের মধ্যে টিটকিরির মৃদু হাসি উঠলো, মাথা নেড়ে সমর্থন জানালো অনেকে, দু-একটা হাততালির শব্দ হ'লো; কিন্তু বক্তা কোনোটাই লক্ষ করলো না।

'আমাদের তিরিশের কবিরা ছিলেন ভীরু ও কামুক, যে-স্বাধীনতার ধ্বজা তাঁরা উড়িয়েছিলেন তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো যোগ ছিলো না। একজন তাঁর নিজের কামদাহ সহ্য করতে না-পেরে তার জন্য অপরাধী করলেন ভগবানকে, প্রেমিকার দেহের অন্তরালে কঙ্কালের দুঃস্বপ্ন দেখে শিউরে উঠলেন। আরেক জন এক আত্মঘাতীকে এমনতর রোমান্টিক রঙে চিত্রিত করলেন যেন এই বেঁচে থাকা নামক ব্যাপারটাই যুগপৎ হাস্যকর ও বীভৎস। আরেক জন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যে তাঁর বিদেশিনী এবং খুব সম্ভব অবৈধ প্রণয়িনীর স্বপ্নে নিমগ্ন হ'য়ে রইলেন। এই সব-কিছুর মূল কথাটা হ'লো জীবনবিদ্বেষ, স্বাভাবিক ও সুন্দরের প্রতি ঘৃণা, কিংবা আফ্রিকার ভূড়্-বিদ্যার ধরনে অলীক ও অলৌকিকের অন্বেষণে সত্যিকার মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলা। কামের বৃত্তি তার কাছেই পাপ, যে উৎকটভাবে সেটাকে রুদ্ধ করতে চায় অথবা তা নিয়ে স্বেচ্ছাচার করে; যে-মানুষ বিবাহের শৃঙ্খলার মধ্যে তৃপ্ত হ'তে শেখে তাকে তা পীড়ন করে না, বরং পুষ্টি দেয়।

জীবন তারই কাছে অসহ্য যে তার কাছে অসম্ভবের প্রত্যাশা করে; জীবন যা সহজে দিতে পারে তা গ্রহণ করার মতো বিনয় যার আছে, তার কাছে জীবন ভালো, জীবন সুন্দর।—কিন্তু এ-সব দূষিত ধারণা কোত্থেকে এসেছে তাও আমরা সহজেই বুঝতে পারি, যখন দেখি টি. এস. এলিয়ট নামে এক অ্যাংলো-ক্যাথলিক মার্কিন ইংরেজ—সর্বান্তঃকরণে মার্কিন বা ইংরেজ বা ক্যাথলিক কোনোটাই হ'তে না-পেরে—অগত্যা জন্মানোটাকেই পাপ ব'লে ঘোষণা করেন, আর ইয়েটস, যিনি এককালে ছিলেন আইরিশ দেশপ্রেমিক, বৃদ্ধ বয়সে জীবন থেকে পলায়ন ক'রে আশ্রয় নেন আর্টের বৈজয়ন্তীধামে।'

একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেলো—'সাধু! সাধু!' হিমেন্দু নিশ্বাস ফেলে মনে-মনে বললো, 'কী বোকা!'

'চল্লিশের কবিরা এঁদের "এস্কেপিস্ট" আখ্যা দিয়েছিলেন—কিন্তু তাঁরা নিজেরাই বা কী? তাঁদের সব লেখাকে একটিমাত্র সরল বাক্যে অনুবাদ করা যায়—"রাশিয়ার মতো হও!" তাঁদের কাছে স্বাস্থ্যের আদর্শ রাশিয়া, সুন্দরের আদর্শ রাশিয়া, জগতের আদর্শ রাশিয়া। কিন্তু এঁকেই কি বলে স্বাস্থ্য? রুশীরা যুদ্ধ করেছে, অতএব আমাদেরও যুদ্ধ করতে হবে। রুশীরা জমিদারদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমরাও বাড়ি জ্বালিয়ে দেবো। তাদের মেয়েরা রেলের এঞ্জিন চালায়, আমাদের মেয়েরাও তা-ই চালাবে। তাদের শত্রু আমাদের শত্রু, তাদের মিত্র আমাদের মিত্র। যেন ভারতবর্ষ পুনর্বার এক উপনিবেশে পরিণত হ'লো, আর আমাদের নতুন প্রভুর নাম রাশিয়া।'

'ছোঃ!' 'হুশ!' 'ঠিক!' নানা ধরনের মন্তব্য হ'লো ঘরের মধ্যে, কেউ হাততালি দিলো, কেউ বা টিটকিরি।

'কিন্তু আজ সন্ধ্যায় রাজনীতির প্রসঙ্গে যাবো না আমি, সাহিত্যের দিক থেকেই বলতে চাই। রবীন্দ্রনাথের যৌবন কেটেছে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-আন্দোলনের সূত্রপাতে, তিরিশের কবিদের

যৌবন কেটেছে আইন-অমান্ত ও সন্ত্রাসবাদের পটভূমিকায়, চল্লিশের কবিরা সাবালক হ'য়েই দেখেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এঁদের সকলেরই মূল মানসতা পরাধীন দেশে লালিত হয়েছে। যে-কোনো পরাধীন বা আশাহীন দেশের লোকের মতো এঁরাও বিদ্রোহকে খুব বড়ো ক'রে দেখেছেন, নিষিদ্ধের প্রতি দুর্বার ও ছেলেমানুষি আকর্ষণ এড়াতে পারেননি। তাই এঁদের রচনায় উত্তেজনা এত বেশি, অশ্লীলতা এত বেশি, যা আমরা সকলেই ভালো ব'লে জানি সেই ডাল-ভাত তালপাতার হাওয়াকে উপেক্ষা ক'রে কোনো মন-গড়া আদর্শস্থাপনের চেষ্টা এত প্রকট। কিন্তু আমরা যারা পঞ্চাশের কবি, আমরা বড়ো হয়েছি এক স্বাধীন দেশে, প্রগতিশীল সমাজে, এক কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের আশ্রয়ে; আমাদের কাছে এই নতুন যুগ দাবি করছে এক নতুন সাহিত্য, তা আমাদেরই সৃষ্টি করতে হবে।

'পূর্ববর্তীদের নমস্কার, কিন্তু আমরা আজ পরামর্শের জন্য তাঁদের দ্বারস্থ হবো না। কিংবা আমাদের রচনার তাঁরা অনুমোদন করলেন কি করলেন না, সে-কথা ভেবেও চিন্তিত হবো না আমরা। তাঁরা আমাদের সমবয়সী নন, আমাদের ভাবনা-সাধনা তাঁরা বুঝবেন না। তাঁরা যে-সব ভুল করেছেন তা থেকেই আমরা যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি, তাঁদের দিয়ে আর-কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের। রামমোহন বিদ্যাসাগর ইত্যাদিকে আমরা অফুরন্তভাবে বাহবা দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ভেবে দেখিনি যে তাঁরাই আমাদের সমাজের ভিৎ ফাটিয়ে দিয়েছিলেন, আর সেই সুযোগেই বিপ্লবের বিজাতীয় বীজ আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হ'লো। ইংরেজি শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা— এই সব বিখ্যাত বিলেতি বস্তুর কুফল যে কত গভীরে ব্যাপ্ত হয়েছে তা বোঝা গেলো যখন কর্ণ কুন্তী কচ দেবযানী সকলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মোলায়েম ভাষায় য়োরোপীয় রোমান্টিক নায়ক-নায়িকার মতো ভাবাবেগে উদ্বেল হ'য়ে উঠলো। হিন্দু বিবাহের যে-আদর্শকে

তিনি প্রবন্ধ লিখে গৌরবান্বিত করেছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে তাকেই ধূলিসাৎ ক'রে দিলেন "যোগাযোগে" কুমুদিনীর চরিত্রে। তাঁর লেখায় আমরা অনেক মণিমুক্তো পাই, কিন্তু আরো বেশি প্রয়োজনীয় অন্ন পাই না; কালিঘাটের অশিক্ষিত পটুয়ারা যা দিতে পেরেছিলো, পাই না সেই বাংলাদেশের প্রাণস্বরূপ বাঙালি বধূর ছবি, যার হাতে শাঁখা, কপাল ঘোমটায় ঢাকা, আর শুধুমাত্র শাড়ির আঁচলে ও স্বাভাবিক ব্রীড়ায় স্বাস্থ্যে-ভরপুর দেহটি আচ্ছাদিত।'

মেয়েলি গলার খিলখিল হাসির শব্দ উঠলো; বন্দনা ঘাড় ফিরিয়ে চোখোচোখির চেষ্টা করলো বন্ধুদের সঙ্গে, কিন্তু গৌতমের দিকে চোখ পড়ামাত্র মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো তার। গৌতম আরতির দিকে তাকিয়ে রসিকতা করলো, 'কী ভাগ্যে "বুক-ভরা মধু" বলেনি!' কিন্তু আরতি কোনো জবাব দিলো না।

'রবীন্দ্রনাথের হাতে বিচূর্ণিত উপনিষদ প্রত্যহ আহার করেছি আমরা; তাঁর ভাষার জাদুতে, ছন্দের কৌশলে মুগ্ধ হ'য়ে সব কথাই সত্য ব'লে মেনে নিতে শিখেছি। কিন্তু ঐ উপনিষদ-সমূহ— তাও তো বিদেশী, প্রক্ষিপ্ত; যে-শ্বেতবর্ণ, নীলচক্ষু, মাংসভোজী মদ্যপ ও যুদ্ধপ্রবণ জাতি ঐ গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের, এই আজকের দিনের বাঙালিদের, কতটুকু সম্বন্ধ যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছিলো অনেক আগেই, এবং যে-উপায়ে আমাদের জীবনে সেই দূরস্মৃতি ফিরে এলো, তাকে আজ সন্দেহের চোখে দেখতে হচ্ছে। যদি দেশে য়োরোপীয়রা না আসতো, যদি জর্মান পণ্ডিতেরা তাঁদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর এই পুরোনো আর পোকায়-কাটা পুঁথিগুলো আবিষ্কার ক'রে স্বজাতিগৌরবে উল্লসিত না-হতেন, আর উনিশ শতকের বাঙালিরা তাঁদেরই সুরে সুর মিলিয়ে নৃত্য না-করতো, তাহ'লে—সন্দেহ নেই—বাঙালি জীবনের সেই প্রাকৃত ধারাই অটুট থেকে যেতো আজ পর্যন্ত—সেই বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, পাঁচালি

কীর্তন কথকতা, নবান্নের ধান আর আগমনী গান, ঠাকুমার শেলাই-করা কাঁথা, ঢেঁকির পাড়ের ছন্দ আর প্রদীপের আলোয় বাতাসা ছড়িয়ে হরিলুট। এর আগেও তো কত আক্রমণ হয়েছে এই দেশে, বিদেশীর তলোয়ারের খোঁচায় হাজার মাথা লুটিয়ে পড়েছে, কিন্তু জীবনের আবহমান বুনোন তাতে ছিঁড়ে যায়নি আমাদের। সে-সব লড়াই ছিলো এক রাজার সঙ্গে আর-এক রাজার, দেশের সাধারণ্য তাতে বিচলিত হয়নি। কিন্তু ইংরেজ এসে শুধু যে আমাদের ধনে-প্রাণে মেরেছে তা নয়, আমাদের মনটাকেও বিকৃত ক'রে রেখে গেছে, নিজেদের সুবিধের জন্য আমাদের কানে জপিয়ে গেছে যে আমরা এক মস্ত বড়ো আধ্যাত্মিক জাতি।—কিন্তু উপনিষদের সেই দ্বিতীয় পাখিকে নিয়ে আমরা কী করবো—আমরা যারা ডালে ব'সে শুধু দেখতে চাই না, চাই বাঁচতে, চাই লোকায়তকে, গাছের ডালে পেকে-ওঠা ফলটিকে জঠরেও চালান করতে চাই। এবং চাই আমাদের নিজস্ব লোকায়তকে, তার কোনো রুশীয় বা চৈনিক প্রকরণকে নয়।

'ভাবতে অবাক লাগে যে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে খাঁটি বাঙালির জীবন কী-রকম বিরলভাবে ধরা পড়েছে। বৈষ্ণব কবিতার রাধাকৃষ্ণ স্বর্গের দেবদেবী হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁরা বাঙালি নন, কোনো ধলেশ্বরী বা ইছামতীর ধারে, জামরুলের ছায়ায় কোনো খড়ের ঘরে, তাঁদের কোনো জন্মেও কল্পনা করা যায় না। রাধা স্তন্য দেন না কোনো শিশুকে, কৃষ্ণ আমাদের সংসার থেকে দূরে থাকেন; তাঁদের পুজো ক'রে যেটুকু সুখ আমাদের তার চেয়ে অনেক, অনেক গভীরতর তৃপ্তি বাংলার স্বরচিত অন্নপূর্ণা আর গাজনের মেলার বাবা মহাদেবকে ভালোবেসে। (বিদ্যাসাগর তাঁর নিখুঁত সাহেবিয়ানা চাদরে চটিতে ঢেকে রাখলেন, মধুসূদনে সেই প্রচ্ছদটুকুও টিকলো না;) বঙ্কিম তাঁর লেখনীকে ক্ষয়িত করলেন বাদশাহি ঐশ্বর্যের বিবরণে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে য়োরোপের ও য়োরোপের কাছে

তাদেরই শেখানো ভারতের যশোগান ক'রে জীবন কাটালেন—এঁদের পরবর্তীদের কথা আর না-ই বললাম। এই তো আমাদের বিখ্যাত বাংলা সাহিত্য! কত ভাগ্যে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়েছিলো, আর মেয়েলি ছড়া, আর পূর্ববঙ্গের গাথাসাহিত্য, কত ভাগ্যে কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্তের মতো দু-চারজন কবি জন্মেছিলেন; নয়তো সমগ্র বাংলা সাহিত্য প'ড়ে উঠেও আমরা ঠিক জানতে পারতাম না বাঙালি জীবনের গড়নটি ঠিক কী-রকম, কী খায় তারা, কী-রকম বাড়িতে থাকে, কেমন ক'রে বসে, হাসে, কলহ করে, ভালোবাসে। জানতে পারতাম না, ঠিক তা নয়, কিন্তু বাঙালি ধরনে জানতে পারতাম না। রবীন্দ্রনাথ বিদেশীর চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন, নিজে তাঁর সোনার তরীতে প্রচ্ছন্ন থেকে কৌতূহলে যা নিরীক্ষণ করেছেন তা-ই তাঁর গল্পগুচ্ছ; কিন্তু কৃত্তিবাসের হাতে রাম সীতা কৈকেয়ী শূর্পণখাও খাঁটি বাঙালি চরিত্র হ'য়ে ওঠে, আর মুকুন্দরাম ছত্রে-ছত্রে আমাদের বুঝতে দেন যে তিনি যাদের কথা লিখছেন তিনি তাদেরই একজন।'

'এসো, কেটে পড়া যাক!' আরতির কানের কাছে ফিশফিশ করলো গৌতম, আরতি তার শরীরের ভার ডান থেকে বাঁ পায়ে বদলি করলো।

'বন্ধুগণ, আজ আমরা যারা তরুণ তাদের ওপর ভার পড়েছে বাংলা সাহিত্যের সেই আদিগঙ্গাকে বাঁচিয়ে তোলার। শুধু পুনরুজ্জীবন নয়, তার সম্প্রসারণ, পরিবর্ধন ও পরিশীলন—এই সবই আজকের দিনে আমাদের দায়িত্ব। বাংলার লোকায়ত ইতিহাস, বাংলার লোকায়ত সাধনা, যুগ-যুগ ধ'রে তার লোক-মানসের অভিব্যক্তি—এই সবই আলোচ্য ও চিন্তনীয় হবে আমাদের। এই কাজে কোনো রাষ্ট্র আমাদের বাধা দিতে পারবে না, হোক তা ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। প্রেরণার জন্য বাইরে যাবার প্রয়োজন হবে না, কলকাতার দশ মাইল দূরের কোনো গ্রামে কোনো বেড়ার গায়ে

ফুটে-থাকা অপরাজিতার নীল চোখেই তা পাওয়া যাবে। আমরা যাবো না দিল্লিতে বা প্যারিসে, মস্কো, রোম, ন্যুয়র্কেও যাবো না, এমনকি জীবিকার চাপে এই কলকাতায় আবদ্ধ থেকেও কলকাতাকে মনের মধ্যে গ্রহণ করবো না। ঔপনিষদিক অকর্মকতা ও গীতায় কথিত নিষ্কাম কর্ম দুটোই আমাদের বর্জনীয় হবে, এদিকে পাশ্চাত্ত্য জাতির চাঞ্চল্য, হিংস্রতা ও কর্মোন্মাদনাও সযত্নে পরিহার ক'রে চলবো। বীর, সন্ন্যাসী, ঋষি বা অবতারের জন্য আর প্রার্থনা নয় আমাদের; এঁরা প্রত্যেকেই জীবনের শত্রু, নিজে বড়ো হবার জন্য সর্বজনীনকে দলিত করেন। তীব্র ও চরম, অলৌকিক ও আশ্চর্যকে আর খুঁজবো না আমরা, চাইবো স্বাভাবিক হ'তে, সহজ ও সাধারণ হ'তে, সংসারের সামান্যতার সঙ্গে যুক্ত থেকেই নিজেদের সার্থক ক'রে তুলবো। স্বর্ণমৃগের প্রতারণায় ম'জে প্রাণপ্রতিমা সীতাকে আমরা হারাতে চাই না; দৈবাৎ কোনো পরশপাথর হাতে এলেও সেটাকে জলে গুলে জঠরানলে হজম ক'রে ফেলবো;—আমরা তা-ই চাই, যা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে; সেই-সব দিয়েই আমাদের জীবন ও কবিতাকে গ'ড়ে তুলতে চাই যা একাধারে বাস্তব ও সনাতন—গৃহ, স্ত্রী, সন্তান, অন্নজল; সকাল সন্ধ্যা বেলফুল কলমিলতা, সুখ, শ্রম, স্বাস্থ্যময় ঘুম, আর সন্ধেবেলায় ঘরে-ফেরা সেই "মা" ব'লে ডাক।

'এ-ই আমার বক্তব্য। এখন আপনাদের কারো যদি কিছু বলবার থাকে আমি তা সাগ্রহে শুনতে প্রস্তুত আছি।'

রথীন্দ্র রায় এই শেষের কথাটাও তার হাতের কাগজ দেখে আবৃত্তি করলো; মনে হ'লো এটাও সে লিখে এনেছিলো। তারপর শ্রোতাদের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত ক'রে ব'সে পড়লো সামনের চেয়ারটায়। বোঝা গেলো, লিখে তার যতটা অভ্যেস কথা ব'লে ততটা নেই, এতক্ষণ একটানা কণ্ঠনালী ব্যবহার ক'রে শ্রান্ত হয়েছে। আসলে বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেই নিবন্ধটি রচনা করেছিলো সে,

তর্ক উঠলে অনেকেই তার পক্ষ নেবে এই বিষয়ে আগেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিয়েছিলো; তবু যদি হঠাৎ কেউ অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করে তাহ'লে ওরা সামলে নিতে পারবে কিনা সেই সন্দেহ, পড়ার ফাঁকে-ফাঁকেই, তাকে হানা দিচ্ছিলো।

পেছনের দেয়াল ঘেঁষে পাশাপাশি দুর্গাদাস আর শ্রীপতিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আরো মন-খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো তার। তারা ঘরে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই সে লক্ষ করেছিলো তাদের, আর সেটাও একটা কারণ, যার জন্য পড়ার সময় একবারও মাথা তুলে তাকাতে পারেনি। দুর্গাদাস তার প্রধান শত্রু, যদিও মৌখিক বন্ধুতার অভাব নেই, আর ওর চরিত্র এমন খোলামেলা যে কিছুতেই ওর ওপর রাগ করা যায় না। রথীন্দ্র জানে যে সমবয়সীদের মধ্যে দুর্গাদাসই একমাত্র, যে তার কবিতার ভক্ত নয়। সব সময় বলে, 'কী বাজে লিখছিস! পানসে। চিনি আর লেবুপাতার গন্ধ-মেশানো বার্লির মতো। ফেলে দে!' হেসেই বলে অবশ্য, কিন্তু কখনোই অন্য কিছু বলে না। তা এও না-হয় মেনে নিতে পারতো রথীন্দ্র, যদি তার এমন সন্দেহ না হ'তো যে মতটা আসলে দুর্গার নয়—শ্রীপতির। ঐ শ্রীপতি ভদ্র—লোকটার এত সাহস যে তিরিশের নিচে বয়স নিয়েও সে রথীন্দ্র রায়ের লেখার বিষয়ে কিছুই বলেনি, ভালো-মন্দ নিন্দা-প্রশংসা—কোনো কথাই না। আর তার ওপর ছাত্রমহলে বেশ প্রতিপত্তি লোকটার, (দুর্গাদাস তো আঠার মতো লেপ্টে আছে ওর সঙ্গে)—সে কফি-হাউসে এলে অনেকেই জিলজিল ক'রে ওঠে তার কথা শুনবে ব'লে, বলতেও পারে এঞ্জিনের মতো অনর্গল, কিন্তু এক-একদিন এমনও হয়েছে দু-ঘণ্টা নিঃশব্দে ব'সে থাকার পর নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে গেছে। যাকে বলে অসহ্য! তার বিষয়ে একটা রটনা এই যে সে দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস কিছুই পড়তে বাকি রাখেনি, কিন্তু রথীন্দ্র এই ভেবে সান্ত্বনা পায় যে শ্রীপতি চার বছর আগে বি. এ. পরীক্ষায় সাধারণ

একটা সেকেণ্ড ক্লাশ মাত্র পেয়েছিলো, আর তারপর এম. এ.টাও পড়েনি ; ট্যুশনি ক'রে চালাতে হয় ব'লেই অত বিষয় প'ড়ে নিতে হয়েছে তাকে, আর কতটা তার সত্যিকার বিদ্যে আর কতটা চালিয়াতি আর তার ভক্তবৃন্দের দামামা পেটানো, তা-ই বা কে জানে। আর তাছাড়া বিদ্যে যতই থাক না, ক্রিয়েটিভ তো নয়, ম'রে গেলে কে ওকে মনে রাখবে ? তবু, মাঝে কিছুদিন শ্রীপতিকে তাদের আড্ডার জায়গাগুলোতে দেখা যায়নি ব'লে বেশ শান্তিতে ছিলো রথীন্দ্র—ঠিক আজই আবার কোত্থেকে যে ফুঁড়ে উঠলো। ঐ হতভাগা দুর্গাদাসেরই কাণ্ড।

রথীন্দ্র একবার চোখ তুলে দেখলো দুর্গাটা শ্রীপতির পিঠে খোঁচা দিচ্ছে, আর ঘরে ভাসছে সিগারেটের ধোঁয়া, হাসির শব্দ, খুচরো কথা, কেউ-কেউ রুমাল নেড়ে হাওয়া দিচ্ছে মুখে। বেশ একটা হালকা আবহাওয়া ঘরে, যেন এইমাত্র কোনো হাসির কথা শুনেছে। একটু পরে শ্রীপতিকে দেখা গেলো লম্বা দেহ নিয়ে হেলে-দুলে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে। টেবিলটায় হাত চেপে দাঁড়ালো সে, আস্তে-আস্তে ঘর নীরব হ'য়ে এলে বলতে আরম্ভ করলো :

'আমি এখানে আসবো ভাবিনি, এসে কিছু বলবো তা আরো কম ভেবেছিলাম। কিন্তু রথীন্দ্র রায়ের অত্যন্ত সুলিখিত প্রবন্ধটি শুনে আমার মনে দু-একটি চিন্তার উদয় হ'লো, তাই কিছু না-ব'লে পারছি না।

'আমরা প্রথমেই "যুগসন্ধিক্ষণ" কথাটা শুনলাম। কথাটা খুব চেনা আমাদের, বড্ড চেনা। মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই কতবার শুনতে হ'লো! স্বদেশী আমলে যুগসন্ধি, অসহযোগে যুগসন্ধি, হিটলার-স্টালিনের যুদ্ধের সময় যুগসন্ধি, আর এখন, স্বাধীনতার দশ বছর পরে আবার শুনছি যুগসন্ধি। শুধু মহড়াই চলছে, নাটক আর শুরু হয় না। নবযুগ সর্বদাই আসন্ন, কিন্তু কখনোই আগত নয়।

'অবশ্য এক অর্থে যে-কোনো সময়কেই "যুগসন্ধি" বলা যায়, কেননা অতীতের সঙ্গে বর্তমানের বিরামহীন মিলনের নামই ইতিহাস। কিন্তু খুব সম্ভব ইতিহাস আর স্বীকার্য নেই—নয়তো কবিতাকে কী ক'রে এক-একটি দশকের মাপে ভাগ ক'রে নেয়া সম্ভব হ'লো? "তিরিশের কবি," "চল্লিশের কবি," "পঞ্চাশের কবি"—এ-রকম ক'রে বললে মনে হয় যে কবিরা সর্বদাই আঁতুড়ে মৃত্যুলাভ ক'রে থাকেন, অর্থাৎ কবিতা লিখতে আরম্ভ করার কয়েক বছর পরেই তাঁদের কোনো চিহ্ন আর থাকে না। আর তাহ'লে এই উনিশ-শো সাতান্ন সালে পঞ্চাশের কবিদের আয়ু তো আর তিন বছর মাত্র; এবং এই সভা, আর সভাস্থলে যা-কিছু বলাবলি হচ্ছে, সবই তাহ'লে অর্থহীন।'

'অন্তত আপনার কথা অর্থহীন!' চড়া গলায় কেউ একজন ব'লে উঠলো। মুহূর্তকাল চুপ ক'রে থেকে আবার বলতে লাগলো শ্রীপতি:

'তবে মানতেই হবে "যুগসন্ধি" কথাটা বেশ সুবিধাজনক। আমাদের পক্ষে তো খুবই। এই আমরা, আমার মতো বা আপনাদের মতো লোকেরা, যাদের প্রতিভা নেই, উদ্যম নেই, ধৈর্য নেই, অথচ আছে নিজের বিষয়ে উচ্চ ধারণা—ঐ "যুগসন্ধি" কথাটা না-থাকলে আমাদের কী মুশকিলই হ'তো ভাবুন দেখি! পরীক্ষায় ফেল করেছি—সমাজের দোষ। ভালো কবিতা লিখতে পারি না, এই দূষিত সমাজ তার জন্য দায়ী। আমার স্ত্রী আমাকে ভালোবাসে না—সেটাও সমাজব্যবস্থারই কুফল। কোনো-এক অস্পষ্ট অনির্ণেয় উপায়ে নবযুগ আসবে, তারপর আমার অর্থের কোনো অভাব থাকবে না, কবিতা লিখে বিখ্যাত হবো, একটি সাধ্বী স্ত্রী ও দশটি রূপসী প্রণয়িনী জুটবে। আমাকে খাওয়াবে সমাজ, পরাবে সমাজ, বুদ্ধি দেবে সমাজ, সুখ দেবে সমাজ, আমার উঠোনের আগাছা সাফ ক'রে দেবে সমাজ, আমার চমৎকার কবিতাগুলি লিখে দেবে সমাজ, নিজের ওপর কোনো দায়িত্বই আর রাখতে হ'লো না। কী আরাম!'

কে যেন হেসে উঠলো; রথীন্দ্রর মুখ ক্ষণে-ক্ষণে লাল আর

ফ্যাকাশে হ'তে লাগলো ; একজন চেঁচিয়ে বললো, 'রথীন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ আমাদের আলোচ্য, তার সঙ্গে আপনার কথার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'নেই কি? আমরা এইমাত্র উপদেশ শুনলাম, "সুখী হও। তাহ'লেই আর-সব হবে।" কিন্তু সুখী হ'তে পারে শুধু তারাই, যারা নিজের ওপর কোনো দায়িত্ব নিতে পারে না—নিতে চায় না। পারে তারাই, যারা শুধু নিজেকে নিয়ে তৃপ্ত, নিজের গণ্ডির বাইরে যাদের চোখ চলে না। যে-পৃথিবীতে রোগ আছে, বঞ্চনা আছে, আছে বিকলাঙ্গ, কুষ্ঠরোগী, পঙ্গু, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, আছে জরার যন্ত্রণা আর আততায়ীর ছুরি, আছে ভয়, লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, আর সবার ওপরে আছে মৃত্যু—সেই পৃথিবীতে সত্যি কি কেউ সুখী হ'তে পারে? আপনারা রাষ্ট্রিক সুব্যবস্থার দ্বারা দারিদ্র্য দূর করবেন? যত উত্তম ব্যবস্থাই করুন না কেন, কোনো-একজনের তুলনায় অন্য কোনো-একজন কিছু বেশি পাবেই—হয় বুদ্ধির জোরে, নয় চক্রান্ত ক'রে, নয়তো নেহাৎই ভাগ্য ভালো ব'লে। সমাজ চালাতে হ'লে কিছু লোককে কিছু অতিরিক্ত সুবিধে দিতেই হবে, আর তাদের তুলনায় কোটি-কোটি অন্যেরা গরিব থাকবেই—হয় ক্ষমতায়, নয় টাকার অঙ্কে গরিব, আর ও-দুই আসলে একই কথা। আপনারা বিজ্ঞানের বলে সব রোগ নির্মূল করবেন, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবেন নির্জর দেহে একশো বছর পর্যন্ত? কিন্তু আমরা এখনই দেখছি যে পুরোনো রোগের সফল চিকিৎসা নতুন রোগের জন্ম দিচ্ছে; দেখছি এই বিশল্যকরণী পেনিসিলিনের যুগে পোলিওর উত্থান, ক্যানসারের আতঙ্ক, বজ্রপাতের মতো থ্রম্বসিস। আপনারা হয়তো বলবেন যে সর্বমানবের জন্য কল্যাণসাধনা সবেমাত্র শুরু হয়েছে, যা-কিছু মানুষের পক্ষে গ্লানিকর ও হানিকর তা সবই উচ্ছেদ করতে পারবে মানুষের সুবুদ্ধিপ্রণোদিত বিজ্ঞানের শক্তি। বেশ, তা-ই না-হয় হ'লো; না-হয় এমন দিনের কল্পনা ক'রে নিচ্ছি যখন পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সব রকম সুযোগ-সুবিধের নিক্তি-মাপা

সমান অংশ পাবে, কেউ বুড়ো হবে না, হাঁপানিতে ভুগবে না, দাঁত-ব্যথার কষ্টটুকুও পাবে না—মানুষ রোগ আর জরার অর্থ ভুলে যাবে। কিন্তু সেই স্বর্গরাজ্যেও এমন নিশ্চয়তা কোথায় যে আমার প্রতিবেশী আমার চেয়ে বেশি সুশ্রী বা বেশি বিদ্বান বা বেশি বুদ্ধিমান ব'লে আমি হিংসায় জ্ব'লে-জ্ব'লে রোগা হয়ে যাবো না, বা আমি যাকে ভালোবাসি সেও আমাকেই ভালোবাসবে? বিজ্ঞান কি এমন ইঞ্জেকশন আবিষ্কার করবে যার ফলে ঈর্ষাবৃত্তি দূর হ'য়ে যাবে মানুষের, সে যাকে চায় তাকে না-পেলে তক্ষুনি তার বদলে অন্য যে-কোনো একজনকে ভালবাসতে পারবে—অর্থাৎ কেউ আর অন্য কাউকে ভালোবাসবে না বা ঘৃণা করবে না? কিন্তু তাও যদি সম্ভব হয়, যদি মানুষ তার সুখের জন্য এতদূর পর্যন্ত পরিহার করে তার মনুষ্যত্বকে—তবু তো থাকবে মৃত্যু, আর মৃত্যু থাকলেই ভয় থাকবে, দ্বেষ থাকবে, হিংসা থাকবে, আর দুঃখ শোক আর্তি আতঙ্ক ঝাঁকে-ঝাঁকে ফিরে আসবে সেই একটি দরজা দিয়ে। এখন আপনারা বলুন, আপনারা কি মৃত্যুকে জয় করবেন, মৃত্যু কি আর থাকবে না?'

একটু থামলো শ্রীপতি। কেমন অদ্ভুত আর বন্য দেখাচ্ছে তাকে, প্রায় হিংস্র, কোনো অবরুদ্ধ বাষ্পে তার বুকের ভেতরটা ফুলে-ফুলে উঠছে যেন। গায়ের জামাটা আধ-ময়লা, পাজামা কুঁচকোনো, হাতের পাতা দুটো মস্ত, সারা মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। নড়বড়ে লম্বা শরীর নিয়ে একটু কুঁজো হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তার চোখ দুটো, চোখের শাদা অংশ লালের ফোঁটায় দগদগে। উপস্থিত অনেকেরই মনে হচ্ছে সে একেবারে অবান্তর বিষয়ে কথা বলছে, খিড়কি-দোর দিয়ে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করছে রথীন্দ্রকে, কিন্তু হঠাৎ 'মৃত্যু' কথাটার মুখোমুখি প'ড়ে গিয়ে কেউ তক্ষুনি কোনো উত্তর খুঁজে পেলো না। গালের পেশী শক্ত হ'লো অনেকের, কপালে রেখা পড়লো।

'কথাটা হচ্ছে,' নিশ্বাস নিয়ে আবার বলতে লাগলো শ্রীপতি,

'আমি এই মুহূর্তে সুস্থ আছি ব'লেই কি রোগের অস্তিত্ব ভুলে থাকবো? অটুট আছি ব'লেই ভুলে থাকবো পঙ্গুকে? জীবিত আছি ব'লেই মৃত্যুকে ভুলে থাকবো? না কি, যেহেতু পাখি ডাকে, ফুল ফোটে, শিশুরা খেলা করে, সেইজন্যে এই জগৎটাকে এক বাটি পেস্তা-আর-কিশমিশ-মেশানো পায়েস ব'লে কল্পনা করবো, যার সরের ওপরে একপাল অমর পিঁপড়ের মতো আটকে আছি আমরা? ফুল ফোটে, না-ফুটে পারে না ব'লে; পাখি ডাকে, যেহেতু সে ডাকতে বাধ্য; এর জন্যে তাদের বাহবা দেবার কিছু নেই;—আসলে যাতে এসে যায় তা এই আমি, যে-আমি ফুল আর পাখির গানকে "সুন্দর" ব'লে অনুভব করছি—আমি, একজন মানুষ। মানুষকে বলা হ'য়ে থাকে শ্রেষ্ঠ জীব, কিন্তু মানতেই হবে সে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, কেননা প্রাণীদের মধ্যে শুধু মানুষই জানে যে মৃত্যু অনিবার্য। তাহ'লে প্রশ্ন এই: মানুষ হিশেবে জগতে আমাদের বিশেষ স্থানটি কোথায়।

' "সুখ, শ্রম, বেলফুল, কলমিলতা, স্বাস্থ্যময় ঘুম।" অর্থাৎ একটি চাকরি, একটি স্ত্রী, দুটি সন্তান (দুটির বেশি নয়), বছরে কুড়ি টাকা ক'রে বেতনবৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, বছরে একবার ক'রে ময়ুরভঞ্জ বা রাজগির, বছরে একবার ক'রে শরৎ ঋতুতে কবিতা লেখা—কেননা পুজো-সংখ্যায় কবিতার জন্যেও টাকা দেয়। সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব রাখা, কেননা কে কখন কাজে লেগে যায় বলা যায় না; কিন্তু কারো সঙ্গেই ঠিক ঘনিষ্ঠ না-হওয়া—কেননা ঘনিষ্ঠ হ'লেই সে কখনো কিছু দাবি ক'রে বসতে পারে। আমি, আমার একটি স্ত্রী, আর এই দু-জনের দুটি সন্তান—শুধু এদেরই জন্য বেঁচে আছি আমি, আর-কিছুতেই আমার কিছু এসে যায় না। হাঙ্গেরির ব্যাপার হাঙ্গেরি বুঝবে, তিব্বত-চীন নিজেরা যদি রফা করতে না পারে আমি সেখানে কোন অধিকারে কিছু বলতে যাবো, আর রুশ-মার্কিনের অস্ত্রসজ্জাকে সেই-সেই দেশের লোক যদি নিন্দে না করে, আমরা কেন মা-র

চাইতে মাসি বড়ো হ'তে যাই ? অন্ততপক্ষে ঝোঁকের মাথায় সকলের আগে কিছু ব'লে ফেলবো না ; কিছুদিন সবুর ক'রে যেদিকে দলে ভারি দেখবো সেদিকেই হেলবো। সত্যি তো, প্যারিস মস্কো ন্যুয়র্কে যাবার কোনোই প্রয়োজন নেই আমাদের—ও-সব জায়গা যে বড্ড গোলমেলে, আর আমরা হলাম নির্বিবাদী ভালোমানুষের দল ; দু-শো বছর ধ'রে পশ্চিমী দেশগুলো বাঙালির সাধনাকে যতখানি বিধ্বস্ত করেছে এবার আমরা তারই সংস্কারক্রিয়ায় লেগে যাচ্ছি—নতুন কিছু গ'ড়ে তোলাও নয়, শুধু মেরামত, চুনকাম, পালিশ করা, তালি লাগানো। উপার্জন ও মাতব্বরি করবো শহরে, কিন্তু পাঁচালি গাইবো বটতলা চণ্ডীমণ্ডপের ; পাশ-করা চাকুরে মেয়ে ছাড়া বিয়ে করবো না, কিন্তু ভজনা করবো নাকছাবি আর পাছাপাড়-শাড়ির ; অনাথা বুড়ি পিসিকে একবেলা খেতে দেবো না, কিন্তু তার কুঁচকোনো চামড়ায় বাংলার অজেয় প্রাণশক্তি আবিষ্কার করবো। সন্দেহ নেই, এর চেয়ে সুখের জীবন আর-কিছু হ'তে পারে না।'

কাশির শব্দ হ'লো, তিন-চারজন একসঙ্গে জুতো ঘষলো মেঝেতে। আরতির কাঁধে টোকা দিয়ে গৌতম ফিশফিশ ক'রে বললো, 'শ্রীপতি কী-রকম ঘেমেছে দেখছো ? ওর পকেটে রুমাল নেই ?'

কিন্তু আরতি মুখ ফেরালো না। প্রথম থেকে সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো শ্রীপতির দিকে, নিটোল ঘাড়ের ওপরে তার মাথাটি সাপুড়ের বাঁশির শব্দে সাপের ফণার মতো ঈষৎ দুলছে। জ্বলজ্বল করছে চোখ, ভরপুর ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি। সেই চোখের ওপর হঠাৎ একবার চোখ পড়ামাত্র দৃষ্টি সরিয়ে নিলো শ্রীপতি।

'আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে বুঝতে পারছি, কিন্তু আমাকে আর দু-মিনিট সময় দিন। আসল কথা, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ শুনে আমি আজ মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছি ; অমন সরল সত্যভাষণের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ না-জানিয়ে পারছি না। বীর, সন্ন্যাসী ও তপস্বীদের আর চাই না আমরা, আর চাই না কোনোরকম আশ্চর্যকে—এই কথাটা

এমন অকপট সাহসের সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশেও আর কে ঘোষণা করতে পারতো? কেন তা চাইবো—আমরা নিজেরা যে এতটুকু আশ্চর্য নই, বিস্মিত হ'তেও ভুলে গেছি আমরা; আমরা যে সাধারণ, অতি সাধারণের মধ্যেও সাধারণ। আমাদের আগে যাঁরা জন্মেছিলেন এই দেশে—এই রামমোহন বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথের মতো লোকেরা আরকি—তাঁদের কেবলই চেষ্টা ছিলো অসাধারণ হবার—আর অসাধারণ হ'তে পেরেওছিলেন বোধহয় কেউ-কেউ—আর তাঁদের সময়কার সাধারণ লোকেরা নিজেরা সাধারণ ব'লে বোকার মতো বিনীত হ'য়ে ভক্তি করতো অসাধারণকে, বীরপূজা ক'রে ইচ্ছাপূরণ করতো তারা—এমনকি রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখাটি সুদ্ধু নকল করতো। ভাবুন দেখি—কোথায় আমাদের তালপাতার পুঁথির খাড়া-খাড়া খাঁটি বাঙালি হাতের লেখা, আর কোথায় রবীন্দ্রনাথের প্যাঁচানো, গোল আর লীলায়িত ভঙ্গি, যেন এ-বি-সি-ডি-র ছাঁদে ক-খ-গ-ঘ লিখছেন—বাংলার লোকায়ত সাধনার এতো বড়ো ক্ষতি কিনা মেনে নিয়েছিলো আমাদের বাবার বয়সি বাঙালিরা! এদিকে আমাদের সুবিধের কথা ভাবুন: আমরা সাধারণ, আর সাধারণ হওয়াটাই গৌরবের বিষয় আমাদের কাছে, অসাধারণত্বই লজ্জার—অসাধারণদের গণ্ডদেশে কেমন নির্বিঘ্নে চুনকালি লেপন করতে পারছি আমরা, আর কেমন নিজেদের সাধারণত্বের গর্বে বছরে পাঁচ পাউণ্ড ক'রে ওজনে বাড়ছি—এমন সুখ, এমন আরাম, এমন নিশ্চিন্ত আত্মপ্রত্যয় আর কি কেউ ভোগ করেছে কোনোদিন? আমরা বাঁচবো—সাধারণ, অতি সাধারণ, সাধারণের মধ্যেও সাধারণ হ'য়ে বাঁচবো—এই আমাদের একমাত্র কথা। বিজ্ঞানের জোরে, আর আত্মা নামক কষ্টদায়ক উপসর্গটাকে উপড়ে ফেলেছি ব'লে, আমরা অনেক, অনেক, অনেকদিন বাঁচবো—বাঁচবো একশো বছর, দেড়শো বছর, দু-শো বছর—মস্ত বুড়ো কোলাব্যাঙের মতো বাঁচবো, মোটা নিরীহ নির্বিষ ঢোঁড়াসাপের মতো, ইঁদুর, টিকটিকি, আরশোলা—

আরশোলা—আরশোলা—আরশোলা—' ভাঙা গ্রামোফোন-রেকর্ডের মতো শ্রীপতি হঠাৎ আটকে গেলো এখানে, তার উঁচু কণ্ঠমণিটা কথা বলার চেষ্টায় জোরে ন'ড়ে উঠলো, ঠোঁটের কোণে ফেনা দেখা দিলো, গোল হ'য়ে উঠলো চোখ দুটো, ঘামে-চিকচিকে কপালে চুলের গোছা লুটিয়ে পড়লো। একটু থেমে, ঢোঁক গিলে, গলা নিচু ক'রে আবার বলতে লাগলো—'ক্ষমা করবেন, আপনাদের সকলের হ'য়ে কথা বলার মতো স্পর্ধা আমার নেই, আমি শুধু আমার নিজের কথা বলছি—আমার একটা মজার স্বপ্ন। আপনাদের সঙ্গে ব'সে কফি খেয়ে, ফুচকা খেয়ে, জিলিপি খেয়ে, নানা বিষয়ে আলোচনা ক'রে, বহু পরিশ্রমে গ'ড়ে-তোলা এক-একটি কীর্তিকে হাসির হররায় ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে—তারপর রাত্রে যখন বাড়ি ফিরি, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ি বিছানায়, আশে-পাশে সব বাড়ির আলো নিবে যায়, কেউ আর আমাকে দেখছে না—তখন আমার মনে হয় আমি একটা আরশোলা হ'য়ে গিয়েছি, তেলতেলে খয়েরি রঙের স্বাস্থ্যবান একটি আরশোলা, বাথরুমের পেছল প্যানে আরামে নেমে গিয়ে—খাচ্ছি আর বেঁচে থাকছি, খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছি আর বেঁচে থাকছি, চেটে-চেটে খাচ্ছি আর বেঁচে থাকছি। আপনাদের কখনো মনে হয় না এ-রকম?'

শেষের কথাটা—যা শ্রীপতি বললো একেবারে ফিশফিশে গলায়, কিন্তু সকলেই শুনতে পেলো—তা উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে খক ক'রে একবার কাশলো সে, একটি শ্লেষ্মার পিণ্ড উঠে এলো তার মুখের মধ্যে, সেটাকে গিলে ফেলা অসম্ভব মনে হ'লো। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গিয়ে মুখ ধোবার ঘরে ঢুকলো সে, মুখ থেকে যা উগরে তুললে তা টুকটুকে লাল। আবার একটু কেশে যা তুলে আনলো তাও লাল। তৃতীয় বারেও রঙের বদল হ'লো না, লোনা স্বাদে মুখ ভ'রে গেলো। বেসিনটার দিকে প্রায় পুরো এক মিনিট তাকিয়ে রইলো, তারপর জোরে কল ছেড়ে দিলো, সেই লাল রং নিশ্চিহ্ন হ'তে বেশ একটু সময়

লাগলো। 'আমার বোধহয় কোনো অ্যান্টিসেপটিক ঢেলে দেয়া উচিত—কিন্তু কিছুই তো নেই এখানে।' হঠাৎ বুঝলো তার মাথা ঘুরছে, সারা শরীর কাঁপছে ভেতরে-ভেতরে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে, আর-কোনো দিয়ে না-তাকিয়ে, টলতে-টলতে নেমে গেলো সিঁড়ি দিয়ে।

লোকেরা বোঝেইনি যে তার বক্তৃতা ওখানেই শেষ হয়েছে; ও-রকম হঠাৎ সভা ছেড়ে সে চ'লে যাওয়ায় বড্ড অবাক হ'লো সবাই, রথীন্দ্র ও তার ভক্তরা অপমানিত বোধ করলো শ্রীপতি তার কথার জবাবটা শোনার জন্য অপেক্ষা করলো না ব'লে। অনেক রকম মন্তব্য হ'লো তাকে নিয়ে, তারপর আরো ঘণ্টাখানেক সভা চললো।

৪

'সপ্তর্ষি'র মীটিং তখনও ভাঙেনি, কিন্তু ভিড় পাৎলা হ'য়ে এসেছে, এমন সময় একজন নতুন শ্রোতা ঘরে এসে ঢুকলো। ছোটোখাটো পাৎলা গড়নের একটি মেয়ে, বয়স তেইশ-চব্বিশ, চোখ দুটি ভাসা-ভাসা—খুব শান্ত ধরনের তাকানো। বন্দনা তাকে দেখতে পেয়ে হাত তুলে ডাকলো।

—'অমলা, এই যে!'

অমলা বসলো বন্দনার পাশে, কিছুটা মনোযোগীভাবে সামনের দিকে তাকালো। সেখানে টেবিল ঘিরে ব'সে আছে আরো কয়েকটি যুবকের সঙ্গে রথীন্দ্র আর দুর্গাদাস, তর্ক চলছে এলোপাথাড়িভাবে। হাসির শব্দ, সিগারেটের ধোঁয়া, দুর্গাদাস টেবিলে চাপড় মারছে মাঝে-মাঝে, মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছে শ্রোতাদের মধ্যে কেউ-কেউ, কোথাও বা দু-তিনজন আলাদা হ'য়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। তার্কিকদের মধ্যে কেউ-কেউ অমলার চেনা, কিন্তু তারা প্রতিপক্ষের জবাব দিতে এত ব্যস্ত যে তাকে কেউ লক্ষ করলো না।

বন্দনা বললো, 'অমলা, তোমার কী খবর-টবর বলো। অনেকদিন দেখিনি তোমাকে।'

'নতুন কোনো খবর নেই।'

'বি. টি. পড়ছো শুনলাম?'

'এ-বছর সীট পেলাম না। সামনের বার আবার চেষ্টা করবো।'

দুর্গাদাসের কী-একটা কথা শুনে হিমেন্দু পেছন থেকে নিচু গলায় হেসে উঠলো।

'আহা—শুনতে পেলাম না কথাটা,' বন্দনার গলায় আপশোষ ফুটলো। 'হিমেন্দু, দুর্গাদাস কী বললো বলো না! অমলা, তুমি শুনেছিলে?'

'না, আমি ঠিক—'

বন্দনা একটা ক্লান্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললো, 'কী নিয়ে যে এত তর্কাতর্কি তা-ই বোঝা যাচ্ছে না।'—হিমেন্দু, অমলাকে চেনো তো?'

হিমেন্দুর ঠোঁটে লাজুক হাসি ফুটলো। 'দেখেছি মাঝে-মাঝে কফি-হাউসে, ঠিক আলাপ হয়নি।'

'অমলাও নিশ্চয়ই হিমেন্দুর কথা শুনেছো—দুর্গাদাসের কাছে?'

'শুনেছি বইকি।' অমলা আবার সামনের দিকে তাকালো, যেন ওখানে কী কথাবার্তা হচ্ছে তা শুনতে চায়, বা যেন এখানে সে অন্য কোনো দরকারে এসেছে, কোনো তর্কে বা খুচরো আলাপে মন নেই, সভা শেষ হবার জন্যই অপেক্ষা করছে শুধু। আর সত্যিও, ঘরের মধ্যে চেয়ার ঠেলার শব্দ হওয়ামাত্র এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো সে, দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির ধারে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তর্ক চালাতে-চালাতে দুর্গাদাস সদলে এগিয়ে এলো সেদিকে।

—'আমি বলি, আরো বেশি অশান্তি এখন দরকার আমাদের। খুব একটা তোলপাড়, নাড়াচাড়া—'

—'থামো, দুর্গাদাস! শ্রীপতির বুলি আর আউড়িয়ো না!'

—'শ্রীপতি সপ্তাহে-সপ্তাহে মত বদলায়—অতএব দুর্গাদাসও।'

—'বাজে বোকো না! কেন মেনে নাও না যে শ্রীপতি অসাধারণ, আর তাই তোমরা—'

'দুর্গাদাস!'

নিচু মেয়েলি গলায় নিজের নাম শুনে দুর্গাদাস থমকে থেমে

গেলো। 'আরে—অমলা! তুমি কোত্থেকে?—মানে, বলছিলাম কী, আগে যদি আসতে—' অমলার ঈষৎ ফ্যাকাশে-হ'য়ে-যাওয়া মুখ থেকে দুর্গাদাসের চোখ স'রে গেলো হিমেন্দুর দিকে।—'আশ্চর্য যা হোক! এতক্ষণের মধ্যে তুমি একটা কথা বললে না, হিমেন্দু?'

'সেটা বাহুল্য হ'তো। এখানে আর যা-ই হোক বক্তার অভাব ছিলো না।'

মুখে হাসি টেনে এগিয়ে এলো রথীন্দ্র রায়।

—'অমলা, আপনি কখন এলেন?'

হাসির চেষ্টা ক'রে অমলা জবাব দিলো—'এই খানিকক্ষণ।'

'এত দেরি ক'রে?'

অন্য একটা কাজ ছিলো, তাই—'

'খুব অন্যায়, খুব অন্যায়—' দু-বার মাথা নাড়লো রথীন্দ্র। 'আমাদের আগের মীটিঙেও আপনি আসেননি মনে হচ্ছে? এ-সব ব্যাপারে আপনার উৎসাহ এত কম কেন বলুন তো?'

আর-একজন বললো, 'আজ দারুণ জমেছিলো, জানেন। রথীন্দ্র যে প্রবন্ধ পড়লো না—চমৎকা-র! পড়বেন সামনের সংখ্যা "সপ্তর্ষি"তে।'

এই প্রশংসা ঈষৎ সলজ্জভাবে মেনে নিয়ে রথীন্দ্র বললো, 'আমার লেখা আপনি না-পড়লে আমি কিন্তু দুঃখিত হবো না, অমলা দেবী। সাহিত্যের বদলে কোনো ব্যক্তির বিষয়ে উৎসাহ নেয়াই বেশি ভালো মনে হয় আমার,' ব'লে দুর্গাদাসের দিকে বাঁকা চোখে তাকালো রথীন্দ্র, অমলা একটু লাল হ'লো।

হুড়মুড় ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নামলো তরুণের দল, বেরিয়ে এলো রসা রোড আর মনোহরপুকুরের মোড়ে—সেখান থেকে কেউ বাড়িমুখো বাস্ ধরলো, কেউ ছুটলো অন্য আড্ডার সন্ধানে, হিমেন্দু আর বন্দনা একটা বালিগঞ্জের ট্রামে উঠে পড়লো, আর দুর্গাদাস অন্য

দুটি ছেলের সঙ্গে উত্তেজিতভাবে কথা বলতে-বলতে ল্যান্সডাউন রোডের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। তাদের দ্রুত চলার সঙ্গে তাল রাখতে পারলো না ছোটোখাটো অমলা, পেছিয়ে প'ড়ে-প'ড়ে এক সময় হারিয়েও ফেললো দুর্গাদাসকে, তারপর প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে খুঁজে পেলো ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ে। একটা পানের দোকানের সামনে একা দাঁড়িয়ে ছিলো দুর্গাদাস, দূর থেকে অমলাকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে ডাকলো, 'এই যে! এখানে।'

তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হ'য়ে অমলা এগিয়ে এলো।

'বাঃ, তুমি ছিলে কোথায়? আমি খুঁজছিলাম তোমাকে।'

'আমাকে খুঁজছিলে?' অমলার ঠোঁটে ম্লান হাসি ফুটলো।

'শোনো, আমার পকেট বিলকুল ফাঁকা, সিগারেট কেনার পয়সাটাও নেই। গোটা পাঁচেক টাকা দিতে পারো?'

'পাঁচটা?'

'নেই?' দুর্গাদাস ভুরু কুঁচকোলো।

'নেই তা নয়, তবে তা দিয়ে মা-র জন্য একটা ওষুধ কিনতে হবে। তাছাড়া এ-মাসে ট্যুশনির টাকাও পাইনি এখনো—'

'ও।' দুর্গাদাস গম্ভীর হ'য়ে চুল টানতে লাগলো। 'তা তোমার মা-র ওষুধ কাল কিনলে হয় না? আমার যে বড্ড দরকার।'

অমলা চোখ তুলে দুর্গাদাসের দিকে তাকালো একবার, তারপর নিঃশব্দে একটি দশ টাকার নোট বের ক'রে দিলো।

'দ-শ টা-কা! গ্র্যাণ্ড!' মুহূর্তকাল দেরি না-ক'রে সিগারেট কিনলো দুর্গাদাস, ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে খুশি গলায় বললো, 'অমলা, তুমি সত্যি আশ্চর্য! কী ক'রে এমন হয় যে তোমার হাতে সব সময় টাকা থাকে, আর আমার হাতে কখনোই কিছু থাকে না?'

এ-কথার কোনো জবাব না-দিয়ে অমলা বললো, 'তুমি কি এখন বাড়ি যাবে?'

'বাড়ি? এক্ষুনি? কী ক'রে ভাবতে পারলে কথাটা!'

অমলা হালকা গলায় বললো, 'তাহ'লে আমাদের ওখানে চলো না।'

'তোমাদের ওখানে? আমি ভাবছিলাম...'

'নয়তো চলো দেশপ্রিয় পার্কে গিয়ে একটু বসি। যাবে?'

'নাঃ, পার্কে যা ভিড় এই গরমের দিনে! বরং—আচ্ছা চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিই। ঐ ট্যাক্সিটা ধরা যাক।'

অমলা ত্রস্ত গলায় ব'লে উঠলো, 'ট্যাক্সি? ট্যাক্সি দিয়ে কী হবে?'

সে-কথায় কর্ণপাত না-ক'রে দুর্গাদাস একটা চলতি ট্যাক্সি থামালো।

'উঠে পড়ো!'

'মিছিমিছি কেন—'

'ওঠো না!'

'কোনো দরকার ছিলো না—'

'সব সময় সিকি-আধুলির হিশেব কোরো না তো!' অমলার পিঠে ঠেলা দিয়ে তাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিলো দুর্গাদাস, নিজে উঠে প'ড়ে বললো, 'গল্‌ফ ক্লাব রোড।'

'আঃ, আরাম!' ট্যাক্সি চলতে শুরু করামাত্র দুর্গাদাস এলিয়ে ব'সে নিশ্বাস ছাড়লো। 'আমি ভাবছি কী জানো, অমলা? একটা চাকরি-ফাকরি পাওয়ামাত্র প্রথমেই একটা স্কুটার কিনবো—বাস্‌-এর বাদুড়-ঝোলা আর সহ্য হয় না!'

অমলা কথা বললো না। তারও আরাম লাগছিলো—আরো বেশি: এই চলন্ত আধো-অন্ধকারে, দুর্গাদাসের পাশে নিভৃতে ব'সে, তার হাতের খুব কাছাকাছি হাত রেখে, সুখের মতো একটা অনুভূতি হচ্ছিলো তার। ট্যাক্সির জন্য যে বাজে-খরচ হ'লো, মা-র ওষুধ যে কেনা হ'লো না, আর আজ বিকেল থেকে অন্য যে-সব কথা সে ভাবছিলো, অনেকদিন ধ'রেই ভাবছে বলা যায়—সবই সে ভুলে গেলো তখনকার মতো, মন থেকে সরিয়ে দিলো অন্তত। চেষ্টা করলো

খুব গভীরভাবে দুর্গাদাসের উপস্থিতিটুকু অনুভব করতে।··· কতদিন— কতদিন হ'য়ে গেলো! আরম্ভ সেই ছেলেবেলায়, শ্যামবাজারে হরি ঘোষ স্ট্রিটের গলিতে, কাছাকাছি বাড়িতে থাকি আমরা, ওর তখনও গোঁফের রেখা পড়েনি, আমি তখনও সাবানের বাক্সে রং-বেরঙের রাংতা জমাই। বিধবা মায়ের এক সন্তান আমি, মা যে-স্কুলটায় পড়ান আমি সেখানকারই ছাত্রী, একসঙ্গে যাওয়া-আসা করি দু-জনে, ভারি শান্তভাবে দিন কাটে আমাদের, কাটছিলো—যতদিন না দুর্গাদাস তার সব দুরন্তপনা নিয়ে ঢুকে পড়লো আমাদের জীবনের মধ্যে। চেনাশোনা, মেলামেশা, ছেলেমানুষি আড়ি আর ভাব, ছেলেমানুষি ফুল, চিঠি, চুমো, তারপর একদিন আমরা বুঝে নিলাম আমাদের বিয়ে হবে। সে কবে, তা যেন আর মনেও পড়ে না। ও আর আমি এক বাড়ির লোক, আমাদের মধ্যে একজনের মা অন্যজনেরও মা, দু-জনে দু-জনের ভালো-মন্দের, সুখ-দুঃখের অংশিদার— এই ধারণাটা ঘিরে রইলো দুটি পরিবারকে, বছরের পর বছর। সেটা এত নিশ্চিত যে তা নিয়ে আর আলাদা ক'রে ভাবতেও হয় না, তা নিয়ে কোনো কথা বলারও দরকার নেই। কত কিছু বদল হ'লো এর মধ্যে—দুর্গাদাসের বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, পুঁজিপাটা ভাঙিয়ে মেয়ের বিয়ে দিলেন ওর মা, আমার মা দমদম স্কুল থেকে ছাঁটাই হ'য়ে টালিগঞ্জের একটা স্কুলে কিছুটা কম মাইনেতে চাকরি নিলেন, আমরা উঠে এলাম হরি ঘোষ স্ট্রিট ছেড়ে গল্‌ফ ক্লাব রোডে, আমি এম. এ. পাশ ক'রে বেরোলাম—আর এখনো সেই ধারণা আঁকড়ে আছে আমাদের, আমাদের দুই মা আর কাউকে ভাবতে পারে না জামাই বা ছেলের-বৌ ব'লে, বড়োমামা মাঝে-মাঝে আমার বিয়ের যে-সব সম্বন্ধ আনেন মা সেগুলো আলগোছে উড়িয়ে দেন। আর আমরা— আমরা নিজেরা?

লেকের ধার দিয়ে ট্যাক্সি চলেছে, মুখে লাগছে হাওয়ার ঝাপট, টালিগঞ্জ ব্রিজ পার হ'লো। 'সব সময় সিকি-আধুলির হিশেব কোরো

না তো।' কিন্তু দুর্গাদাস কি জানে না আমার মা কখনো পারতপক্ষে ট্যাক্সি নেন না, নিজের জন্য অতিরিক্ত কিছু খরচ করতে নারাজ তিনি, সে কি জানে না, সারাদিন স্কুল করার পর এখন আবার আর-একটা জায়গায় পড়াতে গেছেন আমার মা? অনেকদিন ধ'রেই সঞ্চয় করা তাঁর অভ্যেস—কেন? মেয়ে, মেয়ের বিয়ে, যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হবে: এ-ই তো তাঁর জীবনের ধ্যানজ্ঞান। দুর্গাদাসকে বছরে চার বার জামা-কাপড় দেবেন তিনি, তার ফাউন্টেন পেন চুরি গেছে শুনে তক্ষুনি কিনে দেবেন সাত দোকান ঘুরে-ঘুরে পার্কার কলম—আমি মৃদু প্রতিবাদ করি মাঝে-মাঝে, বলি, 'মিছিমিছি কেন—' মা বলেন, 'মিছিমিছি তো নয়।' মা একটু-একটু ক'রে গয়না গড়াচ্ছেন সেই কবে থেকে; আমি যত বকাঝকা করি সব শুনে একটু হাসেন শুধু, কিছু বলেন না। আর মা-কে দেখে-দেখে আমারও যেন আলগা সুখের ইচ্ছেটা ম'রে গিয়েছে; সুখ বলতে শুধু একটা জিনিশই বুঝি আমি—তা তোমাকে নিয়ে, তোমাকে নিয়েই, দুর্গাদাস।

অমলা আড়চোখে একবার দুর্গাদাসের দিকে তাকালো। গাড়ির কোণে মাথা রেখে পা দুটো ছড়িয়ে দিয়েছে সে, চোখ বোজা, ঝিমুনি এসেছে বোধহয়—যা ঘোরাঘুরি করে সারাদিন! কোনো দোকান থেকে এক ঝলক আলো তার মুখে প'ড়ে তক্ষুনি মিলিয়ে গেলো—অমলার চোখে পড়লো তার ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক হ'য়ে আছে, আবছা হাসির মতো ধরনটা। সুখী আর অনাবিল মনের মানুষ এই দুর্গাদাস—ওর ঠোঁটের গড়ন সুন্দর, হাসলে ভালো দেখায় ওকে। ও সরল, ও সহজ, হো-হো ক'রে হাসতে জানে ও, ওর কোনো বন্ধুর কেউ নিন্দে করলে মারমুখো হ'য়ে উঠতে জানে—তাই ওকে সব মানিয়ে যায়, ওর কোনো দোষ দোষ ব'লে গণ্য হয় না, ওর অবিবেচনা, ওর সাধারণ দায়িত্বজ্ঞানের অভাব — সবই 'মিষ্টি' ব'লে বিখ্যাত হয় ওর বন্ধুমহলে। তা বন্ধুদের পক্ষে ঠিক আছে, কিন্তু আমার কি আরো একটু বেশি পাওনা নেই? বলো না, দুর্গাদাস,

কিছু বলো, তোমার ঐ সুন্দর ঠোঁট খুলে কিছু বলো আমাকে—বইয়ের কথা নয়, সাহিত্য নিয়ে তর্ক নয়, 'আমাদের' কথা কিছু বলো। বলো, আমাদের মায়েরা যা ধ'রে ব'সে আছেন, তা কি সত্য? এত বছর ধ'রে আমরা যা জেনে আসছি তা কি সত্য? আর এই আমি যাকে 'আমরা' ব'লে ভাবছি, তার অর্থ কি সেই তুমি আর আমি? না কি···না কি···?

ঠেলে-ওঠা প্রশ্নটাকে চেপে দিলো অমলা, আস্তে একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো। কেন আমি কঠিন হ'তে পারি না, কেন ওকে দেখলেই আমার মনের ভাব বদলে যায়, আমাদের দু-জনের ভালোর জন্যেই যা বলা উচিত তা বলতে গেলে মুখে কথা বেধে যায় কেন? বলো তো, দুর্গাদাস, আড্ডা দিয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কী করো তুমি সারাটা দিন? গেলোবার খামকা এম. এ. পরীক্ষাটা দিলে না, এবারেও যে তৈরি হচ্ছো তার লক্ষণ নেই। খবর-কাগজে খুচরো লেখা লিখে, মাঝে-মাঝে বিজ্ঞাপনের কপি লিখে, মাঝে-মাঝে মার্কিনী বা রুশ কনস্যুলেটের জন্য তর্জমার কাজ ক'রে—এ-ভাবেই কি কাটবে তোমার সারা জীবন? ভেবো না আমি তোমাকে পাকা-পোক্ত চাকুরে দেখতে চাই, ভেবো না আমি তোমাকে ধোপদুরস্ত 'ভদ্রলোক' হ'তে বলছি—কিন্তু তুমি মুখে যা বলো, যে-ভাবে তুমি জীবন কাটাও, তার সঙ্গে কি এটাই মানায় না যে তোমার বিয়ে করার পক্ষে ভালোবাসাই হবে যথেষ্ট, কোনো সাংসারিক চিন্তা তাতে বাধা দেবে না? এসো, দুর্গাদাস, এসো আমরা নতুন জীবন আরম্ভ করি, আমরা বহুদিন ধ'রে যার অপেক্ষা করছি সেই জীবন—আমরা দু-জনে মিলে কাজ করবো, যে ক'রে হোক চ'লে যাবেই। মনে সুখ থাকলে এক-আধটু বাইরের কষ্টে কী এসে যায়? আমার এখন জানা দরকার, দুর্গাদাস—তুমি কী ভাবছো তা জানা দরকার। কেন আজকাল আমাদের ওখানে এত কম আসো, বলতে পারো? অনেক দূর শ্যামবাজার থেকে টালিগঞ্জ—কিন্তু সেটা কি কোনো

কারণ যার জন্য তুমি আমার কাছে আসবে না? আর এমন তো নয় যে দক্ষিণ কলকাতায় অন্য গরজে আসো না তুমি—হ্যাঁ, অন্য গরজেই আসো, প্রায় রোজ। আমি আজকাল কফি-হাউসে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, শ্রীপতিকে ঘিরে যে-'ইণ্টেলেকচুয়েল' দল ব'সে থাকে তাদেরই একজন সেজে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই না আমি, আর চাই না অন্য অনেকের সঙ্গে তোমাকে ভাগ ক'রে নিতে—কিন্তু আমার অনুপস্থিতি তুমি কি কখনো লক্ষ করেছো? ঝাঁকে-ঝাঁকে কথা—বলতে শুরু করলে ফুরোবে না, কিন্তু আমি বলি না—কেন, জানো? পাছে তুমি ভাবো আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি না, পাছে ভাবো তোমার বন্ধুদের আমি ঈর্ষা করছি, পাছে তোমার মনে হয় আমার মন ছোটো, আমি স্বার্থপর। আর বলতে না-পেরে, তোমার ভুল বোঝার ভয়ে বলি না ব'লে, আমি মনে-মনে কত কষ্ট পাই, কত রাগ করি নিজের ওপর, তা কি তুমি ভাবো কখনো? আমার কথা তুমি কি কখনো ভাবো, দুর্গাদাস? কী করছি আমি? এম. এ. পাশ ক'রে চাকরি খুঁজছি, আর চাকরি মানে তো সেই গতানুগতিক স্কুলমাষ্টারি—আমিও কি আমার বিধবা মা-র মতো শুধু মাষ্টারি ক'রে-ক'রে বুড়ো হ'য়ে যাবো? এরই মধ্যে কত ছেলেকে দেখলাম, সত্যি তেমন ক'রে প্রেমে পড়লে বিয়ের জন্য অস্থির হ'য়ে ওঠে, কত কাঠখড় পোড়ায় তার জন্য, আর তুমি—তুমি শুধু হবে-হচ্ছে ক'রে সময় কাটাচ্ছো, শুধু সময় ব'য়ে যেতে দিচ্ছো—তোমার মতো টগবগে যুবকের পক্ষে এই সংযম কি আশ্চর্য নয়? এ-ভাবে আর কতকাল কাটবে, দুর্গাদাস? আর কতকাল তোমার সব অন্যায় আমাকে 'ভালোবাসার অত্যাচার' ব'লে মেনে নিতে হবে? ধরো না আজ বিকেলের কথাই; তুমি বেস্পতিবার ব'লে গেলে যে আজ পাঁচটায় আসবে আমাদের এখানে, তারপর চা খেয়ে আমাকে নিয়ে যাবে 'সপ্তর্ষি'র মীটিঙে—আমি সাড়ে-চারটে থেকে অপেক্ষা করছি, মা তোমার জন্য মাছের চপ আর মালপো ভেজে রেখে কাজে

বেরোলেন, কিন্তু তুমি এলে না যে এলেই না। এই প্রথম নয় অবশ্য, আগে অনেকবার তুমি কথা দিয়ে কথা রাখোনি, সেটা তোমার অভ্যেসই নয় বলা যায়—আমার হয়তো ধ'রে নেয়াই উচিত ছিলো যে আজও তার ব্যতিক্রম হবে না, কিন্তু আমার ইচ্ছে করছিলো—ভীষণ ইচ্ছে করছিলো যে তুমি আসো, নিরিবিলি কিছুক্ষণ কথা বলি আমরা, আমি তোমার সঙ্গে বেরোই, তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। এত প্রবল সেই ইচ্ছে যে রাগ ক'রে ঘরে ব'সে থাকাও সম্ভব হ'লো না আমার পক্ষে, আমি ছুটে চ'লে এলাম তোমাদের 'সুনন্দা'য়—শুধু তোমার সঙ্গে দেখা হবে ব'লে। এলাম—যেহেতু আমি জানি যে এই ছোটোখাটো ব্যাপারগুলোতে কিছু এসে যায় না, যে আসল ব্যাপারে তুমি কথা রাখবে—নিশ্চয়ই! বলো, দুর্গাদাস—সত্যি না?

এতক্ষণে দুর্গাদাসের গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো।—'এলাম নাকি?'

'প্রায়। তুমি কি ঘুমুচ্ছিলে?'

'আউফ্!' আড়মোড়া ভেঙে ন'ড়ে-চ'ড়ে ব'সে দুর্গাদাস হঠাৎ বললো, 'আজ কী হ'লো, জানো—দলে প'ড়ে সিনেমায় চ'লে গেলাম তিনটের শো-তে—'

'তা-ই নাকি?'

'সেখান থেকে শ্রীপতির ওখানে গিয়ে এক কাণ্ড!'

কী কাণ্ড, সে-বিষয়ে অমলা কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলো না।

'হ'লো কী—বন্দনার সঙ্গে গৌতমের দেখা হ'য়ে গেলো হঠাৎ। আর তক্ষুনি বন্দনা কী-রকম কেঁদে উঠলো ভাবতে পারবে না। বেচারা! ওর জন্য কষ্ট হয় আমার।'

'তা কেউ কারো মন থেকে স'রে গেলে কী আর করা যাবে?' ব'লে দুর্গাদাসের দিকে আড়চোখে তাকালো অমলা।

'তা হোক—তবু যেটা কষ্টের সেটা কষ্টেরই। কেমন হ'য়ে উঠতে-উঠতে ভেঙে গেলো জিনিশটা—অদ্ভুত।'

অমলা ট্যাক্সিওলাকে বললো, 'এবার বাঁয়ে যাবেন।' একটু পরে বাড়ির দরজায় গাড়ি থামলো।

*　　*　　*

দরজা খুলে দিলো অমলাদের পুরোনো ঝি পারুল। তাকে দেখে একগাল হেসে দুর্গাদাস বললো, 'পারুল-দিদি, ভালো আছো?'

আধখানা কপালে ঘোমটা টেনে পারুল জবাব দিলো, 'ভালো আছি, দাদাবাবু। আপনি আজ বিকেলে এলেন না?'

'এই তো এলাম,' দুর্গাদাস ঝুপ ক'রে একটা চেয়ারে ব'সে পড়লো। 'শুনছিলাম তুমি পার্বতীর বিয়ে দিচ্ছো?'

'দাদাবাবুর সব কথা মনে থাকে! তা আপনাদের আশীর্বাদে সব ঠিক হ'য়ে গেছে—এই শ্রাবণ মাসে বিয়ে। একটু চা খাবেন তো, দাদাবাবু?'

'আচ্ছা, দাও।—'তা শোনো,' পারুল চ'লে যাবার পর দুর্গাদাস বলতে লাগলো, 'ভেবেছিলাম শ্রীপতির সঙ্গে দু-মিনিট দেখা ক'রেই এখানে চলে আসবো, ঐ সব ঝামেলায় আটকা প'ড়ে গেলাম।··· তা তুমি আর-একটু আগে এলেও পারতে "সুনন্দা"য়।'

অমলা কোনো কথা বললো না।

'পারুল সত্যি তাহ'লে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। একটা দশ বছরের মেয়ে! সুন্দর চোখ-মুখ, মিষ্টি কথা—তেমন আওতায় পড়লে ফিল্ম-স্টারও হ'তে পারতো মেয়েটা। আর এখন কী হবে? শ্বশুর-বাড়ির লাথি-ঝাঁটা খেতে-খেতে দু-দিনেই কঙ্কালসার, এক গাদা ছেলেপুলে, অবশেষে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বাসন মাজা। আমি পারুলকে কত ক'রে বুঝিয়েছিলাম—এখনই বিয়ে দিয়ো না, লেখাপড়া শেখাও। স্কুলে ভর্তি ক'রে দাও মেয়েকে, যা খরচ লাগে আমি

দেবো। তা এ-সব কথা কানেই ঢোকে না ওদের।··· আমি মাঝে-মাঝে ভাবি—বস্তির ছেলেমেয়েদের জন্য একটা স্কুল করবো। না, শুধু বাচ্চাদের জন্যই নয়—বড়োদের জন্যও ক্লাশ হবে রাত্রে। তুমি পড়াবে, আমি পড়াবো, বন্দনা আর হিমেন্দুও রাজি হবে নিশ্চয়ই। আমার মনে হয় এমন ভালো, এমন পবিত্র কাজ আর-কিছু হ'তে পারে না।··· কিছু বলছো না যে? রাগ ক'রে আছো?'

'তোমার ওপর আমি কি রাগ করতে পারি? না কি কেউ পারে?'

অমলার সঙ্গে চকিতে চোখোচোখি হ'লো দুর্গাদাসের। চোখ সরিয়ে নিয়ে দুর্গাদাস বললো, 'অমন বড়ো মাপে কিছু হ'য়ে ওঠা সহজ নয়, কিন্তু আমার সত্যি খুব ইচ্ছে ছিলো পারুলের মেয়েকে অ-আ-ক-খ শিখিয়ে দিই।'

'তোমার ইচ্ছে ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বলেওছিলে বর্ণপরিচয়ে স্লেট পেন্সিল কিনে দেবে। মেয়েটা আশা ক'রেও ছিলো বইয়ের জন্য।'

'আশা ক'রে ছিলো!' দুর্গাদাসের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, 'তাহ'লে দ্যাখো শেখার ইচ্ছে ওদেরও কিছু কম নয়।'

'তুমি চিন্তিত হোয়ো না, পার্বতীর আশা আমি কথঞ্চিৎ পূরণ করতে পেরেছি। ওকে নিয়ে বসতাম মাঝে-মাঝে, দু-খণ্ড বর্ণপরিচয় শেষ করিয়ে দিয়েছি।'

'বাঃ! এটা একটা কাজের মতো কাজ করেছো, অমলা! আর এই পার্বতীর কিনা এক্ষুনি বিয়ে দিচ্ছে ওর মা! তুমি বারণ করতে পারলে না?'

'আমি বারণ করলে শুনবে কেন ওরা? ওদের মধ্যে ও-রকমই চল। আর তাছাড়া—'

'তাছাড়া?'

'আমি কি পার্বতীর সারা জীবনের ভার নিতে পারি যে বারণ করবো ?'

হাসলো দুর্গাদাস। 'তাহ'লে তো বিদ্যাসাগরেরও হিন্দু বিধবার বিয়ের জন্য ঘটকালি-আপিশ খোলা উচিত ছিলো।'

'আমি অত-শত বুঝি না, আমি সমাজ-সংস্কারক নই। আমি বুঝি, যে-কথার পেছনে কোনো কাজ নেই তা না-বলাই ভালো।— এই যে, তোমার চা।'

চায়ের ট্রে টেবিলে নামিয়ে পারুল বললো, 'মা আপনার জন্য মালপো ভেজে রেখে গেছেন। আর মাছের চপ। খাবেন কিন্তু।'

'নিশ্চয়ই।' কিছুটা অন্যমনস্কভাবে চামচে দিয়ে একটি মালপো ভেঙে খেলো দুর্গাদাস, তারপর হাতে তুলে নিয়ে দুটি মালপো খেয়ে চুলে হাত মুছে বললো, 'তোফা হয়েছে। অনবদ্য। মাসিমা বাড়ি নেই দেখছি ? কোথায় গেছেন ?'

'মা গেছেন নিউ আলিপুর ট্যুটরিয়েল হোমে।'

'সেখানে কেন ?'

'বলা বাহুল্য, পড়াতে। তোমাকে সেদিন বললাম মনে নেই ?'

'ও—হ্যাঁ। তা স্কুলে পড়িয়ে আবার এটা কেন ? কী-দরকার ছিলো ?'

'চপটা খেলে না ?'

'নাঃ, আর পারছি না। আচ্ছা, চেখে দেখি একটু।...তা এ-বয়সে ওঁর অত পরিশ্রম করা উচিত নয় কিন্তু। ওঁকে তুমি বলো ট্যুটরিয়েল হোমটা ছেড়ে দিতে। বোলো, আমি বলেছি।'

'তুমি নিজেই বলো না। ওঁর আসার সময় হ'লো প্রায়।'

'তোমার মা-কে আমার আর-একটা কথা বলার আছে।'

অমলা দুর্গাদাসের চোখে চোখ ফেললো।

'সেদিন, জানো, দেবীপদর বোনের বিয়েতে গিয়েছিলাম।

সেই যে ইকনমিক্সের দেবীপদ—মনে আছে?—মুন্সেফ হবে ব'লে ল পড়ছে এখন। ওর বোন হিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাশ নিয়ে বেরিয়েছে, ঝকঝকে স্মার্ট মেয়ে, তার বিয়ে হ'লো জাতগোত্র কুষ্টি-ঠিকুজি মিলিয়ে (বোধহয় "আনন্দবাজারে" বিজ্ঞাপন দেয়াও হয়েছিলো)—ভাবতে পারো! না-বললেও চলে, পাত্র একজন সেল্‌স্‌-ম্যানেজার বা লেবার-অফিসার বা ঐ গোছের কিছু—লম্বা মাইনের চাকুরে আরকি। শুনলাম, পাত্রপক্ষ মোটা পণ নিয়েছেন, আনুষঙ্গিকও বিস্তর। আর বিয়েতে কী ধুমধাম—বাপ্‌স্‌! আমার এমন কুৎসিত লাগছিলো পুরো ব্যাপারটা—'

'কেন, এতে কুৎসিত কী আছে? বিয়ে তো হ'তেই হবে, আর আমাদের দেশে এটাই নিয়ম।'

'তুমি বোধহয় ঠাট্টা করছো আমাকে—যেহেতু আমি একটু বেশি কথা বলি, একটু বেশি উত্তেজিত হই? সত্যি—দেখতে-দেখতে অভ্যেস হ'য়ে গেছে আমাদের, কিছু মনেই হয় না, কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে ব্যাপারটা কুৎসিত ছাড়া আর কী? যে-ভাবে পারুলের মেয়ে পার্বতীর বিয়ে হয়, ঠিক সেইভাবে এম.এ.-তে ফার্স্ট-ক্লাশ-পাওয়া মেয়েরও—সত্যি কথাটা তো এ-ই! আর তাছাড়া, বিয়ে কি একটা ব্যাবসা নাকি যে তাতে টাকা-পয়সার কথা উঠবে? আমি ভাবছিলাম, দেবীপদর বাবা মেয়ের বিয়েতে যা খরচ করলেন, হয়তো তার চেয়েও বেশি উশুল ক'রে ছাড়বেন দেবীপদর বিয়েতে, আর সে—মার্ক্সিস্ট আর এগ্‌জিস্‌টেনশিয়েলিস্ট বুলি-আওড়ানো দেবীপদ—সেও খালি গায়ে টোপর মাথায় দিয়ে বাঁদর সেজে একদম অচেনা একটি মেয়েকে বিয়ে করতে ব'সে যাবে—টুঁ শব্দটি করবে না!'

'এমনভাবে কথা বলছো যেন তুমি এ-দেশের লোক নও।'

'নিশ্চয়ই আমি এ-দেশের লোক!' দুর্গাদাস গলা চড়ালো—'আমিও তা-ই, তুমিও তা-ই। কিন্তু আমরা ও-রকম নই। অনেক

কষ্ট আমাদের জীবনে, অনেক রকম সমস্যা, কিন্তু আমাদের গর্ব এটুকু—না, এটা কোনো গর্বের বিষয়ও নয়, আমাদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক—যে আমরা গড্ডালিকায় গা ভাসাইনি। ভাবতে কি ভালো লাগে না, অমলা, যে তোমার মা-র অন্তত মেয়ের বিয়ের জন্য কোনো ভাবনা নেই, সে-জন্যে একটি পয়সাও তাঁকে খরচ করতে হবে না? ভাবতে কি ভালো লাগে না যে মাঝে-মাঝে বাংলাদেশে এমন বিয়েও হয় যেখানে পাত্রপাত্রী পরস্পরকে বেছে নিয়েছে?'

দুর্গাদাসের শেষ কথাগুলি যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেলো অমলার মন থেকে সব দুশ্চিন্তা, দুর্গাদাসের অনেক অমনোযোগ, অনেক দুর্ব্যবহারের স্মৃতি। মুখ নিচু ক'রে এক ঢোঁক চা খেলো সে, একটু পরে জিগেস করলো, 'তুমি কি শিগগিরই বিয়ের কথা ভাবছো?'

'শিগগিরই মানে—একটা কাজকর্ম কিছু হওয়ামাত্র।'

'চেষ্টা করছো সেজন্যে?'

'ঐ বিজ্ঞাপনের এজেন্সি, যাদের জন্য আমি খুচরো কাজ করি মাঝে-মাঝে, তাদের আপিশেই কিছু হ'য়ে যেতে পারে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে অমলা বললো, 'আমি আসছে মাস থেকে বেহালার সারদাসুন্দরী স্কুলে কাজ পাচ্ছি—কালকেই জানলাম। তাই ভাবছিলাম—'

'কী ভাবছিলে?'

'মা একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন বোধহয়। স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেন না, কিন্তু তুমি তো বেশি আসো না আজকাল—

'কী মুশকিল! আমাকে কি রোজ হাজিরা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে—'

অমলা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো, 'না, না, প্রমাণের কথা ওঠে কিসে?'

'তবে? তুমি কি ভাবছো আমি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে—'

'ছি! কী ক'রে মুখে আনতে পারলে কথাটা!'

'আমাকে তুমি অনেকদিন ধ'রে দেখছো, অমলা। আমার স্বভাবটা কিছু এলোমেলো গোছের, যা করা উচিত তা ক'রে উঠতে পারি না সব সময়, যখন যা মনে আসে তুম ক'রে ব'লে ফেলি। সকলের সঙ্গেই আমার এ-রকম—তোমার সঙ্গেও। বরং তোমার সঙ্গে হয়তো হেলাফেলা একটু বেশি হ'য়ে যায়—সে তুমি আমার আপন বলেই, তোমাকে ভালোবাসি ব'লেই। তুমি তা বোঝো না?'

অমলা কথা বলতে পারলো না, তার মনে মস্ত একটা ঢেউ ব'য়ে গেলো ছলছল ক'রে। সুখের, একটু কষ্টেরও; কেননা হঠাৎ তার মনে হ'লো যেন সে-ই অপরাধী, যেন দুর্গাদাসেরই কিছু জবাবদিহি পাওনা আছে তার কাছে। আর দুর্গাদাস যেন তার নিজের কথায় নিজেই অভিভূত হ'য়ে মুহূর্তের জন্য অনুভব করলো সেই আবেগ, যার চাপে তার ছেলেবেলা-থেকে-চেনা মেয়েটির মধ্যে এককালে সে অফুরন্ত রহস্য দেখতে পেয়েছিলো। সেই অমলা, তার অমলা, এখনো তেমনি, তেমনি আশ্চর্য। কিছুক্ষণের জন্য সে ভুলে গেলো তার বন্ধুদের, ভুলে গেলো দেশের বাল্যবিবাহ, নিরক্ষরতার সমস্যা—কিছুক্ষণের জন্য, অমলার পাশে ব'সে, তার আঙুলে আঙুল জড়াতে-জড়াতে, তাদের ভাবী জীবনের ছবি আঁকলো সে, আগে অনেকবার যা বলা হ'য়ে গেছে, সেগুলোই যেন নতুন হ'য়ে বেরোতে লাগলো তার মুখ দিয়ে, অমলার কানে নতুন শোনালো। অমলার মা এলেন, দুর্গাদাসকে রাত্রে না-খাইয়ে ছাড়লেন না তিনি; সে চ'লে যাবার পরে সুখের কোলে, স্বপ্নের কোলে গা এলিয়ে দিলো অমলা, অনেক রাত অবধি ঘুমোতে পারলো না।

ট্রামে যেতে-যেতে অনেক কথা ভেবে ফেললো দুর্গাদাস। প্রথমে কিছুক্ষণ অমলা তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রইলো; সেই সব দিন,

যখন তারা প্রথম জানলো তারা 'প্রেমে পড়েছে,' তার সুবাস যেন ঘিরে রইলো তাকে; তারপর মনে হ'লো এখন বিয়ে না-করলে আর চলছে না। নিজের জন্য না হোক, অন্তত অমলার জন্য তাকে বিয়ে করতে হবে—সম্ভব হ'লে খুব শিগগির, সম্ভব হ'লে কালই। তার চাকরি নেই তো কী হয়েছে, তাই ব'লে কিছু উপার্জন নেই তা তো নয়, অমলাও স্কুলে পড়াবে, কিন্তু—কিন্তু চালানো যাবে কি তাতে, যা দিনকাল! কিন্তু আগে চাকরি, তারপর বিয়ে—এটা তো বড্ড গতানুগতিক, বড্ড বুর্জোয়া, ভেসে পড়া যাক না, দেখা যাক না কী হয়, হয়তো একটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে পড়লে সেও কিছুটা গুছিয়ে নিতে পারবে নিজেকে, হয়তো তার দিক থেকেও বিয়েটা দরকার? নাঃ, আগে একটা চাকরি জোগাড় ক'রে নেয়াই ভালো, এ-সব খুচরো কাজের কিছুই স্থিরতা নেই, সাধ ক'রে কষ্ট ডেকে আনার মানে হয় না। আর সত্যি উঠে-প'ড়ে লাগলে চাকরি জোটানো এমন শক্ত কী, তার সমবয়সীরা সকলেই বেকার ব'সে আছে তা তো নয়। তার চেনাশোনা লোকেদের মধ্যে কে-কে তাকে ঠিক রাস্তা বাৎলে দিতে পারে, কাকে ধরলে কোন দরজা খুলে যাওয়া সম্ভব, মনে-মনে তার একটা তালিকা তৈরি করলো দুর্গাদাস—কাল থেকে চেষ্টা শুরু ক'রে দেবে, যাকে বলে রীতিমতো ক্যাম্পেন। দুর্গাদাসের মনে ছবি ভেসে উঠলো—সে আর অমলা নতুন সংসার পেতেছে, রোজ দশটায় আপিশের বাস্ ধরে সে, মাসের শেষে এক তাড়া নোট হাতে পায়, একটি সুখী তরুণ দম্পতি, নিয়মে বাঁধা মসৃণ জীবন। সত্যি, এর চেয়ে ভালো আর কী হ'তে পারে? এই লক্ষ্য সামনে রেখে চলতে হবে তাকে—কাল থেকে, কাল থেকেই। মনে-মনে এ-রকম স্থির করামাত্র অমলা যেন স'রে গেলো তার ভাবনা থেকে, যেন অমলার প্রতি তার যা কর্তব্য তা এখনই করা হ'য়ে গেছে, অতএব ও নিয়ে আর ভাবার কোনো দরকার নেই। আর এর পর ট্রাম যত এগোলো, ততই তার মনে উঁকি দিতে লাগলো অন্য সব কথা:

আজকের 'সপ্তর্ষি'র মীটিং, রথীন্দ্র রায়ের অনাধুনিক মতামত, যা তার মতে হাস্যকর, আর শ্রীপতির প্রতিবাদ, যার সঙ্গে প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকের একমত হওয়া উচিত। কিন্তু কেমন হঠাৎ থেমে গেলো শ্রীপতি, কাউকে কিছু না-ব'লে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো—কোথায় গেলো, কী হয়েছে ওর? কেমন অদ্ভুত কথা বলছিলো আজ বিকেলে, আর ঐ অসময়ে শুয়েই বা ছিলো কেন—সত্যি ওর কোনো অসুখ করেনি তো? একবার দেখে গেলে হয় না? ট্রাম ততক্ষণে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর মোড় ছাড়িয়েছে, দুর্গাদাস হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, তার আসনে তক্ষুনি ব'সে পড়লো আর-একজন, কালিঘাটে একদঙ্গল লোক উঠে দাঁড়াবার জায়াগাটুকু ভ'রে দিলো, আর তারপর হাজরা রোড যেই কাছে এলো, যেন ভিড়ের চাপে উত্ত্যক্ত হ'য়ে ট্রাম পুরোপুরি থামার আগেই নেমে পড়লো সে। রাস্তা থেকে তাকিয়ে দেখলো শ্রীপতির ঘরে আলো নেই। অন্ধকার সিঁড়িতে দু-তিনবার ঠোক্কর খেয়ে উঠে এলো ওপরে—দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দুর্গাদাস কড়া নাড়লো, 'শ্রীপতি! শ্রীপতি!' ব'লে ডাকলো কয়েকবার; কোনো উত্তর নেই। আশ্চর্য—রাত মাত্র এগারোটা, এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো শ্রীপতি! দরজায় কান পেতে মনে হ'লো ঘুমন্ত মানুষের ভারি নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে, মাঝে-মাঝে হয়তো কাশির শব্দ, বা গোঙানি। আরো কয়েকবার চেষ্টা ক'রেও যখন সাড়া পেলো না, তখন অগত্যা আবার নেমে এলো রাস্তায়, শ্রীপতির জন্য দুশ্চিন্তা নিয়ে শেষ বাস্ ধ'রে বাড়ি ফিরলো।

৫

পরের দিন বিকেল সাড়ে-পাঁচটা নাগাদ আরতি টেলিফোন তুলে বালিগঞ্জের একটা নম্বর ঘোরালো।

'কে, বন্দনা?'

'হ্যাঁ—'

'বন্দনা, আমি আরতি, আরতি মৈত্র।'

একটু চুপ ক'রে থেকে বন্দনা বললো, 'তা, কী, বলো?'

' "তুমি" কেন, বন্দনা? এখনো রাগ ক'রে আছিস?'

বন্দনা চুপ।

'কাল তুই অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলি—'

'না। অসুস্থ হইনি।'

'কোনো কারণে বিচলিত ছিলি। আজ ভালো আছিস?'

'এর জন্য টেলিফোন?'

'আজ সারাদিন আমার অনেকবার মনে পড়েছে তোকে। অনেকবার টেলিফোনের কাছে এসেও ফিরে গিয়েছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোকে না-ডেকে পারলাম না।'

'কাইণ্ড অব ইউ।'

'বন্দনা, কাল আমি খুব অন্যায় করেছিলাম, আমাকে তুই ক্ষমা করিস।'

বন্দনা চুপ।

'কালকের ব্যাপারটা তুই ভুলে যা। কথা দে আমাকে।… কিছু বল।'

বন্দনা বললো, 'দোষ তো প্রথম আমিই করেছিলাম, কিন্তু—'

আরতি বুঝলো বন্দনার চোখে জল এসেছে, দু-তিন সেকেণ্ড দু-পক্ষই চুপ।

'—তুইতো জানিস ওকে দেখলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। কেমন আছে রে গৌতম?'

'পরে বলছি। তোকে আর-একটি অনুরোধ আমার: হিমেন্দুর কাছেও আমি ক্ষমা চাইছি, তাকে বলিস?'

'হিমেন্দু এখানেই ব'সে আছে, তুই নিজেই বল না।'

'...আচ্ছা, দে। থাক, পরে হবে। তোর সঙ্গে আরো কথা আছে আমার। কাল ঐ মীটিঙে কতক্ষণ ছিলি?'

'শেষ পর্যন্ত,' অন্য প্রসঙ্গ ওঠামাত্র বন্দনার গলা স্বাভাবিকতায় ফিরে এলো। 'যত আজে-বাজে তর্ক হ'লো পরে—কোনো মানে হয় না ও-সবের। তুই কখন পালালি টের পাইনি।'

'শ্রীপতির বক্তৃতা শুনেছিলি?'

'হ্যাঁ—'

'মন দিয়ে শুনেছিলি?'

'তা শুনেছিলাম। চাস তো তার সারাংশ বলতেও পারি।'

'কেমন লাগলো তোর?'

'শ্রীপতির বক্তৃতা? মতামতগুলো বিশ্রী, কিন্তু বললো খুব ভালো। কী অদ্ভুত দেখাচ্ছিলো ওকে।' মিষ্টি গলায় ছোট্ট ক'রে হাসলো বন্দনা।

'আমার ওকে উন্মাদ মনে হ'লো।'

'কী বললি?'

'উন্মাদ। সত্যি পাগল-টাগল হ'য়ে যাচ্ছে না তো? কিছু জানিস?'

'আমি কী ক'রে জানবো।'

'তুই ঠিক বলেছিস। অদ্ভুত দেখাচ্ছিলো ওকে। মুখটা গনগনে লাল, ঠোঁটের কোণে ফেনা উঠছে, আর কেমন "আরশোলা,

আরশোলা" বলতে-বলতে হঠাৎ বেরিয়ে গেলো। আমার এমন হাসি পাচ্ছিলো কী বলবো। তোর মনে হয় না কিছু-একটা গোলমাল হয়েছে ওর?'

'তা তো তোরই জানার কথা। শ্রীপতি তোরই তো খুব বন্ধু।'

'আমার বন্ধু কে বা নয় এই কলকাতায়। আমি ভালো না, বন্দনা।'

'কী বললি?'

'কিছু না।'

একটু সময় দু-পক্ষই চুপ।

'তা গৌতমের খবর কিছু শুনবি নাকি?'

'গৌতমের খবর তো চোখে দেখলাম কাল।'

'দেখে যা মনে হয় ঠিক তা নয় কিন্তু। ও সুখে নেই।'

'তা-ই নাকি?' বন্দনার গলায় ব্যঙ্গের সুর লাগলো।

'তোর বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'শুনলাম আই. এ. এস. পরীক্ষা দিচ্ছে?'

'বলছে তো দেবে। কিন্তু কখন যে পড়ে তা তো জানি না।'

'পড়ে না?' ··· তোর জন্যেই এ-রকম হচ্ছে বোধহয়?'

'তা হবে। কিন্তু এটা ভালো হচ্ছে না।'

'কার পক্ষে?'

'কারো পক্ষেই না। কী-একটা বিশ্রী ব্যাপার হ'য়ে গেলো কাল—পরে আমার কী যে খারাপ লাগছিলো—'

হঠাৎ বন্দনা বললো, 'আরতি, তোর মনে আছে তোর সঙ্গে আমার বন্ধুতার সেই দিনগুলি? ফেব্রুয়ারি মাসের দশ তারিখে তুই প্রথম এসেছিলি আমাদের বাড়িতে—'

'তারিখটাও মনে আছে তোর?'

'আমার ভাই নুটুর জন্মদিন ছিলো সেদিন। হঠাৎ দুর্গাদাস তোকে নিয়ে এলো। তোকে দেখামাত্র ভালো লাগলো আমার,

কথা ব'লে—আরো। দু-দিনেই গভীর বন্ধুতা হ'য়ে গেলো আমাদের।'

'তারপর? বল।'

'তুই প্রায়ই আসিস, গৌতমও আসে, দুর্গাদাস এলে রবীন্দ্র-সংগীত শুনি আমরা, তুই জোর ক'রে আমাকে দিয়েও গান গাওয়াস। সুন্দর একটা দল হয়েছিলো আমাদের—আমরা লেকে বেড়াই, ফুচকা খাই আশ মিটিয়ে—এক-একদিন হেঁটে-হেঁটে জনক রোডে শ্রীপতির ওখানে হানা দিই—আমি শ্রীপতিকে প্রায়ই আসতে বলতাম আমাদের সঙ্গে, কিন্তু সে আসেনি কখনো। কেন রে?'

একটু ক্ষীণস্বরে আরতি বললো, 'আমি কী ক'রে জানবো?'

'কী আনন্দেই কেটেছে সেই সন্ধ্যাগুলি। আর তারপর… হঠাৎ একদিন দেখি গৌতম আর আসে না। কল্পনাও করিনি এ-রকম হবে—হ'তে পারে।'

'তুই কি আমাকে দোষী করিস সেজন্য?'

'আরতি, আমি একটা কথা ভাবি—কেন আমরা সকলেই সকলকে ভালোবাসতে পারি না? মনে হয় এর চেয়ে সহজ আর-কিছুই নেই, কিন্তু কিছুতেই হয় না কেন?'

'যে সকলকে ভালোবাসে সে হয়তো কাউকেই ভালোবাসে না।—মাপ কর, ঠিক ও-কথা বলতে চাইনি।'

মুহূর্তকাল ওপারে শব্দ নেই। তারপর বন্দনার গলা ক্ষীণ হ'য়ে ভেসে এলো, 'আরতি, তোর কি হৃদয় ব'লে কিছু আছে?'

'হৃদয়?…' হালকা হাসলো আরতি। 'তা শোন, আমিও সব অন্য রকম ভেবেছিলাম। কিন্তু কেমন ক'রে কী হ'য়ে গেলো।'

'কেমন ক'রে, তুই তা জানিস না?' একটু ঝাঁঝ লাগলো বন্দনার গলায়।

একটু চুপ ক'রে থেকে আরতি বললো, 'বন্দনা, তুই কি বিশ্বাস

করবি আমি যদি বলি যে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। ছেলেরা যদি আমাকে দেখে ভোলে আমি কী করতে পারি?'

'দিন উল্টে গেছে, আরতি। আজকাল মেয়েরাই ছেলেদের পেছনে ছুটছে। ভোলাবার সবুরটুকু সয় না।'

'উদাহরণস্বরূপ—আমি?··· কিন্তু আমার কথা থাক। যে-জন্যে তোকে ডাকলাম তা বলি। শুনবি কথাটা?'

'শুনছি, বল।'

'তুই গৌতমের সঙ্গে মিটিয়ে ফ্যাল এবার।'

টেলিফোনেও বন্দনার লম্বা নিশ্বাস শুনতে পেলো আরতি। মুহূর্তকাল অপেক্ষা ক'রে আবার বললো, 'আমার মনে হয় তুই ডাকলেই ও ফিরে যাবে।'

'তুই ব্যবস্থা ক'রে দিবি? আমাকে বলছিস তোর হাত থেকে ওকে ফেরৎ নিতে?'

'তাহ'লেই বা দোষ কী।'

'তোর অরুচি ধ'রে গেছে?'

'তাহ'লেই বা তোর ক্ষতি কী।'

'অন্য কারো সঙ্গে প্রেম করার সাধ হয়েছে তোর?'

'তাতেই বা তোর কী এসে যাচ্ছে? তুই গৌতমকে ভালোবাসিস না—এখনো?'

এবার অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকলো বন্দনা, আরতিও অপেক্ষা করলো।

'এখন রাখি, আরতি,' খুব আবছা শোনালো বন্দনার গলা। 'ইচ্ছে হয় তো আসিস একদিন আমার কাছে। নয়তো আমিই যাবো।—হিমেন্দুর সঙ্গে কথা বলবি বলেছিলি?'

'তা—হ্যাঁ—এই হিমেন্দুকে তোর ওখানে দেখেছিলাম দু-একবার তা-ই না? বেশি কথাবার্তা বলতো না—লাজুকমতো।'

'ভারি ভালো ছেলে হিমেন্দু। ইংরেজিতে পাশ করেছে আমার

আগের বছর। এখন একটা ছোটো কলেজে পড়াচ্ছে। চমৎকার ছেলে।'

'তাহ'লে হিমেন্দু এখন একাই তোর গান শুনছে?'

'কী যা-তা বলছিস!'

'যা-তা কেন? আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম তুই এখনো গান করিস কিনা।'

'আর গান! দুর্গাদাসের কথায় রেডিওতে অডিশন দিয়েছিলাম, পাশ হইনি। অগত্যা দক্ষিণীতে ভর্তি হ'য়ে গেলাম।'

'আবার গানের স্কুলে ভর্তি হলি?'

'কিছু-একটা করতে হবে তো। পাশ করলে চাকরি পাওয়া যায় শুনেছি।'

'চাকরি তোকে মানায় না, বন্দনা।'

'আমি বুঝি সেই রকমের অধম মেয়ে যাকে বিয়ে ছাড়া আর-কিছু মানায় না?···ধ'রে থাক, হিমেন্দুকে দিচ্ছি।'

যতক্ষণ টেলিফোনে এই কথা হচ্ছিলো, সেই ঘরেই ব'সে ছিলো হিমেন্দু, জানলার ধারে বেতের চেয়ারে, হাতে একটা বই খোলা। জানলার বাইরে এক সারি গাছ, তারই ওপর দিয়ে অনেকখানি আকাশ বেঁকে আছে। হিমেন্দুর চোখ যাতায়াত করছিলো বই থেকে আকাশে, আবার আকাশ থেকে বন্দনার পিঠের দিকে; কিছু কথা কানে আসছিলো তার, কোনো-কোনো কথায় মনোযোগ দিচ্ছিলো রীতিমতো—অন্য ব্যক্তিটি যা বলছে তাও সহজেই অনুমান করতে পারছিলো। জরুরি কথা হচ্ছে এখানে, গভীর ব্যক্তিগত কথা, একবার ভাবলে উঠে বারান্দায় চ'লে যায়, কিন্তু বন্দনার তো গোপন ব'লে কিছু নেই, সকলেই তার সব কথা জানে, আর সেজন্যেই—সেজন্যেই সে এত ভালো। তাছাড়া, আর-একটা স্বার্থপর কারণেও হিমেন্দু উঠতে পারছিলো না, কথাগুলো একটু কষ্ট দিচ্ছিলো তাকে, কিন্তু সেই কষ্টটাও সুখের, বন্দনার

হারানো প্রেমের গল্প শুনতে-শুনতে একটা অদ্ভুত কষ্ট-মেশানো সুখ ছড়িয়ে পড়ছিলো তার মনের মধ্যে।

'এসো হিমেন্দু,' হাত নেড়ে ডাকলো বন্দনা, 'টেলিফোনে আরতি। কথা শেষ ক'রে ও-ঘরে যেয়ো, মা বোধহয় চা নিয়ে ব'সে আছেন এতক্ষণে।' হালকা পায়ে বন্দনা বেরিয়ে গেলো, আর অত্যন্ত অনিচ্ছায় টেলিফোন তুলে নিলো হিমেন্দু।

'হ্যাঁ, বলুন।'

'আমি আরতি মৈত্র কথা বলছি।'

'বুঝেছি।'

'কালকের ঘটনার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে।'

যদিও সে জানতো আরতি তাকে কী বলবে, তবু আরতির নিজের গলায় এই কথাটা শুনে হিমেন্দুর হৃৎপিণ্ড একটু দ্রুত হ'লো। একজন মেয়ে ও-রকম শাদা ভাষায় ক্ষমা চাইলে কী জবাব দিতে হয় তা তার জানা নেই ; এ-রকম ঘটনা তার জীবনে শুধু ঘটেনি তা নয়, এ-রকম যে ঘটতে পারে তাও তার ধারণার বাইরে ছিলো।

অগত্যা বললো, 'আমিও খুব দুঃখিত।'

আরতি এক নিঃস্বর কণ্ঠস্বর শুনলো, শক্ত কাঠের মতো আঘাত ক'রেই থেমে যায়। একটু পরে বললো, 'আমি কিন্তু দুঃখিত নই— আপনার সঙ্গে আলাপ হ'লো তো এই সুযোগে। একদিন আমাদের এখানে আসেন তো খুশি হবো—দুর্গাদাস প্রায়ই আসে—ছত্রিশের এক বেণীমাধব মল্লিক রোড—হেদোর পেছনে— মানিকতলা স্ট্রিট দিয়ে ঢুকে বাঁয়ে যেতে হয়। আচ্ছা, নমস্কার।'

হিমেন্দুকে আর কিছু বলার সময় না-দিয়ে আরতি টেলিফোন নামিয়ে রাখলো। ফিরে তাকিয়ে দ্যাখে, তার বাবা গেঞ্জি আর প্যাণ্ট প'রে পাখার তলায় দাঁড়িয়ে আছেন।

'বাবা! বেশ লোক! এত দেরি ক'রে এলে!'

'আমি অনেকক্ষণ এসেছি, তোরই টেলিফোনে কথা ফুরোয় না।'

'অনেকক্ষণ না হাতি। বড়ো জোর দু-মিনিট। এদিকে আমি সেই কখন থেকে চা না-খেয়ে টাটিয়ে ব'সে আছি।'

'আজ বুঝি বন্ধুরা কেউ আসেনি এখনো?'

'বন্ধুদের কথা উঠছে কিসে? আজ রোববার না? আর আমি না তোমাকে ব'লে দিয়েছি—'

'কী গরম!' কেশববাবু একটা নিচু চেয়ারে ব'সে প'ড়ে হাঁক দিলেন, 'কার্তিক!'

'কার্তিককে একটু বাইরে পাঠিয়েছি আমি —'

'রাখু!'

'চ্যাঁচাচ্ছো কেন ও-রকম? রাখুর অন্য কাজ আছে। কী চাই বলো না! জল তো?' ঝকঝকে কাচের গ্লাশে ঠাণ্ডা জল এনে দিলো আরতি, তার বাবার ছেড়ে-ফেলা জুতো আর হাওয়াই শার্ট তুলে নিয়ে বললো, 'এক কথা তোমাকে কত বার বলতে হয় বলো তো? এই যে পইপই ক'রে বলি, জামাটা আলমারিতে রাখবে, জুতোগুলো যেখানে-সেখানে ছুঁড়বে না—কানে ঢোকে না কেন সে-কথা? আর সেদিন তোমাকে ব'লে দিলাম না যে রোববারে পাঁচটার মধ্যে চেম্বার শেষ ক'রে দেবে?'

কেশববাবু ঢকঢক ক'রে জলের গ্লাশটি শেষ ক'রে বললেন, 'আঃ!'

'জবাব দাও আমার কথার!'

'ডাক্তারের আবার শনি-রোববার কী?'

'কেন? ডাক্তার ঘোষের চেম্বার বন্ধ থাকে না রোববারে?'

'তিনি ডেন্টিস্ট; দাঁতের ব্যথায় সবুর সয়।'

'শনিবার বিকেল পড়লেই ডাক্তার ব্যানার্জিকে কেউ আর খুঁজে পায় না।'

'তিনি হার্ট-স্পেশালিস্ট, আমাদের মতো ডাক্তাররা কিছু করতে না-পারলে তবে তাঁর কাছে রোগী যায়। তাঁকে যা পোষায় আমাকে তা পোষাবে কেন?'

'বাজে বোকো না তো, বাবা! সকলের সব রোগীই বেঁচে-ব'র্তে থাকে, শুধু তোমার রোগীদেরই বুঝি নাভিশ্বাস্ উঠে আছে সব সময়? এমন সরকারি বজরা আর কোথায় পাবে লোকেরা — কাকের মুখে খবর পাঠালে ছুটে যাবে; টাকা দাও ভালো, না দাও তো ডাক্তারই হয়তো ওষুধটাও কিনে দেবেন—সত্যি ক'রে বলো তো, এমনি হেলাফেলা ক'রে মাসে তুমি কত টাকা লোকশান করো?'

'এ-সব বাজে কথা কে বলে তোকে?'

'বাজে হবে কেন। আমি কি জানি না মহেশ্বর পাল তার চিকিৎসা-বাবদ পুরো টাকা তোমাকে দেয়নি?'

'দিতে পারেনি তো কী হবে।'

'পারেনি—না? এদিকে দমদমে তার আর-একটা বাড়ি উঠছে, খবর রাখো?—ছিঃ, ডাক্তারকে ঠকায়, ঘেন্নাও নেই!'

'রোগী সেরে উঠলেই ডাক্তারের জিৎ,' মৃদু হাসলেন কেশববাবু।

ঈষৎ ছায়া পড়লো আরতির মুখে, মুহূর্তকাল চুপ ক'রে থেকে বললো, 'কিন্তু সত্যি যাদের উপায় নেই এমন লোকের কি অভাব যে মাসে-মাসে বৌয়ের গয়না কিনে যারা টাকা জমায় তাদের ওপর দয়া করতে হবে? একে দয়া বলে না, বলে বোকামি! নিজের টাকা যেমন খুশি ফ্যালো ছড়াও আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু জেনে-শুনে ঠকবে কেন? তাতে কারো কিছু ভালো হয় না, শুধু জোচ্চুরি প্রশ্রয় পায়।'

'তুই দেখছি মস্ত জ্ঞানী হয়েছিস। কিন্তু টাকার বিষয়ে অতটা টনটনে জ্ঞান কি ভালো?'

'খারাপই বা কী—টাকার জোর থাকলে কত ভালো কাজ করা যায়। ধরো না—চেনাশোনা কারো হয়তো এমন অসুখ করলো এ-দেশে যার ঠিকমতো চিকিৎসা হয় না। হয়তো সুইৎসার্ল্যাণ্ডে পাঠাতে হবে, হয়তো আমেরিকায়। ইচ্ছে তোমার যতই থাক না, টাকা না-থাকলে কিছুই তুমি করতে পারবে না। কত ভালো লোক

চিকিৎসার অভাবে মারা যায়, আর ঐ মহেশ্বর পালেদের লোহার সিন্দুক তেলে-সিঁদুরে চিকচিক করে—এ-কথা ভাবলেই আমার এমন রাগ হয়—এমন রাগ হয়—'

হঠাৎ থেমে গিয়ে আরতি বললো, 'ও মা, সন্ধে হ'য়ে গেলো এর মধ্যে। যাও, বাবা এক ছুটে স্নান ক'রে এসো—আর চা না-খেয়ে পারছি না। বাথরুমে তোমার গেঞ্জি তোয়ালে রেখে এসেছি।'

বাবাকে বাথরুমে পাঠিয়ে আরতি বারান্দায় এলো। চওড়া বারান্দা, খাবার টেবিল পাতা হয়েছে সেখানে, তার একপাশে রান্নাঘর, আর-এক পাশে একতলার সিঁড়ি। একতলায় কেশববাবুর চেম্বার, দোতলার খানচারেক ঘরে পরিবারটির বাসা, তেতলায় একটি ঘর খালি প'ড়ে থাকে। বারান্দায় এসে আরতি দেখলো কার্তিক চা সাজাচ্ছে।

'কার্তিক, গিয়েছিলে?'

'চিঠি দিয়ে এসেছি, দিদিমণি।'

'জবাব নেই কিছু?'

'দাদাবাবু বাড়ি ছিলেন না, তেনার মা-র হাতে দিয়ে এসেছি।'

'ঐ এক ছেলে—কখনো যদি বাড়ি থাকে!' দাঁতের ফাঁকে কথাটা ব'লেই আরতি পায়ের শব্দে ফিরে তাকালো।—'ও, তুমি!' তার গলার আওয়াজে যে-কেউ বুঝতো যে সে-মুহূর্তে সে অন্য কারো প্রত্যাশায় ছিলো।

গৌতম বললো, 'হ্যাঁ, আমি। তুমি কার কথা ভাবছিলে?'

'তোমার কথা নিশ্চয়ই নয়।'

'কার্তিক যে-দাদাবাবুটির কথা বললো, সে নিশ্চয়ই দুর্গাদাস?'

'তা দিয়ে তোমার দরকার কী?'

'না, দরকার কিছু না। আমার শুধু অবাক লাগে যে দুর্গাদাসকে তুমি অত পছন্দ করো। তুমি কি জানো ও বন্ধুদের কাছে টাকা ধার নিয়ে ফেরৎ দেয় না?'

'জানি। তেমনি এও জানি যে কোনো বন্ধু কোনো বিপদে পড়লে দুর্গাদাসই ছুটে যাবে সকলের আগে— তুমি নও!'

'ও। তাহ'লে ওর মহত্ত্বের পরিচয় পেতে হ'লে আমাকে কোনো বিপদে পড়তে হবে?'

'চুপ!' আরতির চোখে ফুলকি জ্ব'লে উঠলো। 'দুর্গাদাসের বিষয়ে একটি কথা শুনতে চাই না তোমার মুখে! তুমি ওকে কত টাকা ধার দিয়েছিলে, বলো— আমি এক্ষুনি ফেরৎ দিচ্ছি।'

'বড্ড রেগে গেছো দেখছি,' গৌতম হালকা ক'রে হাসলো। দেখতে সে ভালোই, গায়ের রং হলদেটে ফর্শার দিকে, পরিষ্কার টেরি-কাটা চুল, তরুণ বাংলার চলতি ফ্যাশানকে অগ্রাহ্য ক'রে মাঝে-মাঝে তাঁতের ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি পরে, চলাফেরার গাম্ভীর্যের জন্য মনে হয় সে যেন চব্বিশ বছরেই পাকাপোক্ত ভদ্রলোক হ'য়ে উঠেছে। কথা বলে একটু চিবিয়ে-চিবিয়ে মাজা গলায়, যাকে বলছে তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে। আরতির আর-একটু কাছে স'রে এসে সে বললো, 'মাথায় থাকুন তোমার দুর্গাদাস, আমি অন্য কথা বলতে এসেছি। পাঁচ মিনিট সময় দেবে আমাকে?'

'মাত্র পাঁচ মিনিট?'

'আপাতত ওর বেশি চাই না। আমি একটি পরিষ্কার প্রশ্ন করবো তোমাকে— তুমি পরিষ্কার জবাব দেবে। রাজি?'

'আরম্ভ করো।'

'আমি এক্ষুনি বিয়ে করতে চাই— সামনের মাসেই— এ-মাসেই। আর অপেক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না আমার পক্ষে।'

'পাত্রী বোধহয় আমি?'

পাৎলা ঠোঁট বেঁকিয়ে গৌতম হাসলো।—'পড়াশুনো কিছুই হচ্ছে না আমার, বই খুলে ব'সে থাকি কিন্তু মাথায় কিছু ঢোকে না— অথচ পড়তে পারলে, দিনে চার ঘণ্টা ক'রেও মন দিতে পারলে— আই. এ. এস.-এ আমি নির্ঘাৎ ওপরের দিকে উৎরে যাবো। দিনগুলো

কেমন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে—তোমার সঙ্গে-সঙ্গে বা তোমার পেছন-পেছন ঘুরে বেড়ানো ছাড়া এই ক-মাস আর যে কী করেছি তা মনেই পড়ে না।'

'সেইজন্যই এখন আমাকে খাঁচায় পুরে নিশ্চিন্ত হ'তে চাও ?'

'এটা তো মানবে যে এখন আমরা যে-ভাবে আছি সেটা অস্বাস্থ্যকর ?'

'তোমার পক্ষে হয়তো, কিন্তু আমার এ-রকমই ভালো লাগে। শোনো গৌতম, এক-একদিন সারা বিকেল আমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকো তুমি। অনেক ঘণ্টা নির্জনেও কাটাই আমরা। আমার তো মনে হয় এতদিনে অরুচি ধ'রে যাওয়া উচিত।'

বাঁকা হাসলো গৌতম। 'অরুচি ? কার ওপর কার ?'

'ধরে নাও আমারই—তোমার ওপর।'

'আমার প্ল্যান অন্যরকম। আমি আরো ঘনিষ্ঠতা চাই।'

'আরো ?' আরতি ভুরু টান ক'রে গৌতমের দিকে তাকালো। 'সেজন্যেই বিয়ে ? শুধু সেইজন্যে ?'

'তাহ'লেই বা দোষ কী ? ব্যাপারটা কি খারাপ ?'

'তাই ব'লে এক্ষুনি ! এ-মুহূর্তে না-হ'লে চলছে না ! কিন্তু বিয়ে করলে নতুন বৌ নিয়ে উচ্ছ্বাসে ভেসে যাবে যে—তখন কি আর আই. এ. এস.-এর পড়া হবে ?'

'আমার হবে। আরো ভালোভাবে হবে।' গৌতমের এই উত্তরটাতে ঈষৎ গর্বের সুর শোনা গেলো।

'উচ্ছ্বাস হবে না তোমার ?'

'হবে না তা নয়—কিন্তু আমি ভেসে যাবো না ; সামলে নিতে পারবো।'

'অর্থাৎ—আমাকে পাশে রেখে সিভিল ল মুখস্থ করবে, আর মাঝে-মাঝে নিজের দরকারমতো ব্যবহার করবে আমাকে ? স্বাস্থ্য

আর মেজাজ ঠিক রাখতে হ'লে মাঝে-মাঝে যেমন খেয়ে নিতে হয়, এও তেমনি ?'

'শাদা কথায় বললে ভালো শোনায় না, কিন্তু খাঁটি বৈজ্ঞানিক তথ্যটা তো তা-ই। ওটাকে আরো উপাদেয় করার জন্য রোমান্টিক রঙে ছুপিয়ে নিতে চাও তো নিতে পারো, কিন্তু আসল সত্যটা জানা থাকলে দোষ কী ?'

'ও-সব সত্য-টত্য কিছুই জানি না আমি—কিন্তু এটুকু জানি যে তোমাকে আমি বিয়ে করবো না।'

'করবে, আরতি, করবে।' সহাস্যে বললো গৌতম।

'কিন্তু বিয়ের ছ-মাস পরে যদি ছেড়ে যাই তোমাকে ? পালিয়ে যাই অন্য কারো সঙ্গে ?'

'I'll risk it.'

'না কি তুমি নিজেই দুর্বল হ'য়ে পড়ছো ভেতরে-ভেতরে ? অন্য একজনের ওপর খুব অন্যায় করেছিলে একবার, এখন তাড়াতাড়ি বিয়ে ক'রে সেটাকে কবর-চাপা দিতে চাচ্ছো ?'

কথাটা ব'লে আরতি গৌতমের দিকে তাকালো, কিন্তু গৌতম একটু লালও হ'লো না, অপ্রতিভতার অন্য কোনো লক্ষণও প্রকাশ করলো না। একই রকম ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'আমি কারো ওপর কোনো অন্যায় করিনি, কিন্তু বন্দনা কাল হিস্টিরিয়ার ঝোঁকে একটা সত্য কথা বলেছিলো—তোমার আর আমার এখন বিয়ে করা উচিত।'

'তাহ'লে ঠিক ধরেছি—কাল বন্দনাই এটা ঢুকিয়েছে তোমার মাথায়। "অন্তত পক্ষে ঐ মেয়েটাকে বিয়ে ক'রে ভদ্র হ'তে পারো!" বিয়ে হ'লে কেউ আর এ নিয়ে বলাবলি করবে না, সবাই মেনে নেবে ব্যাপারটা, বন্দনাও অগত্যা শান্ত হবে।—এই তো ?'

'বিয়ের কথা অনেকদিন ধ'রেই ভাবছি আমি।'

'সত্যি ? কিন্তু আমরা তো অনেক দিন ধ'রে শুনে আসছি যে তোমার সঙ্গে বন্দনার বিয়ের সব ঠিকঠাক।'

'সেবারে ভুল করেছিলাম।'

'আর এবারে নিশ্চিতভাবে জেনেছো যে ভুল করোনি?'

'নিশ্চয়ই। অন্য কাউকে স্ত্রী ব'লে কল্পনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'আমি কিন্তু মনে-মনে এখনো বন্দনাকেই তোমার স্ত্রী ব'লে ভাবি। তুমি অন্য একজনের স্বামী, তা জেনেই ধীরে-ধীরে আমার দিকে তোমাকে টেনে এনেছিলাম—ভাবতে মজা লেগেছিলো যে এও আমি পারি। তুমি দু-দিন বাদে একটা জেলার হাকিম হবে, আর আমি তোমাকে বাঁদর নাচাচ্ছি এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধিও তোমার নেই?'

'হাঁঃ!' নাকের ভেতর দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করলো গৌতম।

'কিন্তু সেই মজাটাও এখন ভোঁতা হ'য়ে গেছে—আর আমার দরকার নেই তোমাকে দিয়ে, তুমি তোমার বন্দনার কাছে ফিরে যেতে পারো।'

'কী বলছো তার মাথামুণ্ডু নেই।' আরতির এ-সব রাগি কথা গৌতমের কাছে নতুন নয়, আর যখন সে ও-রকম বলে তখনই তার সবচেয়ে ভালো লাগে আরতিকে, তাকে পাবার জন্য পাগল হ'য়ে যায় ভেতরে-ভেতরে। এ-মুহূর্তেও তা-ই হ'লো, আরতির দিকে তাকিয়ে তার রক্ত যেন জ্ব'লে উঠলো দপ ক'রে। হাতের মুঠো পাকিয়ে বললো, 'করবে, আমাকেই বিয়ে করবে তুমি—মুখে যা-ই বলো না।'

'আমি তোমাকে কখনোই বিয়ে করবো না, গৌতম বর্ধন,' গুনগুন গলায় জবাব দিলো আরতি। 'জেনে রাখো, কখনোই না।'

'নিশ্চয়ই করবে!' টেবিলের ওপর একটা বই রাখা ছিলো; কথার সঙ্গে-সঙ্গে হাতের এমন জোরালো ভঙ্গি করলো গৌতম যে বইটা ছিটকে পড়লো আরতির পায়ের ওপর।

বইটা তক্ষুনি তুলে নিলো আরতি, একবার মাথায় ঠেকিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিলো।

গৌতম ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, 'ওটা করলে কেন ?'

'কী করলাম ?'

'বইটা ঠেকালে কেন মাথায় ?'

'কেন ? জানি না। ছেলেবেলার অভ্যেস বোধহয়। পায়ে বই ঠেকলে আমার গা শিরশির করে।'

'তাই ব'লে মাথায় ঠেকাবে কেন ? বইটা একটা জড়বস্তু, কাগজ আর কালি দিয়ে তৈরি। তাকে পুজো করলে তো আর বিদ্যে হবে না তোমার। তুমিও যদি এ-সব ফেটিশে ভোগো, তাহ'লে অন্যদের আর কথা কী!'

'যদি মেঝের ওপর এক সেট "রবীন্দ্র রচনাবলী" ছড়ানো থাকে, তুমি পারবে জুতোসুদ্ধ পায়ে সেটাকে মাড়িয়ে হেঁটে যেতে ?'

'বইগুলো নষ্ট হ'তে পারে, তাই আমি ও-কাজ করবো না।'

'আর যদি নষ্ট না হয় ? খালি পায়ে একখানা "রচনাবলী"র ওপর তিন মিনিটের জন্য দাঁড়াতে পারবে ?'

'তা কেন পারবো না ?' অনায়াসে জবাব দিলো গৌতম, 'তাতে রবীন্দ্রনাথের কোনো অসম্মান হবে ব'লে আমি মনে করি না। তবে তাঁর পেশাদার ভক্তদের হৃদয়ে যদি আঘাত লাগে, সেটা আলাদা কথা।'

আরতি একটু চুপ ক'রে থাকলো, সন্ধ্যার আবছায়ায় জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো তার চোখ। হঠাৎ উৎসাহের সুরে বললো, 'ঠিক— চমৎকার বলছো—ঠিক কথা! আমি একদিন পরীক্ষা করবো তোমাকে, আর সেই পরীক্ষায় যদি সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'তে পারো তাহ'লে তোমাকে বিয়ে করবো—কথা দিচ্ছি।'

'কী পরীক্ষা ?'

কিন্তু এ-প্রশ্নের উত্তর শোনা গৌতমের ভাগ্যে ছিলো না সেদিন।

সে-মুহূর্তে আলো জ্ব'লে উঠলো, আর কেশববাবুর গলা শোনা গেলো—'কই রে, দিয়েছে নাকি চা ?'—কিন্তু পরমুহূর্তেই গৌতমকে দেখে, মেয়েকে আর ঐ ছেলেটিকে খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, কেশববাবু আবার বললেন, 'তা—আমার চা-টা না-হয় ও-ঘরেই পাঠিয়ে দে।'

'না, বাবা, এখানেই বোসো; সবাই একসঙ্গে খাওয়া যাক। গৌতম, আমার বাবা এখনো লজ্জা পান তোমাকে, তুমি বোসো; ওঁর সঙ্গে আলাপ করো। বাবা, গৌতম খুব ভালো ছেলে, নামজাদা ছাত্র ছিলো প্রেসিডেন্সিতে, এখন আই. এ. এস. পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে।'

'বাঃ, খুব ভালো!' কেশববাবু বসলেন, গৌতমকেও বসতে হ'লো, টেবিলে হাজির হ'লো চায়ের সঙ্গে বাড়িতে তৈরি ডিমের শিঙাড়া, পুঁটিরামের সন্দেশ, আর একগোছা লিচু—কিন্তু আলাপ জমলো না একেবারেই। কেশববাবু একটু লাজুক, গৌতম অস্বাভাবিক গম্ভীর; আরতি যে-প্রসঙ্গই তোলে, একটা-দুটো মন্তব্যের পর কথা এগোয় না। বাবার সঙ্গে ব'সে চা খাওয়াটা (যা খুব কমই ঘটে) আরতি যে-রকম ভেবে রেখেছিলো তার কিছুই হ'লো না; গৌতমও আজ সন্ধ্যার পরিসমাপ্তি যে-রকম আশা করেছিলো তা ভেস্তে গেলো। নিজের ওপর রাগ হ'লো তার বোকার মতো এখানে ব'সে আছে ব'লে, আর কেশববাবুও ভাবতে লাগলেন কতক্ষণে একটা ভদ্রগোছের ছুতো ক'রে উঠে পড়া যাবে।

একটি শিঙাড়া তুলে কামড় দিতে গিয়ে হঠাৎ আরতি থেমে গেলো। চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো—'ঐ তো দুর্গাদাস!' তার পিঠের এমন একটা ভঙ্গিও হ'লো যেন উঠে এগিয়ে যাবে দুর্গাদাসের দিকে, কিন্তু কী ভেবে সামলে নিলো নিজেকে। দুর্গাদাস কাছে এসে বললো, 'কেন? কী ব্যাপার?' সে আসার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের আবহাওয়া হালকা হ'য়ে গেলো, কেশববাবু স্পষ্টত আরো আরাম

ক'রে বসলেন, আর গৌতমও বুঝলো যে এর পরে আর কথার অভাব হবে না। তার ইচ্ছে হ'লো তক্ষুনি উঠে চ'লে যায়, কিন্তু আরতি কেন দুর্গাদাসের জন্য অমন ব্যস্ত ছিলো তা জানার জন্য কৌতূহল অনুভব না-ক'রে পারলো না; অগত্যা ব'সেই রইলো।

'দুর্গাদাস, কোথায় ছিলে সারাদিন?'

'এই—নানা জায়গায়।'

'আমার চিঠি পেয়েছো?'

'চিঠি? না তো। আমি বাড়ি যাইনি এখনো। কিন্তু চিঠি কেন?'

'কাল এক উন্মাদের প্রলাপ শোনার পর সুস্থ আছো কিনা তা জানার জন্য,' আরতি গম্ভীর চোখে দুর্গাদাসের দিকে তাকালো।

'ও—' মিষ্টি ক'রে হাসলো দুর্গাদাস। 'দাঁড়াও—চা দাও আগে। বাঃ, লিচু! ভারি মিষ্টি তো।'

আরতি দুর্গাদাসের সামনে একটা প্লেট রেখে বললো, 'খোশা এখানে ফেলবে, মেঝেতে না।—জানো, বাবা,' কেশববাবুর দিকে এক পলক তাকিয়ে বলতে লাগলো সে, 'কাল তরুণ লেখকদের এক মীটিঙে গিয়েছিলাম—আশ্চর্য সব বক্তৃতা হ'লো সেখানে, আমি ভুলতে পারছি না—বলো না দুর্গাদাস, বাবাকে বলো সংক্ষেপে।'

'ও আবার বলার আর কী আছে।'

'সেই আরশোলার কথাটা!' আরতি আস্তে-আস্তে বললো, 'আমার ভয় হচ্ছিলো বলতে-বলতে একটা স্ট্রোক-ফ্রোক না হ'য়ে যায় বেচারার। আমাকে তুমি বকো, বাবা, আমি রেগে যাই ব'লে—কাল যদি শ্রীপতিকে দেখতে—'

'শ্রীপতি? কোন শ্রীপতি?'

'সেই যে আরতিকে পড়াতো ওর অনার্স পরীক্ষার সময়,' দুর্গাদাস একটু বিশেষ আগ্রহ নিয়ে কেশববাবুর দিকে তাকালো, 'আপনার মনে আছে, কাকাবাবু?'

'বাঃ, মনে আছে না! যা বাগীশ্বর ছেলে—ওর সঙ্গে একবার কথা বললে কি আর ভোলা যায়? আমি শুধু ভাবতাম, ঐটুকু বয়সে অত পড়ার সময় পেয়েছিলো কখন? একদিন ডাক্তারি শাস্ত্রের ইতিহাসই সাত কাহন শুনিয়ে গেলো আমাকে—আমি ও-সবের কিছুই জানতাম না! কিন্তু—একটু একসেন্‌ট্রিক, তা-ই না?'

'হ্যাঁ, ঠিক অন্যদের মতো নয়,' সংক্ষেপে জবাব দিলো দুর্গাদাস।

'ছ-মাস পড়িয়েছিলো অরুকে, কিন্তু দু-মাসের পরে আর টাকা নেয়নি, কিছুতেই দিতে পারিনি ওকে—বললেই বলেছে, "পরে নেবো, আপনার কাছে থাক, আমার দরকারমতো আমি চেয়ে নেবো।" তুই তো টাকা নিয়ে আমাকে অত লম্বা উপদেশ দিলি, অরু—কিন্তু সংসারের সবাই যে মহেশ্বর পাল নয় তাও তো দেখা যাচ্ছে।'

ডাক্তারের এই কথাটিতে ঘরের মধ্যে এক গভীর স্তব্ধতা নামলো, অন্য তিনজন পরস্পরের দিকে তাকালো না। কেশববাবু একটু অবাক হলেন, ভাবলেন এইজন্যই ছোটোদের সঙ্গে বয়স্কদের বেশি মেশা উচিত নয়, হয়তো না-বুঝে এমন-কিছু ব'লে ফেলেছেন যা এদের ভালো লাগেনি। কিন্তু পরমুহূর্তেই কী-একটা সত্যের আভাস যেন উঁকি দিলো তাঁর মনের মধ্যে। দুর্গাদাসকে লক্ষ ক'রে বললেন, 'আমার মাঝে-মাঝেই মনে পড়ে সেই টাকাটার কথা; শ্রীপতিকে তা পাঠিয়ে দেয়া কি উচিত নয় আমার? তুমি কী বলো, দুর্গাদাস?'

'এখন থাক। আমি পরে বলবো আপনাকে।'

'বেশ, তোমরা যা ভালো বোঝো। তা শ্রীপতি ভালো আছে তো? অনেকদিন দেখিনি তাকে।'

এক মুহূর্ত পরে দুর্গাদাস জবাব দিলো, 'না, কাকাবাবু, ভালো নেই।'

'ভালো নেই? কোনো অসুখ করেছে?'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে।' যে-কথা বলার জন্য দুর্গাদাস এতক্ষণ ধ'রে মনে-মনে প্রস্তুত হচ্ছিলো, এবার সেটা এক ধাক্কায় বের ক'রে দিলো—'আর অসুখটা বোধহয় ভালোও না। আমি এ-কথা বলার জন্যই আসছিলাম এখানে, আপনাকেও পেয়ে গেলাম, কাকাবাবু—ভালোই হ'লো।'

'কী ব্যাপার বলো তো?'

'ব্যাপার মানে—কী অসুখ তা তো আমি বলতে পারবো না—তবে জ্বর হয়েছে, বেশি জ্বরও না—তবে দুর্বল হয়েছে—আমার সঙ্গে শুয়ে-শুয়েই কথা বললো, বেশি কথাও বললো না।'

আরতি হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে উঠে বললো, 'একটু গুছিয়ে বলার চেষ্টা করো, দুর্গাদাস—শুধু আবোলতাবোল বকবে নাকি সারা জীবন? আজ কখন গিয়েছিলে ওর কাছে?'

'এই তো দুপুরবেলায়।'

'কী দেখলে গিয়ে? ভালো ক'রে বলো—বাবা ডাক্তার, শুনলে বুঝবেন।'

'শুয়েই ছিলো, আজকাল ও শুয়েই থাকে প্রায় সারা দিন, ওর মতে শুয়ে থাকাটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ, কেননা— '

'মন্তব্য শুনতে চাই না,' আরতি বাধা দিলে, 'ঘটনাটা বলো।'

'তা, আমাকে দেখে বললো—"আমার কাছে থাকিস না, চ'লে যা। কেউ আমার কাছে থাকলে আমার অসুখ আরো বেড়ে যায়।" গায়ে হাত দিয়ে জ্বর মনে হ'লো, টেবিলে দেখলাম এঁটো চায়ের পেয়ালা আর একটা বিস্কুটের টুকরো—সকাল থেকে প'ড়ে আছে নিশ্চয়ই—জিগেস করলাম দুপুরে কিছু খেয়েছিলো কিনা, বললো "খেয়েছি"; স্নান করেছে কিনা, বললো "হ্যাঁ"—কিন্তু বিছানার চাদর-টাদরগুলো—মানে—অনেকদিন কাচানো হয়নি মনে হ'লো—বালিশের তলা থেকে একটা রুমাল টেনে নিয়ে ঘাম মুছলো, সেটাতে খয়েরি রঙের ছোপ-ছোপ দাগ, বললো নাক দিয়ে রক্ত

পড়েছে। আর হাতের কাছে কোনো বই-টইও নেই, আমি বইয়ের কথা তুলতে বললো, "বই ভাবতে আমার ঘেন্না করে আজকাল, শুয়ে-শুয়ে সেই দিনের কথা ভাবি যেদিন বোমা প'ড়ে ইউনিভার্সিটিগুলো ধ্বংস হ'য়ে গেছে, ভস্ম হয়েছে সব লাইব্রেরি, লুপ্ত হয়েছে নাম তারিখ ইতিহাস; আইন আদালত আপিশ ফ্যাক্টরি—কিছুরই কোনো চিহ্ন নেই পৃথিবীতে, যেদিন মানুষ অবশেষে বাঁচতে আরম্ভ করেছে—আমিও সেইদিন পর্যন্ত বাঁচতে চাই।" অদ্ভুত! কাল ঐ মীটিঙে যা বললো ঠিক তার উল্টো কথা না?'

'দুর্গাদাস!'—টেবিলে টোকা দিলো আরতি—'টিপ্পনীগুলো বাদ দাও;—তারপর?'

'আমি অনেকক্ষণ ব'সে থাকলাম, কিন্তু কোনো কথার মধ্যে ঠিকমতো টানতে পারলাম না ওকে, শুধু মাঝে-মাঝে বলতে লাগলো, "এখানে ব'সে আছিস কেন, চ'লে যা বলছি।" তিনটে নাগাদ ওর একটু তন্দ্রা এলো, আমি ওর হাতের কাছে খাবার জল রেখে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এলাম।'

'"বেরিয়ে এলাম।" বেশ করেছো! চমৎকার!' আরতির হাত নাড়াতে একটা কাচের গ্লাশ উল্টে গেলো, দুর্গাদাস তাড়াতাড়ি ধ'রে ফেললো সেটাকে—'তিনটের সময় বেরিয়েছো সেখান থেকে, আর এখন ক-টা বাজে, শুনি?'

'ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে কাজ ছিলো একটু, আর সেখান থেকে—'

'দেখছো তো বাবা, আজকালকার ছেলেদের নমুনা দেখছো তো! একজন অসুস্থ বন্ধুকে একা ফেলে মনের আনন্দে আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে; আর ঐ আর-একজন—' চোখ দিয়ে গৌতমের দিকে ইঙ্গিত করলো সে, 'ফিনফিনে ধোপের পাঞ্জাবি প'রে অবিচলভাবে বন্ধুর অসুখের কথা শুনছে। কফি-হাউসে গুলতানি করার বেশ আর-একটা বিষয় হলো—না, গৌতম?'

'অরু!' কেশববাবু লাল হলেন একটু, 'কী যা-তা সব বলছিস!'

'আমরা কেউ কিছু মনে করিনি,' মুরুব্বিয়ানার সুরে গৌতম বললো, 'আপনার মেয়ের কথা শুনে অভ্যেস আছে আমাদের।'

কথাটা ভালো লাগলো না কেশববাবুর; দুর্গাদাসের দিকে ফিরে বললেন, 'কোনো ডাক্তার দেখেছিলো শ্রীপতিকে?'

'জানি না।'

'কোনো চাকরি করে?'

'ট্যুশনি ক'রে চালায়—কিন্তু মাঝে কিছুদিন ট্যুশনিও বোধহয় ছিলো না।'

'কোথায় থাকে?'

'থাকে হাজরা রোডের কাছে একটা গলিতে। হ্যাঁ—সে আর-এক কথা। এক ভদ্রলোক ওকে সাব-লেট করেছিলেন ঘরটা, তিনি ছুটিতে বাইরে গেছেন, কিন্তু ব'লে গেছেন ফিরে এসে ঐ ঘরটা তাঁর নিজেরই লাগবে। এ-কথাটা আমি আগেই জানতাম, কিন্তু কাল আবার জিগেস করাতে শ্রীপতি কিছুই জবাব দিলো না। তা এদিকে যদি—তাই ভাবছিলাম, কাকাবাবু, আপনি যদি ওকে একবার—'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই যাবো! তা আর বলতে!'

'কাল সকালে এসে আমি নিয়ে যাবো আপনাকে?'

'বেশ তো—ঠিক আটটার মধ্যে এসো কিন্তু—দেরি কোরো না; দশটায় আমাকে হাসপাতালে যেতে হয়, জানো তো।

'আজ রাত্রেই গেলে হয় না, বাবা? এখনই গেলে হয় না?'

মেয়ের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে কেশববাবু উঠে দাঁড়ালেন।—'হ্যাঁ তা-ই ভালো। অসুখ-বিসুখে দেরি করাটা কিছু না।'

তাঁর পেছন-পেছন ঘরে ছুটে এলো আরতি; ডাক্তারের ব্যাগ এগিয়ে দিলো, পকেটে দিলো টাকা সিগারেট ফাউন্টেন পেন; হঠাৎ

একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো বাবাকে। কেশববাবু তার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'তুইও চল তাহ'লে।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো চারজনে। রাস্তায় এসে দুর্গাদাস বললো, 'কী মেঘ করেছে দেখছো।'

'অনেক আগে থেকেই তো মেঘ ক'রে আছে,' বললো গৌতম। 'জোলো হাওয়াও দিচ্ছে এখন—আজ বৃষ্টি না-হ'য়ে যায় না।'

'হ'লেই ভালো—শহরটা ঠাণ্ডা হবে। উঠে পড়ো সবাই।'

আরতি আর দুর্গাদাস ডাক্তারের সঙ্গে পেছনে বসলো; একটু ভেবে গৌতমও উঠে পড়লো ড্রাইভারের পাশে। সে ভাবছিলো একটা সাধারণ ব্যাপারকে বড্ড ফেনিয়ে তোলা হচ্ছে, কিন্তু প্রেমে পড়লে মানুষের স্বাধীনতা থাকে না।

৬

'সপ্তর্ষি'র মীটিং থেকে যখন বেরোলো তখন শ্রীপতির শরীরে যেন আর ওজন নেই ; মাথার মধ্যে ঘূর্ণি চলছে। বাইরের হাওয়াটা খুব ভালো লাগলো তার, হঠাৎ ইচ্ছে হ'লো কোথাও ঢুকে এক পেয়ালা চা খেয়ে নেয়—কিন্তু না, যে-পেয়ালায় অন্যেরা খাবে তাতে তো আর চুমুক দিতে পারে না সে, ও-সব শেষ হ'য়ে গেছে। কয়েক মিনিটের জন্য সে যেন ভয়ে অসাড় হ'য়ে থাকলো, পাছে অন্যদের ছোঁয়াচ দেয়। আজ বিকেলেই যারা তার ঘরে এসেছিলো তাদের কথা ভাবলো—তার বিছানাতেও ব'সে গেছে ওরা—বন্দনা, দুর্গাদাস, ঐ হিমেন্দু ব'লে ছেলেটি—আর দুর্গাদাস যদি আবার আসে, তাহ'লে ? সে চ'লে যাবে, কোথাও তাকে চ'লে যেতেই হবে, অনেক দূরে, নির্জনে, তাকে এড়িয়ে চলার বা তার জন্য ব্যস্ত হবার মতো কেউ নেই যেখানে। কথাটা ভেবেই তার ভয়ের ভাবটা কেটে গেলো, আস্তে-আস্তে অন্য এক কথা মনে হ'লো। আসলে তার এখনকার অবস্থাটা চমৎকার, রীতিমতো ঈর্ষাযোগ্য—এতদিন শুধু অন্য কারো জন্য তার দায়িত্ব ছিলো না, এখন থেকে নিজের দিক থেকেও সব দায়িত্ব চ'লে গেলো। এখন সে যা খুশি তা-ই করতে পারে, একেবারে যা খুশি তা-ই। ঐ যে বুড়ো ভিখিরি ফুটপাতে ব'সে আছে, হঠাৎ যদি টুঁটি চেপে মেরে ফ্যালে তাকে—কী হবে তাহ'লে ? কিছুই হবে না ; কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তার। একটি মহিলা তাঁর কিশোরী মেয়েকে নিয়ে হেঁটে আসছেন ; যদি মুখোমুখি হওয়ামাত্র এক ধাক্কায় মেয়েকে ফেলে দেয় রাস্তায় আর মা-কে সজোরে জাপটে ধরে, তাহ'লে—তাহ'লেই বা কী হবে ? কিছুই

হবে না। রাস্তায় লোকজন জড়ো হ'য়ে মারের চোটে তার হাড় গুঁড়িয়ে দেবে—কিন্তু কিছুই হবে না। অত মার খেয়েও হা-হা ক'রে হাসতে পারবে সে। কিংবা যদি লেকে যায় এক্ষুনি; গিয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে, অনেকক্ষণ তারার তলায় শুয়ে থাকার পর, আরামে প্রায় ঘুমিয়ে পড়ার পর, আস্তে গড়িয়ে চ'লে যায় জলের মধ্যে, আর কাল সকালে তার মাছে-ঠোকরানো ফোলা শরীরটা ভেসে ওঠে, তাতেই বা কী—কিছুই না, কিছুই এসে যায় না। কী আশ্চর্য ক্ষমতা আমার এখন, আমি সব পারি, কোথাও কোনো বাধা নেই আমার। এখন কথাটা হচ্ছে: এই ক্ষমতা কোন কাজে লাগাই।

বাড়ি ফিরেই বাথরুমে ঢুকলো, কয়েকবার কেশে থুতু ফেললো, কিন্তু শাদা ছাড়া আর-কিছুই উঠলো না। ওৎ পেতে আছে, খেলা করছে আমার সঙ্গে। মুখে জলের ঝাপটা দিতে গিয়ে ইচ্ছে হ'লো স্নান করে। বিকট ঘেমেছে ঐ মীটিঙে। কিন্তু ঝর্নার নিচে দাঁড়াবার একটু পরেই জল আর ভালো লাগলো না, শীত ক'রে উঠলো, কোনোরকমে আবার কাপড় প'রে নিয়ে বেরিয়ে এসে সোজা শুয়ে পড়লো বিছানায়। সঙ্গে-সঙ্গে এক অকথ্য কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়লো তার শরীরে, দাঁতে-দাঁতে শব্দ হ'লো, হাড়-গোড় সুদ্ধু ঠকঠক করছে যেন—চাদরটার তলায় ঢুকে গিয়ে গোল হ'য়ে প'ড়ে থাকলো, এটুকু সাধ্য হ'লো না যে তোশকের তলা থেকে কম্বলটা টেনে বের করে। এ কিছু না—ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়তো, বা ডেঙ্গু—আজকাল খুব ডেঙ্গু হচ্ছে শহরে—দু-দিন পরে নিজে-নিজেই সেরে যাবে। তবু—একবার ডাক্তার দেখালে হয় না? না, না—বিশ্রী লাগে ডাক্তার ভাবতে, বিশ্রী লাগে ওদের বুকে-পিঠে টোকা—এই যে, কাঁপুনি ক'মে যাচ্ছে, ঘুম পাচ্ছে আমার, ঘুমোনো যাক।

ঝাপসা ঘুম, এলোমেলো স্বপ্ন, মাঝে-মাঝে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকা—কখনো পায়ের পাতা হিম, কখনো যেন গা পুড়ে যাচ্ছে। টুকরো ছবি ভেসে-ভেসে উঠছে অন্ধকারে—তার বিধবা মা, তাদের

গ্রামের বাড়ি, মিষ্টি সোঁদা গন্ধে ভরা ঠাণ্ডা ঠাকুরঘরটা, জষ্টিমাসে ঠাকুমার মুখে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা শোনা, আর সেই যে একটা মেয়ে—কী না নাম?—যার সঙ্গে সে ফুল চুরি করতে বেরোতো সরস্বতী-পুজোর শেষরাত্রে, আর তার হৃদয়হীন, সুদখোর, সারা বাড়ির ও প্রায় সারা গ্রামের ডিক্টেটর জ্যাঠামশাই, যাঁর তাড়নায় টিকতে না-পেরে সে কলকাতায় পালিয়ে এসেছিলো। আশ্চর্য—আমারও একটা ছেলেবেলা ছিলো, একজন মা ছিলো—কিন্তু কত দূর, যেন অন্য দেশ, অন্য জগৎ, অন্য কেউ। আমি কেঁদেছিলাম? হয়তো—হ্যাঁ, খুব কেঁদেছিলাম—কিন্তু একজন মানুষের চিরকালের মতো হারিয়ে যাওয়ার তুলনায় সে-কান্না আর কতটুকু। 'মা, আমাকে ক্ষমা করো, আমি যথেষ্ট কাঁদিনি তোমার জন্য।' শ্রীপতি চেষ্টা করলো শব্দ ক'রে কথাটা বলতে, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলো না। আর তাছাড়া—কোনো মানে হয় না ও-সবের, কী লাভ? কে কতটুকু কাঁদলো, কেউ কাঁদলো কিনা—কী এসে যায়? মৃত্যু শেষ কথা—তার কোনো উত্তর নেই, ক্ষতিপূরণ নেই, সব কথা সেখানে এসে থেমে যায়। নিঃসঙ্গতা—এক অতল, অনন্ত, ও আমাদের পক্ষে ধারণাতীত নিঃসঙ্গতা : তারই নাম মৃত্যু। না, না, আমি তখন যা ভেবেছিলাম তা হ'তেই পারে না। আমি সেরে উঠবো—নিশ্চয়ই—আমার কিছু হয়নি। এই তো আমি শুয়ে আছি আমার ঘরে, চার নম্বর নিমু দত্ত লেনে, আমার নাম শ্রীপতি ভদ্র, বয়স আটাশ, আজ জুন মাসের সতেরো তারিখ। হঠাৎ নিশ্চিন্ত বোধ করলো শ্রীপতি, টের পেলো জানলা দিয়ে ফুরফুর ক'রে হাওয়া আসছে, মনে হ'লো তার শরীরে কোনো কষ্ট নেই, মনে হ'লো গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়বে এবার। আর ঠিক তখনই দেখতে পেলো দরজার সামনে কেউ একজন—একটি মেয়ে, সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে, সোজা তাকিয়ে আছে তার দিকে, অন্ধকারে তারার মতো ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে। শ্রীপতি অবাক হ'লো না, নড়লো না, তার দৃষ্টি মিশিয়ে দিলো সেই দৃষ্টিতে, যেন মুগ্ধ,

যেন রুদ্ধশ্বাস। চোখে চোখ রেখে কাটলো কয়েকটি মুহূর্ত, তারপর আস্তে-আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো সেই ঝকঝকে চোখ, সেই সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার ভঙ্গি। তখনও শ্রীপতি অবাক হ'লো না— কিন্তু হঠাৎ আনন্দের মতো একটা অনুভূতিতে কেঁপে উঠলো। তার দেরাজে একটি চিঠি লুকোনো আছে—এ কি হ'তে পারে যে তার উত্তর দেবার সে সময় পাবে না? মনে পড়লো একে-একে তার বন্ধুদের, ভালো লাগলো ভাবতে যে অনেককে নিয়ে একসঙ্গে সে বেঁচে আছে এই কলকাতায়। মনে পড়লো সেই ভোরবেলাটি, যখন সে দেশের বাড়ি ছেড়ে, জ্যাঠামশাইয়ের খপ্পর এড়িয়ে, প্রথম হাওড়া স্টেশনে এসে নেমেছিলো।

জ্যাঠা তাকে স্কুল-ফাইনেলটাও পাশ করাতে চাননি, জোর করেছিলেন রায়গঞ্জে তাঁর কাপড়ের আড়তে বসার জন্য। 'বাড়ির ভাত খাবি, পনেরো টাকা ক'রে হাত-খরচ পাবি আপাতত, ব্যাবসাটা জ'মে উঠলে তোকে আর ভাবতে হবে না। পাশ-ফাশ ক'রে কী হবে—জানিস না কত বি. এ. এম. এ. ফ্যা-ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়ায় কলকাতায়!' জ্যাঠার কথার মধ্যে যেটুকু তার ভালো লেগেছিলো, তা ঐ 'কলকাতা' শব্দটা—বাচ্চা বয়সে গিয়েছিলো একবার মা-র সঙ্গে—কী প্রকাণ্ড, কী ডামাডোল সারাক্ষণ, তখন একটু ভয় পেয়েছিলো, কিন্তু এখন তার মন টানে সেখানেই, জ্যাঠার রাজত্ব ছেড়ে সেই বিশালতার মধ্যে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। ট্রেনে মাত্র পাঁচ ঘণ্টার পথ—চ'লে গেলেই তো হয়। জ্যাঠার প্রস্তাবে রাজি হ'য়ে গেলো সে, স্কুল ছেড়ে দিয়ে কাপড়ের আড়তে বসলো, তার কাজে খুশি হ'য়ে মাসের শেষে জ্যাঠা বললেন, 'তোর হবে। এই নে পাঁচ টাকা, আর দশ টাকা তোর নামে পোস্টাপিশে রাখছি। বছরের শেষে একশো-কুড়ি টাকা হ'য়ে যাবে তোর, তার ওপর সুদ— বুঝেছিস!' আরো দু-মাস আটকে রইলো আড়তে, আরো দু-বার পাঁচ টাকা ক'রে হাতে পেলো, তারপর একদিন একটি ছোট্ট টিনের

স্যুটকেস হাতে ক'রে নামলো এসে হাওড়া স্টেশনে। সন্ধে তখন, শীতকাল। তার পরনে মোটা ধুতি, গায়ে শার্টের ওপর শস্তা আলোয়ান, পায়ে রবারের জুতো, আর দশটি টাকা পকেটে। কলকাতায় মাত্র একজন মানুষের নাম জানে সে : নিবারণ মুখুজ্জে, তাদের গ্রামের স্কুলে পড়াতেন আগে, এখন বেলেঘাটা চিত্তরঞ্জন হাই স্কুলের হেডমাস্টার। হাওড়া স্টেশন থেকে বেলেঘাটায় কী ক'রে পৌঁছতে হয় সেই বিরাট সমস্যার মুখোমুখি হবার মতো সাহস তার তক্ষুনি হ'লো না; সে-রাতটা হাওড়া স্টেশনেই ঘুমোলো— আলো, আওয়াজ আর লোকজনের মধ্যে নিরাপদ মনে হ'লো নিজেকে। পরের দিন অনেক জনকে অনেক বার জিগেস ক'রে-ক'রে, কয়েকবার ভুল বাস্‌-এ উঠে আর কয়েকবার ভুল বাস্‌-এ ওঠার ভয়ে আবোলতাবোল হেঁটে, প্রায় চার ঘণ্টার চেষ্টায় অবশেষে পৌঁচেছিলো বেলেঘাটার চিত্তরঞ্জন হাই স্কুলে। মাষ্টারমশাই প্রথমে তাকে চিনতে পারেননি—বয়সের পক্ষে দেখতে বড্ড বড়ো হ'য়ে গিয়েছিলো সে—কিন্তু তার আর্জি শুনে দয়া করেছিলেন (পুরো কথাটা সে বলেনি অবশ্য), বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন কয়েকদিন, এমনও বলেছিলেন যে সে যদি কলকাতায় এসে পড়তে চায় তাঁর স্কুলে তাকে ফ্রী ক'রে দেবার চেষ্টা করবেন, কিন্তু সবই বলেছিলেন এই ধারণা থেকে যে তার অন্য সব খরচ সে বাড়ি থেকে পাবে। পাছে তিনি টের পেয়ে যান সে বাড়ি থেকে 'পালিয়ে' এসেছে, আর পাছে তার হদিশ পেয়ে জ্যাঠা তাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে আবার চাকর খাটাতে লেগে যান, সেই ভয়ে মাষ্টারমশাইয়ের দয়া থেকেও তাকে পালাতে হ'লো। আর তারপর—

আশ্চর্য এই যে সে ম'রে যায়নি—না রোগে, না অনাহারে, না হঠাৎ একদিন গাড়ি চাপা প'ড়ে। ফেরি করেছে খবর-কাগজ, চায়ের দোকানে বেয়ারার কাজ করেছে, হিশেব লিখেছে বড়োবাজারে মারোয়াড়ির গদিতে—পার্কে ঘুমিয়েছে, বস্তিতে থেকেছে, মাতালের

হল্লা আর বেশ্যার খিস্তি শুনে-শুনে কানের চামড়া পুরু হ'য়ে গেছে তার ; কিন্তু সব সত্ত্বেও — শুধু যে ম'রে যায়নি তা নয়, চোদ্দ-পনেরোর মতো সাংঘাতিক বয়সেও উচ্ছন্নে যায়নি, হয়নি পকেটমার বা চোরাই মালের দালাল, বা রণে ভঙ্গ দিয়ে জ্যাঠার আশ্রয়ে ফিরে যাবার কথাও ভাবেনি। সময় পেলেই স্টলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নানা পত্রিকা পড়েছে, দু-চার টাকা হাতে এলেই হানা দিয়েছে পুরোনো বইয়ের দোকানে — কখনো-কখনো এমন বই পেয়েও গেছে যা খুলে বসলে অন্য সব ভুলে যেতে হয়। যেখানেই থাক, যে-কাজই করুক, তার ইচ্ছের ঝোঁক অন্য দিকে, তাছাড়া ভাগ্যও তার সহায় ছিলো নিশ্চয়ই — নয়তো সতেরো বছর বয়সে কলেজ স্ট্রিটের ঐ বইয়ের দোকানটাতেই কাজ জুটে যাবে কেন শেষ পর্যন্ত? বইয়ের পার্সেল প্যাক ক'রে ঠিকানা লেখা তার কাজ, কেউ গর-হাজির হ'লে অন্য ফরমাশও খাটতে হয়, কিন্তু ফাঁকে-ফাঁকে প'ড়েও নিতে পারে কিছু-কিছু, বইয়ের গন্ধে ভরা আধো-অন্ধকারে ব'সে থাকতেও ভালো লাগে তার। দোকানের মালিক শিবেশ্বরবাবু তার পড়ার ঝোঁক লক্ষ ক'রে পোকায়-কাটা পুরোনো বই মাঝে-মাঝে দিয়ে দেন তাকে, পুজোর সময় আশাতীতভাবে তাকে বোনাসও দিলেন; পরের বছর প্রাইভেটে স্কুল-ফাইনেল পরীক্ষাটা সে দিতে পারলো। ঐ অবস্থায় পরীক্ষা দিয়েও সে যে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে, এতে শিবেশ্বরবাবু এত খুশি হলেন যে তাঁর নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন তাকে; সকালে তাঁর দুই নাতি-নাৎনিতে পড়ায়, দুপুরবেলা ক্লাশ করে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে, বিকেলে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বই বেচে — এমনি ক'রে আই. এ.-র বেড়া টপকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এলো সে। পেরিয়ে এলো ট্যুশানির অনেকগুলো ধাপ, এখন সে শিবেশ্বরবাবুর জন্য প্রুফ দ্যাখে, 'হেল্প টু দি স্টাডি অব...' পর্যায়ে বইও লিখে দেয়, থাকে মির্জাপুর স্ট্রিটের এক মেস্-এ, জামা-কাপড় নিজে না-কেচে লণ্ড্রিতে দিতে দ্বিধা করে না।

বিখ্যাত প্রেসিডেন্সি কলেজ, যার সামনের ফুটপাত দিয়ে হাঁটতেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত শ্রদ্ধায় মাথা নিচু হ'য়ে গেছে তার—সেই কলেজের সে এখন অন্যতম সদস্য, এই ধারণাটার সঙ্গে অভ্যস্ত হ'তে মাত্র কয়েকদিন সময় লাগলো তার, কিন্তু বেশিদিন লাগলো না। মাস দুয়েকের মধ্যে সে এমন একটা আবিষ্কার করলো যাতে সে অবাক হ'য়ে গেলো রীতিমতো, কিন্তু সেই অনুভূতিও অজান্তে একদিন উবে গেলো। কী সহজে সবই মেনে নিই আমরা, সব-কিছুকেই ভোঁতা অভ্যেসে অধঃপতিত করি, আর তারপর থেকেই অন্য কিছুর জন্য জ্বলুনি-পুড়ুনি শুরু হ'য়ে যায়। আজ কী এসে যাচ্ছে যে কয়েক বছর আগে প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলো সে—সব ছাত্র যাকে একডাকে চেনে, অধ্যাপকেরাও সমীহ ক'রে চলেন, টেরিলিনের শার্ট-পরা স্কলার্শিপ-পাওয়া ছেলেরা যাকে ঘিরে দাঁড়ায়, আর যাকে সিঁড়িতে দেখলে এমন মেয়ে নেই যে আড়চোখে বা সোজাসুজি দৃষ্টিপাত না করে। ছেলেরা তাকে ছাত্র-সমিতির সেক্রেটারি ক'রে নিতে চাইলো, সাধ্য-সাধনা করলো কলেজ-পত্রিকার সম্পাদক হবার জন্য, প্রোফেসর বললেন সেমিনারের সেক্রেটারি হ'তে—ছাত্র-জীবনের সবচেয়ে লোভনীয় ও মাননীয় এই পদগুলি—কিন্তু প্রত্যেকটাকেই দাম্ভিক বিনয়ের সঙ্গে আলগোছে সরিয়ে দিলো সে। তবু সে-ই যেন কেন্দ্র, তারই চারপাশে কিছু-একটা গ'ড়ে উঠতে চাচ্ছে, যেন একটা নাটক শুরু হ'য়ে গেছে যার পরিচালক সে ছাড়া আর-কেউ হ'তে পারে না, কলেজটা যেন একাধারে তারই কর্মস্থল ও প্রমোদভবন, আর রাস্তার ওপারে কফি-হাউস তার ব্যক্তিগত সাম্রাজ্য। ক্লাশ কামাই করে, মুখে-মুখে তর্ক চালায় প্রোফেসরদের সঙ্গে, যখন যে-মত তার কানে আসে তক্ষুনি প্রতিবাদ করে তার—যদি দু-দিন আগে সে-কথা সে নিজেই ব'লে থাকে, তবুও; কিন্তু তাকে যেন সবই মানিয়ে যায়, কেউ কিছু বলে না তাকে, কিংবা একজনের ভ্রূকুটি অন্যদের প্রশ্রয়ে

তলিয়ে যায়। অথচ পড়াশুনোর দিক থেকে তাকে 'ভালো ছেলে' বলা অসম্ভব ; টিউটরিয়েলে উঁচু নম্বর সে কখনোই পায় না—যে-সব বইয়ের ওপর দিয়ে তার চোখ আর মন ঝড়ের বেগে ছুটে চ'লে যায় তাতে জগতের জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক-কিছুই থাকে, শুধু থাকে না কলেজের পাঠ্য বই বিষয়ে কেনো উল্লেখ, মাষ্টারমাশাইদের অনুমোদিত কোনো তথ্য। তার কৌতূহল যেন দাবানলের মতো জ্বলছে ; যে-কোনো একজন মানুষের যাতে আগ্রহ জাগতে পারে তারও তাতে আগ্রহ ; লাইব্রেরিতে যে-বইটার জন্য যায় সেটা বেমালুম ভুলে গিয়ে হয়তো মধ্যযুগের ডাইনি-বিদ্যার মস্ত ইতিহাস শেষ ক'রে ফ্যালে। এমনি ক'রে থার্ড ইয়ারটা কাটলো তার ; নিজের ক্ষমতার বিষয়ে সচেতন হবার পর সেই ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারী ব্যবহার ক'রে। এক-এক সময় এমনকি, তার অতীতের দিকে তাকিয়ে, নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে মনে-মনে বলেছে, 'শাবাশ, শ্রীপতি, শাবাশ। চমৎকার করেছো তুমি!'

ছাত্রদের প্রেমে পড়া, পলিটিক্স করা, বাউণ্ডুলেপনা, যথেচ্ছাচার—এ-সবের মেয়াদ সাধারণত থার্ড ইয়ার পর্যন্ত ; ফোর্থ ইয়ারে উঠেই চাল-চলন বদলে যায় তাদের, ভালো ছেলেরা অন্য সব কাজ মুলতুবি রেখে পরীক্ষার জন্য তৈরি হ'তে থাকে, মাষ্টারমশাইদের বাড়িতে যাওয়া-আসা শুরু ক'রে দেয়, বুনো ঘোড়া আস্তাবলের দানাপানির গুণে চোখে ঠুলি পরতে আর আপত্তি করে না। শ্রীপতিরও পরিবর্তন হ'লো এই সময়ে, কিন্তু ঠিক সে-ভাবে হ'লো না। একটি স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার বদলে যে-কোনো লক্ষ্যেরই প্রতি সন্দিগ্ধ হ'লো তার মন। সন্দেহ জাগলো নিজের বিষয়ে, অন্যদের বিষয়ে, জগতের বিষয়ে। 'আসলে,' বিছানায় পাশ ফিরে মনে-মনে বললো শ্রীপতি, 'সেই আমার অসুখের আরম্ভ।'

মাষ্টারমশাই জরুরি বিষয় পড়িয়ে চলেছেন, ছেলেরা অন্ধভাবে নোট নিচ্ছে, সে ব'সে-ব'সে ভাবছে ইনি পড়াচ্ছেন কেন? আর

আমরাই বা কেন পড়তে এসেছি? ঐ তো আমাদের জগদীশবাবু—কুড়ি বছর ধ'রে শেক্সপীয়র পড়াচ্ছেন—পঁচিশ বছর ধ'রে—বছরের পর বছর এই একই কথা আউড়ে-আউড়ে হাড়গোড়সুদ্ধু চিবিয়ে শেষ ক'রে দিচ্ছেন কবিতাকে—প্রেমিকাকে এত বেশি ভালোবেসেছেন যে তাকে কেটে-কুটে রান্না ক'রে পাড়ার লোক ডেকে পঙক্তিভোজে ব'সে গেছেন একেবারে। আর ঐ ছেলেমেয়েগুলো—তারা নোট নিচ্ছে, আর এর পর লাইব্রেরিতে গিয়ে উপুড় হ'য়ে পড়বে—কেন? ভালো চাকরি, ভালো বিয়ে, ইংলণ্ড ফ্রান্স আমেরিকায় যাওয়া, নিজের উন্নতি, দেশের উন্নতি। অত খাটছেন কেন আপনি? বি. এ. পাশ করবো, তাই। বি. এ. পাশ ক'রে কী হবে? কেম্ব্রিজে যাবো, এম. এ. পড়বো, প্রোফেসরি করবো। তারপর? চাকরি, বিয়ে। তারপর? ছেলেপুলে, তাদের মানুষ ক'রে তোলা। এবার তো মেয়ের বিয়ে দিলেন, ছেলে বড়ো হ'লো, এর পর? বাড়ি আরম্ভ করেছি যোধপুর পার্কে, বুড়ো বয়সে মাথা গোঁজার জায়গা চাই তো একটা। বাড়ি কদ্দুর? হ'য়ে গেছে, কিন্তু এবার ভাবছি তেতলাটাও তুলে ফেলি।··· এমনি একের পরে আর, শেষ নেই; পর-পর যে-সব লক্ষ্য দেখা দেয় মানুষের সামনে, সুকুমার রায়ের আশ্চর্য খুড়োর কলের মতো যা অনবরত ছুটিয়ে বেড়ায় আমাদের—কী তুচ্ছ সেগুলো, কী ময়লা, চিটচিটে, সাধারণ! আমরা কেউ শেক্সপীয়র পড়াচ্ছি, কেউ বিচার করছি মহাত্মা গান্ধীর ছবির তলায় ব'সে, কেউ বা তুবড়ির মতো এডিটরিয়াল লিখে এক দিনের, এক ঘণ্টার, এক মিনিটের উত্তেজনার সৃষ্টি করছি—মহৎ কাজ, দেশের মধ্যে গণ্যমান্য আমরাই—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই কেন পুরোনো তামার পয়সার মতো চিটচিটে ময়লা হ'য়ে যায়? মজা লাগে ভাবতে, যে চোরেরও বৌ আছে, যাকে গয়না দিয়ে খুশি করার জন্য চুরি করতে বেরোয় সে; গুণ্ডারও আছে রক্ষিতা, যাকে নিজের কাছে ধ'রে রাখার চেষ্টায় সে পঞ্চাশ টাকার জন্যে কারো

মাথা ফাটিয়ে দেয়। যা সবচেয়ে তুচ্ছ তা-ই সবচেয়ে শক্তিমান; তারই টানে যে যার নির্দিষ্ট কাজ দৃষ্টিহীনভাবে ক'রে যাচ্ছে, প্রত্যেকে ভাবছে তার কাজটা প্রচণ্ড জরুরি; একবার কেউ ভেবে দেখছে না যে সে না-থাকলে জগতের কিছু এসে যায় না, কেউ না-থাকলে অন্য কারো কিছু এসে যায় না, যে মানুষ না-থাকলেও পৃথিবীটা থাকতে পারে, এবং পৃথিবী না-থাকলেও সৌরমণ্ডল, সৌরমণ্ডল না-থাকলেও মহাবিশ্ব;—আর যদি সারা জগৎটারই সৃষ্টি না-হ'তো তাহ'লেই বা ক্ষতি ছিলো কী।...কিন্তু ঈশ্বরই যদি প্রথম পাপ করলেন এই জগৎটাকে সৃষ্টি ক'রে, তাহ'লে বেচারা মানুষ আর পালাবার পথ পাবে কোথায়? তিনি তো থাকতে পারতেন আড়ালে, উপনিষদের ব্রহ্মের মতো, থাকতে পারতেন তাঁর শুদ্ধতায়, পরমত্বে, নিজের একত্বে ও একাকিত্বে মগ্ন হ'য়ে—কেন সেই পবিত্র শূন্যতা ভেঙে বেরিয়ে আসতে হ'লো তাঁকে, কেন ব্রহ্মাকেও দুই হ'তে হ'লো, প্রকাশিত হ'তে হ'লো লক্ষ-লক্ষ সাধারণের মধ্য দিয়ে?

আর সেখানেই, শ্রীপতি এখন স্পষ্ট বুঝতে পারলো, সেখানেই তার অসুখের আরম্ভ। পৃথিবীতে কিছু নেই যা করার যোগ্য, কোনো কাজ নেই যা নিষ্পাপ, স্বয়ং ঈশ্বর সৃষ্টি ক'রে আদিপাপ করেছেন। তাহ'লে...কেন?

ছেলেবেলায় নিজের মনে একটা খেলা ছিলো শ্রীপতির: সে ভাবতে চেষ্টা করতো সে নেই, কিন্তু কিছুতেই সেটাকে ধারণার মধ্যে আনতে পারতো না। আমি যদি নেই তাহ'লে কেমন ক'রে জানছি যে আমি নেই? আমি যে নেই তা জানার জন্যেও তো আমাকেই থাকতে হবে। তারপর ভাবতো: ধ'রে নেয়া যাক সব মানুষ ম'রে গেছে, জীবজন্তুরাও লুপ্ত, গাছপালা ধোঁয়া হ'য়ে মিলিয়ে গেলো, জল মাটি আকাশ নিয়ে কুঁকড়ে পুড়ে দুমড়ে ভেঙে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেলো পৃথিবী। শূন্য, শুধু শূন্য। শূন্য? ঐ তো সৌরমণ্ডল, একটি গ্রহ খ'সে পড়ায় কী বা এমন ক্ষতি হয়েছে তার, শনির চক্র

তেমনি জ্বলজ্বল করছে, বৃহস্পতি তার চাঁদগুলোকে নিয়ে নিশ্চিন্ত—আর তারপর আরো কত বড়ো-বড়ো সৌরমণ্ডল, গ্রহ, নক্ষত্র, জ্যোতিষ্ক, ধূমকেতু, নীহারিকাপুঞ্জ, অনন্ত কাল ধ'রে হ'য়ে উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সব যদি একই সঙ্গে লুপ্ত হ'য়ে যায়? কিছুই আর থাকলো না, কিছুই না, কিছুই না,—না আলো, না অন্ধকার, না গরম, না ঠাণ্ডা, না গতি, না স্তব্ধতা;—কিছুই না! সব শূন্য, শুধু শূন্য, শুধু শূন্য। কিন্তু শূন্যও তো কিছু-একটা; সেই শূন্যকেও সরিয়ে দিয়ে তবে তো একেবারে কিছু-নাতে পৌঁছনো যাবে? কিন্তু, যত চেষ্টা করেছে, কোনোমতেই সেই অন্তিম ধাপে পৌঁছতে পারেনি, যত ভেঙে ফেলা যাক শেষ পর্যন্ত কোনো-এক নামহীন কিছু থেকেই গেছে, আর তাছাড়া, সব ধ্বংস হ'য়ে গেলেও আমি থাকছি, কেননা আমি না-থাকলে কে জানছে যে সব ধ্বংস হ'লো? এমনি ক'রে, নিজের অস্তিত্বের বোধ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টায় ক্লান্ত হ'য়ে গেছে শ্রীপতি—কিন্তু পারেনি, জগৎটাকে চুরমার ক'রে ফেলেও নিজেকে একচুল সরাতে পারেনি জগতের কেন্দ্র থেকে। আর সেই আমি—হঠাৎ বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে গেছে তার মনে—সেই অমর আমি একদিন থাকবে না।

একটা মোরগের ডাক কানে এলো শ্রীপতির। জানলার বাইরে এখনো অন্ধকার, কিন্তু ভোর হ'তে দেরি নেই। ও-সব বাজে কথা না-ভেবে উঠে বসি বরং, জানলা দিয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখি কেমন ক'রে আলো ফোটে অন্ধকারে। ঐ তো—আবার মোরগের ডাক। দিন, আবার দিন। যে-আলোয় ভয় কেটে যায়, সব জিনিশের বাস্তবতা ফিরে আসে, জগৎটাকে আবার সহনীয় ব'লে মনে হয়—সেই আলো! শ্রীপতি উঠলো বিছানা থেকে, কুঁজো থেকে গড়িয়ে জল খেলো, এগিয়ে গেলো জানলার ধারে ভোর দেখার জন্য, কিন্তু বড়ো ক্লান্ত লাগলো হঠাৎ, যেন নিজের ওপর বশ হারিয়ে ট'লে পড়লো বিছানায়, আর তক্ষুনি গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম ভেঙে চোখ মেলামাত্র বেশ ভালো লাগলো তার, যেন অসুখ সেরে গেছে। ঘড়িতে দেখলো সাড়ে-ন'টা। দাড়ি কামালো, স্নান ক'রে, পরিষ্কার জামা-কাপড় প'রে চায়ের পট হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলো ; ফিরে এলো চা, টোস্ট, আর খবর-কাগজ নিয়ে। হালদার-কেবিনে ব'লে এলো তাকে যেন একটার মধ্যে ভাত, ডাল আর মাছের ঝোল পাঠিয়ে দেয়। তীব্র খিদে পেয়েছে, কাল কী খেয়েছিলো মনে করতে পারছে না। অনেকদিন ধ'রেই খাওয়াদাওয়ার কোনো নিয়ম নেই তার—সত্যি অন্যায় করেছে শরীর নিয়ে এত হেলাফেলা ক'রে, এখন থেকে সাবধান হ'তে হবে। চা-টোস্ট ভালো লাগলো মুখে, খবর-কাগজটা অনেকক্ষণ ধ'রে উল্টে-পাল্টে দেখলো : হঠাৎ ইচ্ছে হ'লো নিজে কিছু লেখে। বছরখানেক আগে একটা উপন্যাস আরম্ভ করেছিলো ; বেশি দূর এগোয়নি, কিন্তু ভুলেও যায়নি সেটাকে ; মাঝে-মাঝে, থেকে-থেকে মনে পড়ে, কখনো হয়তো মনে-মনে অনেকখানি লিখে ফ্যালে, কিন্তু কলম নিয়ে বসবে এমন সময়ই যেন হ'য়ে ওঠে না। আজ তার কৌতূহল হ'লো—কী লিখেছিলো, তা দেখার জন্য।

বাইরে রোদ্দুর তখন শাদা আর গরম, ট্রাফিক ফেনিয়ে উঠছে রাস্তায়। আরো নিবিড় হ'য়ে বসার জন্য শ্রীপতি জানলাটা প্রায় পুরো ভেজিয়ে দিলো, ফাঁক দিয়ে একটু যা আলো আসে তা-ই যথেষ্ট। অগোছালো তার দেরাজটা, তবে তাতে যা আছে তার বেশির ভাগই বেদরকারি ব'লে গোছাবার তেমন দরকারও হয় না। হাত ঢোকাতেই তার লেখার খাতাটা উঠে এলো, কিন্তু সেটা খুলতে গিয়ে থমকে গেলো শ্রীপতি। মনে পড়লো অন্য এক কথা—লুকোনো, কিন্তু ভোলা যায় না। স্তব্ধ হ'য়ে রইলো একটুক্ষণ, তারপর—যেন কোনো অবৈধ কাজ করতে যাচ্ছে, যেন আড়ি পেতে কোনো গোপন রহস্য দেখে নিচ্ছে, এমনিভাবে খাতা খুলে একখানা চিঠি বের করলো তা থেকে। বড়ো-বড়ো দ্রুত অক্ষরে লেখা একখানা বড়ো, শাদা

কাগজ—ওপরে কোনো ঠিকানা নেই, নিচে নেই স্বাক্ষর, শুধু মাস তিনেক আগেকার একটা তারিখ বসানো।

'কতদিন হ'য়ে গেলো তুমি আসো না, তাই এই চিঠি। জানি, এটা লিখে আরো বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছি নিজেকে, হয়তো এই চিঠি পড়ার পর তুমি আর একেবারেই আসবে না—তবু আমাকে লিখতেই হচ্ছে। তোমাকে আর দেখবো না তাতেও আমি রাজি আছি, কিন্তু আমাকে দূরে রেখে তুমি নিশ্চিন্ত থাকবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না। অন্তত এই চিঠি পড়ার পর তোমার মন অশান্ত হোক, দ্রুত হোক হৃৎপিণ্ড, তোমাকে কুরে-কুরে খাক তোমার বুদ্ধি আর বিবেক আর হৃদয়।

'ভুল বলেছি—নিশ্চিন্ত তুমি নেই, তুমি যে আর আসো না, তাতেই বুঝেছি তুমিও আজ অস্থির।—আরো জ্বলো, আরো অনেকদিন ধ'রে জ্বলো, করাতের ওঠা-নামার মতো হোক তোমার দিন আর রাত্রি।

'কিন্তু—কী হয়েছে? আমি কী-দোষ করেছি? আমি তোমাকে ভালোবাসি, এই অপরাধ? এত অসহ্য আমি তোমার কাছে? কিন্তু তুমিও কি ভালোবাসো না আমাকে—বলো, সত্যি ক'রে বলো, ভালোবাসো না? আমি ছাড়া আর কে আছে তোমার, আমাকে ছাড়া আর কিসে তোমার প্রয়োজন—আর সেই আমাকে তুমি ছেড়ে চ'লে যাচ্ছো, এত মূঢ় তুমি, আর এত তোমার দম্ভ!

'আমাকে ঘিরে অনেক-কিছু ঘ'টে যাচ্ছে, কিন্তু আমি যেন কিছুরই মধ্যে নেই। অমন ভালো মেয়ে বন্দনা—তাকে দুঃখ দিয়ে হঠাৎ আমারই জন্য খেপে গেছে তোমাদের গৌতম বর্ধন। গৌতম কি ভাবছে বন্দনা ভালো ব'লেই জোলো, আর আমার কিছুটা বদনাম আছে ব'লেই আমি এক আশ্চর্য সামগ্রী? না কি আসল কথাটা তা নয়? না কি আমিই আস্তে-আস্তে ওকে টেনে এনেছিলাম আমার দিকে—যাতে তোমার ঈর্ষা জেগে ওঠে, শুধু সেইজন্য?

'হাসির কথা—তা-ই না? যেন আমি সত্যি ভেবেছিলাম তুমি গৌতমকে কখনো ঈর্ষা করতে পারো, যেন তোমার আর আমার মধ্যে অন্য কেউ এসে দাঁড়াতে পারে কখনো! না, শ্রীপতি, না। আমি জানি কেউ নেই তোমার ঈর্ষার যোগ্য। তুমিও জানো আমি যেখানে একলা, সেখানে তুমি ছাড়া অন্য কেউ নেই।

'তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো—সেখানেই আমার আরম্ভ। তুমি আমাকে ভালোবাসলে—সেদিন থেকেই আমি আশ্চর্য। তাহ'লে কেন—কেন এই ভান, এই আড়াল, কেন তুমি নিজেকে অমন কষ্ট দিচ্ছো, আর সেইসঙ্গে আমাকেও?

'আমি মানি, এই কষ্টও বৃথা নয়, তাতে আমি আরো সুস্বাদু হ'য়ে উঠছি, আরো ভরপুর। আর তাই চাই তোমার সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে—যা-কিছু আমি হ'য়ে উঠছি, হ'তে পারি। তুমি এসো—আর দেরি কোরো না।'

আগে অনেকবার পড়েছে, চিঠিটা প্রায় তার মুখস্থ, তবু ক্ষুধিতভাবে প্রতিটি অক্ষর আরো একবার গ্রাস করলো শ্রীপতি। ইচ্ছে হ'লো কোথাও বেরিয়ে পড়ে—অন্য কোনো কাজে মন দেয়, এমন কোনো কাজ যা শুধু সাধারণ বুদ্ধি আর মনোযোগ দিয়ে করা যায়, যাতে হৃদয়ের কোনো অংশ নেই, আর সেজন্যই আমাদের প্রতিদিনের বাঁচাকে যা সহনীয় ক'রে তোলে, লুকিয়ে রাখে তার ভেতরকার সব ফাঁকি, সব শূন্যতা। মুহূর্তের জন্য তার ঈর্ষা হ'লো সেই সব অগুনতি কলকাতাবাসীকে, যারা এতক্ষণে লেজার বা ফাইল খুলে ব'সে গেছে আপিশে-আপিশে, আজকের পরে কালকের দিন কী-ভাবে কাটবে তা নিয়ে যাদের ভাবতে হয় না। মনে পড়লো তারও দু-একটা সাংসারিক সমস্যা আছে: তার দু-মাসের বাড়িভাড়া বাকি, হালদার-কেবিনের দেনা এবার শোধ করা উচিত, এদিকে শিবেশ্বরবাবু একটা ইংরেজি-বাংলা অভিধান ছাপাবার কথা ভাবছেন,

তার সাহায্য চান—কিন্তু সে-ই তেমন গরজ করছে না। এখনই যাই না কেন, শিবেশ্বরবাবুর সঙ্গে কথাটা ঠিক ক'রে আগাম কিছু টাকা নিয়ে আসি—হয়তো ডাক্তার দেখানোই উচিত আমার, এই খুশখুশে কাশিটা পুষে রাখার কোনো মানে হয় না। কিন্তু—থাক না, যাক না কয়েকটা দিন, এক্ষুনি অত ছুটোছুটি করার দরকার কী; একা, চুপচাপ, কিছু না-ক'রে সময় কাটিয়ে দেবার চাইতে ভালো আর কী হ'তে পারে?

চিঠিটা দেরাজে ঢুকিয়ে ঘরের অন্য জানলাটাও ভেজিয়ে দিলো শ্রীপতি, ঝাপসা আধো আলোয় ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো। আমাকে চ'লে যেতে হবে কোথাও, আমাকে পালাতে হবে। কাল এসেছিলো আরতি—এ-বাড়িতে এই প্রথম এলো সে—আমি সোজাসুজি তার দিকে তাকাইনি, তবু—তার ঐ তাকাবার ধরন, তারার মতো ঝকঝকে তার চোখ!

এই তো সেদিন—দিন-পনেরো আগে—দুর্গাদাস আমাকে ধ'রে নিয়ে গেলো রোববার সকালে কী-একটা ইটালিয়ান ফিল্ম দেখতে—পৌঁছতে দেরি হয়েছিলো আমাদের; চোখে অন্ধকার স'য়ে যাওয়ামাত্র দেখলাম ঠিক আমার পাশের চেয়ারে ব'সে আছে আরতি, আর আরতির পাশে গৌতম। গৌতম বললো, 'আরে! তোমরা এখানে!' 'বেশি খুশি হয়েছিস ব'লে মনে হচ্ছে না তো!' জবাব দিলো দুর্গাদাস। 'পরশু তোদের দেখলাম ওল্ড বালিগঞ্জ রোড ধ'রে হাঁটছিস সন্ধের পর। ভারি নির্জন রাস্তাটি।' দুর্গাদাসের এ-কথা শুনে অমায়িকভাবে হাসলো গৌতম, আর আরতির চোখ অন্ধকারে জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো। একটি কথা বললো না সে, একবারও শ্রীপতির দিকে চোখ ফেরালো না; কিন্তু সেই না-তাকানোটা যেন তাকাবার চেয়ে অনেক বেশি ভারি, আর তা বুঝতে পেরে শ্রীপতি স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে ছিলো যেন তাকে কেউ চেয়ারের সঙ্গে পেরেক দিয়ে এঁটে দিয়েছে।

প্রেম! এই কথাটাকে কোথায় নামিয়ে এনেছে আজকালকার ছেলেমেয়েরা। 'জানিস, সুব্রত খাশা এক প্রেমিকা জুটিয়েছে!' 'না, না, ওরা প্রেমিক-প্রেমিকা নয়, অপর্ণার আপন মামা হয় সুকিরণ।' 'বিজয়া তার প্রেমিক বদল করেছে বুধবার থেকে।' —এই ধরনের কথাবার্তা মুখে-মুখে লোফালুফি হচ্ছে অনবরত, হাতে-হাতে ময়লা হ'য়ে যাচ্ছে—টাকার মতো, চাকরির মতো, বৌয়ের মতো, ষাট বছরের পেনশন আর যোধপুর পার্কে বাড়ির মতো—আর কিছুদিন পরে কবিতায় আর থাকবে না ব্যাপারটা, জীবনেও থাকবে না, থাকবে শুধু জিভের ডগায় ঝাল-চাটনি আমসত্ত্ব হ'য়ে। কিন্তু, 'আজকালকার ছেলেমেয়ে' নামে একটা নির্বস্তুক ব্যাপারকে কেন দোষ দিচ্ছি—আমি তো তারাই, আর তারাই তো আমি। আর সেজন্যই তো এটা দরকার হ'লো যে অন্তত একজন প্রতিবাদ করুক, আর সেই একজন আমি. আমাকেই বেছে নিলাম।

পরীক্ষায় নিজে ভালো করতে পারেনি, কিন্তু বি. এ. পাশ করার পর থেকেই সে ট্যুশনির উঁচু ধাপে উঠে গিয়েছিলো—প্রায় প্রোফেসরদের সমান তার বাজার-দর। বেছে নেয় কাজ, সপ্তাহে তিন দিন দু-দিন যা-ই হোক, তার শর্তই মেনে নিতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। আরতিকে পড়াতে রাজি হয়েছিলো দুর্গাদাসের সুপারিশে; কথা ছিলো সপ্তাহে তিনদিন ক'রে যাবে, কিন্তু দ্বিতীয় মাস থেকেই পাঁচ দিন ক'রে যেতে শুরু করলো, তারপর এমন হ'লো যে রোববারও বাদ দেয় না। এই অনিয়মের জন্য কোনোরকম জবাবদিহি করলো না সে, এতটুকু সংকোচ ফুটলো না তার ব্যবহারে—যেন এই রকমই কথা ছিলো, এটা সম্পূর্ণ তার অধিকারভুক্ত, এমনিভাবে ইচ্ছেমতো যাওয়া-আসা করতে লাগলো। শুধু মাসান্তে যখন কেশববাবু তাকে খামে ভ'রে টাকা দিতে গেলেন, মৃদু হেসে বললো, 'এখন থাক।' টাকা নেয়া অসম্ভব হ'য়ে উঠলো তার পক্ষে, যদিও কেন নেবে না তার কারণ বলা আরো

অসম্ভব।—সবই কি ভুল করেছিলো? অন্যায় করেছিলো? তার মনের মধ্যে কী চলেছে এমনি নির্লজ্জের মতো তার বিজ্ঞাপন দিয়ে কি ভুল করেনি? হয়তো তা-ই, কিন্তু সে-সময়ে আর-কোনো উপায় ছিলো না তার।

'কী হচ্ছে আমার মধ্যে?' নিজেকে অনেকবার জিগেস করেছে শ্রীপতি, 'সেই গতানুগতিক "প্রেম"?' কথাটাতে মনে-মনে কোটেশন-মার্কা বসাতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভোলেনি সে, যদিও মনের আরো গভীর স্তরে সেই ঈষৎ ব্যঙ্গের ভঙ্গি অনেক আগেই মুছে গিয়েছিলো। নিজেকে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করেছিলো এই সময়ে—কেমন সে বদলে যাচ্ছে দিনে-দিনে, হ'য়ে উঠছে স্বার্থপর, কূট—যে-বন্ধুরা তাকে এত ভালোবাসে তাদেরই সে এড়াতে চায় আজকাল, তার অস্তিত্বের সবটুকু অর্থ যেন লুকিয়ে আছে শুধু একজন মানুষের মধ্যে, যেন খুঁজে পেয়েছে অন্য এক জীবন, যার জন্য সে অপেক্ষা করছিলো এতদিন—খোলামেলা, অন্যদের সঙ্গে ভাগ-ক'রে-নেয়া জীবন নয়—গোপন, নেপথ্যচারী, ক্ষমতাশালী—যেন এক অনন্ত যৌবন গর্জন করছে তার হৃৎপিণ্ডে, অথচ তা অন্য কেউ শুনতে পায় না।

মানতেই হবে যে সব সত্ত্বেও তার 'কাজে' সে ত্রুটি ঘটতে দেয়নি, যদি না অত্যন্ত বেশি উৎসাহ আর অধ্যবসায়কেই ত্রুটি ব'লে গণ্য করা হয়। যা পড়াবার কথা তার দশগুণ পড়িয়েছে—তার মানে, পাঠ্যপুস্তকের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেনি; সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি—যে-কোনো বিষয় অবলম্বন ক'রে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ছাত্রীকে, ওগুলো পরীক্ষা পাশের পক্ষে বাহুল্য হ'লেও জীবনের পক্ষে বেদরকারি নয়। মনের মধ্যে এটা টগবগে বাঘকে পোষ মানিয়ে রেখে সে যে অমন স্বচ্ছন্দে বক্তৃতা ক'রে যেতে পারছে, তাতে একটা অদ্ভুত আনন্দ হ'তো তার, না কি ঐ বক্তৃতাগুলো

তার মনের বাঘ-সিঙ্গিদেরই পাইচারি তা কে বলবে। আরতি সব কথা বুঝতো কিনা তা অবশ্য জানে না সে, শুনতো কিনা তাও জানে না, কিন্তু ক্লান্তির বা বিরক্তির কোনো লক্ষণ দেখা যেতো না তার মধ্যে, বরং মনোযোগের চাপে মুখটি যেন ফ্যাকাশে দেখাতো মাঝে-মাঝে। এমনি ক'রে মাসগুলো কেটে গেলো, আর তারপরেই সেই দিন এলো যখন আরতির পরীক্ষা কবে শেষ হ'য়ে গেছে, অথচ শ্রীপতি আগের মতোই আসে যায়, আর রোজ তার যাবার সময় আরতি বলে, 'কাল আসবেন? আসবেন তো? কখন আসবেন? বিকেলে, সকালে, তুপুরে?' আর তারপরে তাও আর বলে না, শুধু চোখে-চোখে তাকায়।

হঠাৎ যেন রূঢ় আঘাতে জেগে উঠলো শ্রীপতি। এতদিন শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলো, নিজেরই মধ্যে মগ্ন ছিলো—এখন বুঝলো এর মধ্যে আর-একজন মানুষও জড়িয়ে গেছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তুলে উঠেছে আর-একজনেরও হৃৎপিণ্ড। দেখলো, সে বাধ্য এখন, 'না' বলার উপায় নেই তার, তার দিকে অবিচলভাবে তাকিয়ে আছে অন্য একজন, তার ওপর নির্ভর ক'রে আছে। উপায় নেই। কিন্তু নেই কেন? সে ইচ্ছে করলেই উপায় আছে। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড়ো কথা তার ইচ্ছে। আমার ইচ্ছে—আর আসবো না। আমার ইচ্ছে—ছেড়ে দেবো। আমার ইচ্ছে—কষ্ট পাবো, কষ্ট দেবো। সত্যি একদিন যাওয়া-আসা বন্ধ ক'রে দিলো।

৭

অবশ্য ছেড়ে দিতে সময় লাগলো একটু। কেননা সে যদি আরতির কাছে না যায়, তাই ব'লে কলকাতার বাস্-চলাচল বন্ধ থাকবে তা তো নয়। দুর্গাদাসদের সঙ্গে দল বেঁধে আরতি চ'লে এসেছে এক-একদিন—তখন জনক রোডে থাকতো সে—তাকে বাড়ি না-পেয়ে বন্দনার ওখানে অপেক্ষা করেছে; এক-একদিন রাত দশটায় বাড়ি ফিরে দেখেছে আরতি ব'সে আছে তার ঘরে। 'তুমি? এত রাত্রে?' 'কেন, আসতে নেই?' 'একা এসেছো?' 'সব সময় সঙ্গী পাবো কোথায়, আর সঙ্গী দিয়ে হবেই বা কী।' 'চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।' 'আমি এখন বাড়ি যাবো না।' 'রাত হ'য়ে যাচ্ছে।' 'হোক। আমার কথা আছে তোমার সঙ্গে।' এর পর শ্রীপতি আরম্ভ করেছে কথা বলতে—খুব সহজভাবে, প্রায় নিবিড়ভাবে; এক সময়ে আরতিকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়, তাকে বাস্-এ তুলে দিয়েছে। মাঝে-মাঝে সেও গেছে আরতির বাড়িতে, বেশিক্ষণ থাকেনি, আরতিকে বুঝতে দেয়নি তার অভিসন্ধি, শুধু আস্তে-আস্তে বাড়িয়ে চলেছে দেখাশোনার ব্যবধান। তারপর একদিন আরতির ঐ চিঠি এলো, আর তারপর তার বাড়ি যাওয়া একেবারে বন্ধ ক'রে দিলো শ্রীপতি।

আরতি, আমি কি কোনোদিন তোমাকে বোঝাতে পারবো, যা করেছি তা কেন করেছি? খুব সহজ কথাটা, অথচ ভারি শক্ত—কোন কথাগুলো এর পক্ষে ঠিক হবে বুঝতে পারছি না। তোমার ঐ চিঠি—তার উত্তরটা এত স্পষ্ট যে তা কাগজে

লেখারও দরকার নেই; এর পরের ধাপটা এত প্রাঞ্জল যে-কেউ তা ব'লে দিতে পারে, বলতে গেলে সেটাই নিয়ম। স্পষ্ট, তা আমিও মানি; প্রাঞ্জল, তা আমিও মানি; হ'তে পারে সেটাই ঠিক, সেটাই ভালো, সেটাই সুখের; কিন্তু নিয়ম তা হ'তে পারে না। নিয়ম আছে জড়ের জগতে, জন্তুর জগতেও আছে বলা যায়; কিন্তু মানুষ তো স্বাধীন, সে তো যোগ-বিয়োগের সংখ্যা নয় যে তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে অমোঘভাবে একই ফলে পৌঁছনো যাবে; হাজার বার, লক্ষ বার, একই ফল বেরোলেও তার পরের বারে কী হবে কেউ বলতে পারে না। মানুষমাত্রেই খাদ্য খোঁজে এটা নিয়ম, কিন্তু এমন মানুষও আছে যারা স্বেচ্ছায় না-খেয়ে থাকে; মানুষমাত্রেই বাঁচতে চায়, কিন্তু ভেবে দ্যাখো কত মানুষ ঘাতকের হাতে তুলে দিয়েছে নিজেকে। বেশি আর কথা কী—অত বড়ো একটা ভয়ংকর নিয়ম যে মৃত্যু, মানুষ তাকেও ভেদ ক'রে অমরতাকে সৃষ্টি ক'রে নিতে সচেষ্ট—এমনি দুর্দান্তরকম স্বাধীন সে। আর সেইজন্যেই জন্তু আর জড়ের প্রতি তার ঈর্ষা অফুরান; তাদের নকল ক'রে সেও তৈরি ক'রে চলে নিয়মের পর নিয়ম, আইনের পর আইন, অনুশাসনের পর অনুশাসন;—ভান করে যে জীবন ব্যাপারটাকেও কতগুলো ছিমছাম ফর্মুলায় তর্জমা ক'রে নেয়া যায়, যে উইপোকা বা ইলেকট্রিসিটির মতো মানুষের 'ব্যবহার'ও কোন অবস্থায় কী-রকম হবে তা পাঠ্যকেতাবে লিখে রাখা সম্ভব, যে 'উচিত', 'অনুচিত', 'ন্যায়', 'অন্যায়' এ-রকম আখ্যাধারী কতগুলো খুঁটিতে বাঁধা হ'য়েই মানুষ নামক গোরুগুলো অনন্তকাল ধ'রে সুখে জাবর কাটবে। মাঝে-মাঝে—ধরো, একশো কি দুশো বছরে একবার—হিশেবে কোনো ভুল ধরা পড়ে; তখন পুরোনো গোয়ালে আগুন ধরিয়ে তকতকে একটি নতুন গোয়াল তৈরি করতে লেগে যায় সবাই, খুঁটিগুলোকে সোনায় বাঁধিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে এবার সত্যি স্বর্ণযুগ এলো। আর ও-রকম না-ক'রে উপায়ই বা কী মানুষের, তার

আত্মরক্ষার জন্যেই ওগুলো দরকারি; সারা জগতে একমাত্র তারই স্বাধীনতা আছে ব'লে সে সুখের আশায় স্বাধীনতাকে বন্ধক রেখে দেয়।

অথচ, আরতি, অথচ মানুষ অঙ্ক হ'য়ে যেতে পারছে না, যন্ত্র হ'য়ে যেতে পারছে না, ইঁদুর কিংবা ইলেকট্রিসিটি হ'য়ে যেতে পারছে না—মানুষই থেকে যাচ্ছে। মানুষ এই অর্থে যে তারই মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে অনিয়ম, ব্যতিক্রম, অনাচার। 'আমার ইচ্ছে আমি সুখে থাকবো না,' 'আমার ইচ্ছে নয় আপনারা আমার উপকার করেন—' গোয়াল-ঘরগুলো যতই বড়ো হোক না, যতই পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সব রকম বীজাণু থেকে মুক্ত, এই কথাগুলো কেউ-না-কেউ বলবেই, হয়তো খুব নিচু গলায় ফিশফিশ ক'রে, মনে-মনে, কিন্তু কোনোরকম আইন বা পরিকল্পনা বা শ্লোগানের শক্তি ভাবনাটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না—এ-ই হচ্ছে চিরন্তন কৌতুক। মানুষ সেই প্রাণী যে বাধ্য হ'তে ভালোবাসে না, নিজের ইচ্ছেটাকে কাজে খাটাতে চায়। তাকে জোর ক'রে দুঃখে ফেলে দাও, সে সুখের আশায় হত্যা করবে তোমাকে; তাকে নিয়ম ক'রে সুখে রাখো, সে দু-দিনেই আবার বিরাট চ্যাঁচামেচি শুরু ক'রে দেবে দুঃখের জন্য।

ইচ্ছে—তার মতো একটা আশ্চর্য ব্যাপার আর কী আছে? আমার ইচ্ছে আমাকে যে-পথে চালিয়ে নিচ্ছে, আমার ইচ্ছে নয় আমি সে-পথে যাই। আমি চাই ভালো চাকরি, শারীরিক আরাম, সামাজিক মর্যাদা—কিন্তু সেই চাওয়াটাকে নাকচ ক'রে দিতেও পারি আমি। চাই…হয়তো চাই…হয়তো উন্মাদভাবে কিছু-একটা চাই—কিন্তু শেষ মুহূর্তে স'রে যাওয়াটাই হয়তো সত্যিকার স্বাধীন কাজ। যেখানে আমার ইচ্ছে সেখানে আমি বাধ্য, কিন্তু নিজের গরজে এগিয়ে গিয়ে যদি বঞ্চনাকে মেনে নিই তাহ'লেই আমি সবচেয়ে বেশি 'আমি' হ'তে পারি।…আর সেইজন্যেই, আরতি, সেইজন্যেই।

বেলা বাড়লো, গরমও বেড়ে উঠলো সঙ্গে-সঙ্গে। রোদের গরম, না কি জ্বর এলো আবার? নিজের কপালে হাত রেখে অনুভব করার চেষ্টা করলো শ্রীপতি, কিন্তু তার হাতের পাতাও তপ্ত—কী ক'রে বুঝবে। চোখ জ্বালা করছে, জিভ তেতো, মাথার ভেতরটা ঝাপসা হ'য়ে আসছে ক্রমশ। আরতিকে এতক্ষণ ধ'রে মনে-মনে যা বললো সত্যি কি তার কোনো মানে হয়? আসল কথাটা কি এই নয় যে সে ভিতু আর কপট আর কাপুরুষ;—নিজেকে নিজে ধাপ্পা দেবার জন্য পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে শুধু কথা বুনছে? অদ্ভুত এক ত্রাস—পাছে সে সুখী হয়, পাছে আর-একজনও সুখী হ'য়ে যায় তার সঙ্গে—আরতি ঠিক লিখেছে—দম্ভ ছাড়া একে আর কী বলে! কিন্তু··· সুখ? কথাটা মনে হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঠোঁট কুঁচকে গেলো তার, মনে পড়লো তার এক ছাত্রের বাবাকে, যিনি নিজেকে সগৌরবে জগতের 'শ্রেষ্ঠ সুখী' ব'লে ঘোষণা করতেন। 'আমি ইন্দ্রের চেয়েও সুখী, কেননা ইন্দ্র কখনো মোটরগাড়ি চড়েননি—'এই আশ্চর্য যুক্তি তিনি একদিন উপস্থিত করেছিলেন শ্রীপতির সামনে। তিনি যে ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বর, এদিকে সাহিত্য-বাসরের প্রেসিডেন্ট, জ্ঞানী গুণী ধনীর মধ্যে যে কেউ নেই তাঁর মার্বেল-মেঝের ড্রয়িংরুমে এসে না বসেছেন, ইচ্ছে করলেই কলকাতার যে-কোনো নামজাদা গাইয়েকে দিয়ে তিনি 'চুটিয়ে' গান গাওয়াতে পারেন তাঁর বাড়িতে, তাঁর মেয়ের বিয়েতে গাড়ির লাইন যে লেডি চ্যাটার্জির নাৎনির বিয়ের গাড়ির লাইনের চেয়ে অল্প একটু মাত্র ছোটো হয়েছিলো—এই সবই, মাত্র দশ মিনিট সময়ের মধ্যে, একদিন তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন ঐ সুশ্রী, নধর, মেদবান ভদ্রলোকটি।··· কিন্তু ও ছাড়া আর-কোনো সুখ কি নেই জগতে?

হালদার-কেবিন থেকে খাবার নিয়ে এলো, দেখে কেমন বমি পেলো তার, হাত নেড়ে ফিরিয়ে দিলো। বিশ্রী—নিশ্চয়ই জ্বর বাড়ছে—অসুখটা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে ব'লে আপত্তি করি না, কিন্তু অপমান করছে ব'লে প্রতিবাদ করি। আবার শুয়ে পড়লো সে বিছানায়,

টেবল-ফ্যানের একঘেয়ে গুনগুন শব্দে তন্দ্রা এলো তার। চোখ বুজে দেখলো এক চঞ্চল নানা-রঙের অন্ধকার—লাল, হলদে, বেগনি, ঘুরছে যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ তার মগজের মধ্যে, তারপর আস্তে-আস্তে একটি পথ খুলে গেলো তার দৃষ্টির সামনে। চওড়া রাস্তা, দু-দিকে বড়ো-বড়ো ঝাউ ডালে-ডালে স্পর্শ ক'রে ঝিকিমিকি সোনালি রোদ্দুর বিছিয়ে দিয়েছে। রাস্তার শেষে একটি আশিতলা বাড়ি—ঋজু, ক্ষীণ, নির্মল একটি প্রার্থনার মতো আকাশের দিকে যেন উঠে গেছে। হীরের মতো ঝকঝক করছে হাজার-হাজার জানলার কাচ, আর সেই সব কাচের পেছনে মানুষের মুখ—যুবা, নারী, শিশু—সুখী, সুন্দর, সুস্থ, আনন্দিত। বাড়িটা যদিও স্কাইস্ক্রেপার, শীতের দেশ নয় সেটা, হয়তো দক্ষিণ আমেরিকা বা ফ্লরিডা বা হনলুলু, হয়তো বুয়েনস এয়ারিস শহর। সময়টা বিকেল, চারদিকে আলো, নীলিমা, স্নিগ্ধতা, শান্তি।

মস্ত বড়ো লিফট তাকে নিঃশব্দে নিয়ে এলো পঁচাত্তর তলায়। দরজা ঠেলে ঢুকলো; একটি চেয়ারে বসলো, যা উৎসুক স্ত্রীর মতো, তাকে আদর ক'রে আবার একটু বাধাও দেয়। সামনে একটা দরজা অর্ধেক খোলা, ভেতরে বাথরুমের অংশ দেখা যাচ্ছে। সারা ঘরে কিছু নেই—মেঝে, দেয়াল, মেঝের কার্পেট, দরজায় পেতলের হাতল, আসবাবপত্র, বাথরুমে এনামেল-করা সরঞ্জাম—কিছু নেই যা উজ্জ্বল নয়, সংবৃত নয়, নয় উচ্ছ্বাসহীন, অসূয়াহীন অতিথিপরায়ণ হৃদয়ের মতো সুন্দর। দেয়ালের কোণে দুটো জানলা যেখানে মিলেছে, সেই খোপে বাদাম-রঙের লেখার টেবিলটি বসানো—তার স্পর্শ কতো মসৃণ তা দৃষ্টি দিয়েই অনুভব করা যায়—অন্য দিকে দরজার মতো বড়ো আর-একটি জানলার একটিমাত্র কাচের পাল্লা পড়ন্ত রোদে নিস্তাপ কোনো আগুনের মতো জ্বলছে। বাইরে ছড়িয়ে আছে উঁচু-নিচু শহর, ছোটো-বড়ো স্কাইস্ক্রেপারের চুড়ো, ঐ দিকে, ঢালু পাহাড়ের গায়ে-গায়ে, সারি-সারি লাল, মাছরাঙা নীল

আর বেগনি রঙের টালির ছাদ, ধবধবে শাদা বাংলো, মাঝে-মাঝে গুচ্ছ-গুচ্ছ লাল নীল বেগনি হলুদ ফুল। পাহাড়টির পায়ের কাছে প'ড়ে আছে আধো-চাঁদের আকার নিয়ে নীল সমুদ্র, তার বুকের ঠাণ্ডা তুলে নিয়ে ঝিরিঝিরি হাওয়া ব'য়ে যাচ্ছে। মস্ত শহর, কিন্তু ধুলো নেই, কোলাহল নেই; যন্ত্রে যানে যেটুকু বা শব্দ হয় বা ধুলো ওড়ে, এত উঁচুতে তার কিছুই পৌঁছয় না। ঐ মুক্ত নীলিমা, যেখানে টুকরো শাদা ফোলা-ফোলা মেঘ এইমাত্র রঙিন হ'য়ে উঠছে, তা এই শহরকে যতটা আলো দিচ্ছে, ততটাই ফিরে পাচ্ছে তার কাছ থেকে; যে-প্রেরণা প্রতি মুহূর্তে মাটির দিকে পাঠাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে খুশি হ'য়ে উঠছে তারই প্রতিফলনে। এই ঘর—এই ঘরই যেন আকাশ; ইচ্ছে হ'লেই পর্দা টেনে দিয়ে নিজের মধ্যে নিবিড় হ'তে পারে সে, কিন্তু তখনও ভুলবে না যে দূর তার ঘরের মধ্যে লুকোনো, যে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেই দিগন্তকে সে হাতের মুঠোয় ধরতে পারে।

চেয়ারের মুখোমুখি খাট, গভীর বিছানা, রুপোলি আর ধূসর সিল্কে কাজ-করা সুজনিতে ঢাকা, একজনের ভার বহন ক'রে গভীরভাবে পরিতৃপ্ত। কে সে? এক নারী, মাজা কাঁসার মতো দেহ তার, স্নিগ্ধ আর সুগোল তার বাহু, একটি জঙ্ঘা থেকে শাড়ি স'রে গিয়ে বিছানাটিকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছে। বালিশের লাল মখমলের ওপর কালো চুল বৃষ্টির মতো ছিটোনো, তার ফাঁকে ঝিলিক দিচ্ছে গ্রীবা, গালের আভা উঁচু হ'য়ে ফুটে আছে। আড় হ'য়ে শুয়ে আছে একটি উষ্ণ, সোনালি, নিশ্বসিত শরীর, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে, স্তব্ধ হ'য়ে, এক তীব্র অথচ উদাসীন প্রত্যাশায় যেন। বাইরে ঐ নগর, ঐ আকাশ আর সমুদ্র, আলো আর স্বচ্ছতা—ঐ সমস্ত কিছুর অংশ যেন এই শরীর, সে না-থাকলে সবই হঠাৎ মিলিয়ে যেতে পারে, অথচ ঐ গভীর সুখ আর শান্তির মধ্যে সে-ই যেন একমাত্র অশান্তির বীজ, ঘরের এই শৃঙ্খলাকে ভেঙে দেবার জন্যই অত

কোমল হ'য়ে ওঠাপড়া করছে তার নিশ্বাস। 'কে তুমি?' শ্রীপতি মনে-মনে বললো, 'মুখ ফেরাও, আমি তোমাকে দেখবো। তোমার মুখ আমি দেখতে চাই, তুমি ফিরে তাকাও।' এর উত্তরে ঐ সুন্দর সোনালি শরীরটির ওপর দিয়ে বাসনার একটি সূক্ষ্ম ঢেউ ব'য়ে গেলো, বিদ্যুতের মতো ফুলকি জ্ব'লে উঠলো চুলের পুঞ্জে। 'সন্ধে হ'য়ে এলো, একটু পরেই শহরের লোকেরা সমুদ্রের ধারে জড়ো হবে, খাদ্যে মদে ফুলে ফলে টেবিলগুলো জ্বলজ্বল করবে, বেজে উঠবে বাঁশি আর বেহালা, নাচ হবে, শিশু, বৃদ্ধ, নারী, যুবা কেউ বাকি থাকবে না, চলো তুমি আর আমিও যাই সেখানে। যেখানে সকলেই খুশি, সকলেই সকলকে ভালোবাসছে, সেখানে আমাদের ভালোবাসা কি আরো সুন্দর, আরো সার্থক হবে না?' স্তব্ধ ঘর, স্তব্ধ বিছানা, শুধু উন্মোচিত জঙ্ঘার ওপর একটি নীল শিরা চোখের মতো তাকিয়ে আছে। 'তবে কি চাও এখানেই, এই নির্জন ঘরে, সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা ভালোবাসবো? তবে কি চাও আমি উঠে গিয়ে তোমাকে আমার দিকে ফিরিয়ে দেবো, নিচু হ'য়ে মুখ দেখবো তোমার, খুঁজে নেবো লক্ষ-লক্ষ নামের মধ্যে তোমার নাম, চুমো খেয়ে-খেয়ে সৃষ্টি ক'রে নেবো তোমার মুখ? তবে কি তোমার এখন কোনো মুখ নেই, কোনো নাম নেই? তুমি কি শুধু শরীর, উষ্ণ, নিশ্বসিত, সোনালি একটি শরীর শুধু?…'

হঠাৎ সব কালো হ'য়ে গেলো শ্রীপতির চোখের সামনে, চমকে জেগে উঠলো সে। এই ছবিটা কোথায় পেয়েছিলো? হয়তো কোনো ছবিওলা বিদেশী পত্রিকার বিজ্ঞাপনে, হয়তো কোনো টেকনিকলার সিনেমায়। কিন্তু যেখানেই কুড়িয়ে পেয়ে থাক, এই ছবিটা বারে-বারে তাকে হানা দেয়—ঐ সুন্দর দেশ, আলো আর নীলিমায় মাখা পাঁচাত্তর তলার ঘর। কিন্তু সেখানেও ঐ নারী কেন? ঐ একটি কারণে বারে-বারে তার স্বপ্ন ভেঙে যায়, বেশি দূর এগোতে পারে না কল্পনা, যেন আস্তে-আস্তে ভারি হ'য়ে সে নেমে আসে মাটিতে,

এই কলকাতায়, যেখানে একটি গলি, একটি বাড়ি, একটি মেয়ে অনবরত তাকে কাছে টানতে চায়।

আমি কি স্বপ্নেও তোমাকে ছাড়াতে পারবো না কোনোদিন?

'কী বলছিস ?··· এই, শ্রীপতি! বেদম জ্বর হয়েছে দেখছি।'

বড়ো ক'রে চোখ মেলে দুর্গাদাসকে দেখতে পেয়েছিলো। কতক্ষণ ছিলো দুর্গাদাস, কী কথা হয়েছিলো তার সঙ্গে, তা ঠিকমতো উপলব্ধি করার আগেই আবার আচ্ছন্ন হ'লো তন্দ্রায়। সময়ের বোধ তখন ছিলো না শ্রীপতির; সকাল, দুপুর, বিকেল, সবই যেন এক, কিংবা কোনোটাই নেই।

আর হঠাৎ সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো যে তার অসুখ আর সারবার নয়, সে মরতে চলেছে।

জ্বরের মধ্যে এই ধারণাটিকে সে মগজের মধ্যে গেঁথে ফেললো, যেমন ক'রে ক্লান্ত সাঁতারু সমুদ্রে ডুবে যেতে-যেতেও জলের ওপর মাথা তুলে দিয়ে শেষবার দিনের আলো দেখে নেয়। কয়েক বছর আগেকার একটা স্মৃতি তার মনে জেগে উঠলো। শস্তা বাসার খোঁজে গড়িয়ার দিকে গিয়েছিলো, ফিরছিলো পাঁচ নম্বর বাস্-এ, যার রাস্তার দু-পাশে তখনও ছড়িয়ে ছিলো ধানখেত বনজঙ্গল—লোকেরা যাকে প্রকৃতি বলে, তা-ই। ভরা বর্ষা তখন, কালো আর ভারি মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিলো না। কালো আর ভারি আর স্নিগ্ধ আকাশ, বাতাস ভিজে, বাস্-এ তখনও যাত্রীর ভিড় হয়নি—বাইরে তাকিয়ে-তাকিয়ে অবাক হচ্ছিলো শ্রীপতি। বৃষ্টি পেয়ে গাছপালা যেন জাদুমন্ত্রে বাড়ন্ত; বাস্ যদি আধ মিনিট দাঁড়ায়, মনে হয় যে ওরই মধ্যে আরো একটু লম্বা হ'য়ে উঠবে ঝোপঝাড়, চোখে দেখা যাবে ঘাস আরো ঘন হ'লো। ঘাস নধর, গাছের পাতাগুলো চিকচিকে, কচি ধানগুলোকে দুলিয়ে দিচ্ছে হাওয়া, মাঝে-মাঝে পুষ্ট ব্যাং লাফিয়ে পড়ছে জলের মধ্যে, একবার একটা মস্ত মোটা হেলে সাপ এঁকে-বেঁকে রাস্তা পার হ'য়ে

চ'লে গেলো। কত ছোটো-ছোটো পোকা ঐ ঘাসের মধ্যে, জলে জোঁক, মাটিতে কেঁচো আর কেন্নো, প্রতিটি গাছ যেন পঞ্চাশ হাতে নিশেন তুলে দাঁড়িয়ে আছে—এই বর্ষার দিনে একেবারে ফুর্তির ধুম প'ড়ে গেছে ওদের মধ্যে—মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত নিঃশব্দ ও সমবেত সংগীত উঠছে: 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'। তা-ই মনে হয়েছিলো শ্রীপতির, ওরা সবাই নিমন্ত্রিত ও মাননীয়, ঐ জলের ধারে-ধারে গজিয়ে-ওঠা সতেজ শাকপাতা, লাল কেন্নো, ঠাণ্ডা সাপ, ধানের খেতে এক পায়ে দাঁড়িয়ে-থাকা ধবধবে বক—সকলেই আজ উৎসবে উতরোল, বাইরে প'ড়ে আছে শুধু এই বাস্-এর কয়েকটি মানুষ—কেউ তারা বৃদ্ধ ও কদাকার, কেউ মাসিক-পত্রে অভিনেত্রীদের ছবি দেখছে, কেউ এই সকালবেলাতেই ক্লান্ত, কারো দাড়ি-না-কামানো মুখ দুশ্চিন্তায় কুটিল। যাদবপুরে এসে ভিড় হ'লো বাস্-এ, বাঁশঝাড় ধানের খেত মিলিয়ে গেলো, আর হঠাৎ ঠিক সামনে দেখা গেলো নোংরা চেহারার একটা খোলা ভ্যান, মস্ত বড়ো আর অদ্ভুত একটা জিনিশ তাতে তোলা হয়েছে। শ্রীপতি প্রথমে ভেবেছিলো একটা বড়ো বটগাছের গুঁড়ি, কিন্তু আর-একবার তাকিয়েই বুঝতে পারলো যে ওটা একটা ষাঁড়ের মৃতদেহ। বিরাট জন্তু, ম'রে গিয়ে আরো যেন বিরাট দেখাচ্ছে, চারটে পা উঁচু ক'রে একত্রে বাঁধা, মাথাটা ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে, পেট ফোলা, গায়ের চামড়া কর্কশ ও কুৎসিত, তার পরাক্রান্ত পুরুষাঙ্গ পোকার মতো ছোটো হ'য়ে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে এই সবই লক্ষ করেছিলো শ্রীপতি—অশ্লীল ভঙ্গিতে ঝুলিয়ে-রাখা ঐ অক্ষম ও কদর্য মাংসপিণ্ড, যা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ম্যুনিসিপ্যালিটির ভাগাড়ের দিকে, হয়তো শকুনের খাদ্য হবার জন্য। ভ্যান চলেছে বাস্-এর ঠিক আগে-আগে, রাস্তা সরু ব'লে বাস্টা এগিয়ে যেতে পারছে না; ঐ অদ্ভুত বোঝা যাত্রীদের মধ্যে অনেকেরই চোখে পড়ছে, শোনা যাচ্ছে নানা রকম মন্তব্য—'কী বিশ্রী!' 'জঘন্য!' 'একটা কাণ্ডজ্ঞান

নেই? দরজাটা বন্ধ ক'রেও তো দিতে পারে।'—সুসজ্জিত একটি মহিলা নাকে রুমাল চাপা দিয়ে দৃঢ় চিত্তে অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন। তারপর রাস্তা একটু ফাঁকা পেয়ে বাস্ দ্রুত এগিয়ে গেলো, কাছে এলো কলকাতার শহর, মরা ষাঁড় গোলেমালে হারিয়ে গেলো।

মৃত্যুর কোনো মাত্রাভেদ নেই; ঐ ষাঁড় যতখানি মরেছিলো মানুষকে ঠিক ততটাই মরতে হয়; তার মৃতদেহকে আরো একটু আড়ম্বর ক'রে নিয়ে যাওয়া হয় ব'লে মৃত্যুর তথ্যে কোনো তফাৎ হয় না। কম মৃত কি বেশি মৃত ব'লে কোনো কথা নেই; মুমূর্ষু ও মৃতের মধ্যে যতটা দূরত্ব, মৃত ও পূর্ণ স্বাস্থ্যবানের মধ্যেও তা-ই; প্রাণের ক্ষীণতম স্ফুলিঙ্গটুকু যার মধ্যে জ্বলছে সেও বলতে পারে, 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।' কী করুণ দেখাচ্ছিলো ঐ মৃত ষাঁড়ের মুখটি, যেন বলতে চাচ্ছে, 'শেষটায় আমাকে এই করলে!' সে জানতো না সে মরবে, তাই নিজের মৃত্যুকে উপলব্ধি করতে পারছে না যেন, চাপা-পড়া কুকুরদের মুখেও ঐ রকম ভাব লক্ষ করেছে শ্রীপতি। জীবিত পশুর মুখে কোনো ভাব নেই, মৃত্যুর মুহূর্তটি প্রথম তাকে দুঃখী হ'তে শেখায়—অন্তত বাইরে থেকে দেখে তা-ই মনে হয়। কিন্তু মানুষ প্রতি মুহূর্তে জানে সে মরবে, তাই জীবন ভ'রে তার মুখে অত রকমের বিচিত্র ভাব খেলা করে, আর ম'রে গেলেই সব রেখা লুপ্ত হ'য়ে যায়, পাথরের মতো শান্তি নামে মুখে।

…শান্তি? কোনো মানুষ, তিনি যত বড়োই হোন, কোনো মানুষের পক্ষে এই কথাটি মেনে নেয়া কি সম্ভব যে আমি আর থাকবো না? 'আমাকে মেরো না, আমাকে অমর ক'রে দাও,' এই কথাটি খোলাখুলি বলতে নেহাৎই চক্ষুলজ্জায় আটকেছে, কিন্তু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রবীন্দ্রনাথ কি অসংখ্যবার এই আবেদনই জানিয়ে যাননি—তিনি, দেবতার মতো মানুষ, তিনিও। 'তখন আমায় না-ই

রা মনে রাখলে, তারার পানে চেয়ে-চেয়ে না-ই বা আমায় ডাকলে।' তার মানে—আমাকে মনে রেখো, আমাকে ভুলো না, অন্তত তোমাদের স্মরণে যেন অমর হ'তে পারি আমি। 'যখন র'বো না আমি মর্ত্য কায়ায়, তখন স্মরিতে যদি হয় মন—' কী করুণ মিনতি, প্রায় গায়ে প'ড়ে মনে করিয়ে দেয়া যে তিনি স্মরণীয়, ললিত ছন্দের আচ্ছাদনে লুকিয়ে নিজের অস্তিত্বটাকে প্রকাণ্ড ক'রে তোলা—যে-আমিকে আমি কখনো ভুলতে পারছি না তাকে জগতের লোক ভুলে যাবে তা তিনি কিছুতেই হ'তে দেবেন না, সুরে ভুলিয়ে কান্নায় গলিয়ে ছিনিয়ে নেবেন আমাদের মন, জয় ক'রে নেবেন আমাদের মনোযোগ। অথচ—আশ্চর্য এই—এ-সব কিছুরই প্রয়োজন ছিলো না রবীন্দ্রনাথের, তিনি যদি একবারও মুখ ফুটে না-বলতেন তবু আমরা বাধ্য হতাম তাঁকে মনে রাখতে—আর তিনি নিজেও তা জানতেন, জানতেন আমাদের উপায় নেই তাঁকে মনে না-রেখে—আর তবু, কী দুর্বলতা, আমাদের ওপর এই অন্যায় সুবিধেটুকু না-নিয়ে পারলেন না তিনি, নিংড়ে-নিংড়ে কান্না বের করলেন আমাদের—একেবারে শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত।

—কিন্তু আমি তো কিছুই করিনি, আমাকে কেউ মনে রাখবে না, আমাকে মরতে হবে হঠাৎ মাথা-কাটিয়ে-দেয়া বেড়ালের মতো, গাড়ির তলায় চেপ্টে-যাওয়া কুকুর-ছানার মতো, ভাগাড়ের যাত্রী প্রকাণ্ড, অসহায়, নিষ্প্রয়োজন ষাঁড়ের মতো। তবু ওদের সঙ্গে আমার একটা অন্তত তফাৎ এই যে আমি যা জেনেছি ওরা তা কখনো জানেনি, আমি জানি আমি মরতে চলেছি, আর সেজন্যই নিজের মনে জিগেস না-ক'রে পারছি না—এর পর? এর পর কী? ধ'রে নেয়া যাক যে মৃত্যু মানে হ'লো কিছু-না, একেবারে কিছুই-না, কিন্তু মানুষ এমনি আশ্চর্য জীব যে ঐ 'কিছু-না'টাও তার মনের মধ্যে 'কিছু-একটা' হ'য়ে ধরা পড়ে;—মুশকিল এই যে ভাষা

ছাড়া চিন্তা করা যায় না, আর ভাষা ব্যবহার করামাত্র কোনো-একটা ধারণা জেগে ওঠে, ধারণা থেকে ছবি, ছবি থেকে গল্প—এমনি ক'রে শূন্য থেকে আবার এই সৃষ্টিতে এসে পৌঁছনো যায়। 'তোমার অসীমে প্রাণমন ল'য়ে যত দূরে আমি ধাই—' ঐ 'অসীম' কথাটা আবছা একটা ছবি দিচ্ছে না কি, প্রায় বাস্তব কোনো তথ্যের আভাস দিচ্ছে না? আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে: অসীম কেমন? সে কি গোলাকার না ত্রিকোণ না চতুষ্কোণ? না কি, ডিমের বা ঢোলকের ছাঁদে গড়া? সে কি কোনো আলো-আঁধারে ঘেরা নিস্তরঙ্গ সমুদ্র, যার মধ্যে খুব সহজে, খুব আরামে, বিনা চেষ্টায় টুপ ক'রে ডুবে যাবো আমরা? না কি তাও একটা ঘূর্ণমান আবর্ত, শান্তিহীন, ফুটন্ত কোনো কড়াইয়ের মতো, যার মধ্যে প'ড়ে গিয়ে টগবগ ক'রে ফেনার মতো নাচতে হবে আমাদের? আমরা জানি না, কিছুই জানি না, জানবো না কখনো—আমাদেরই মন-গড়া একটা কল্পনার আমরা নাম দিয়েছি 'অসীম,' কিন্তু ব্যাপারটাকে যে একটা নামের মধ্যে আটকে দিয়েছি তাতেই বোঝা যায় অসীম আমাদের কল্পনার মধ্যে আসে না। তেমনি—'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হ'তে সংশয়, জয় অজানার জয়।' ঘর অন্ধকার হ'লে যার হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়, সেই ছোটো ছেলে যেমন লোকের সামনে বুক ঠুকে বলে—'আসুক না ভূত, দেখিয়ে দেবো তাকে!' এও সেই রকমের কথা হ'লো। কবিত্ব, বাগাড়ম্বর। এর চেয়ে শাদা কথায় ব'লে দেয়া ভালো যে ভয় পেয়েছি। লজ্জা কী তাতে—আমি কি নির্বোধ যে ভয়ের জিনিশকে ভয় পাবো না? যে-কোনো মানুষ—জ্ঞানী, গুণী, কর্মবীর, যা-ই সে হোক না—শুধু একবার মনে-মনে ভাবুক: আর দশ দিন, কুড়ি দিন, দু-মাস, ছ-মাসের বেশি আমি বাঁচবো না, দু-মিনিট, এক মিনিটের জন্য সত্যি বিশ্বাস করুক কথাটায়, জানুক তার কোনো আশা নেই, কোনো ডাক্তার, কবিরাজ,

সন্ন্যাসী তাকে বাঁচাতে পারবে না—তক্ষুনি কি দম আটকে আসবে না তার, চোখে ঝাপসা দেখবে না, লুপ্ত হবে না সব বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রতিভা, এমনকি হঠাৎ হু-হু ক'রে কেঁদে ফেলবে না? 'তোমার অসীম,' 'জয় অজানার জয়'—ও-সব মনোরম কথা আমরা ততক্ষণই শুধু বলতে পারি যতক্ষণ মৃত্যু থাকে আমাদের কাছে একটা পোশাকি ব্যাপার, সরকারি তথ্য, অথবা নির্বস্তুক ধারণা;—কিন্তু যদি কখনো মুহূর্তের জন্য নিজেকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করাতে হয়, তাহ'লে আমাদের মুখে আর কোনো কথা ফোটে না। আর সেই দরজাটুকুর ধারে, সেই তথাকথিত অসীমের প্রান্তে আমি আজ দাঁড়িয়ে আছি—এ কি সম্ভব?

—কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই! আমার অনুমতি না-নিয়ে, আমার সঙ্গে পরামর্শ পর্যন্ত না-ক'রে, আমারই বিষয়ে এত বড়ো একটা সিদ্ধান্ত নেয়া হ'লো! আমার স্বাধীনতা—যা নিয়ে এত সব লম্বা-চওড়া বক্তৃতা করা হ'লো, তারই ওপর এই প্রতিকারহীন বলাৎকার সহ্য করতে হবে আমাকে! না—যে-উপন্যাসটি শুরু করেছিলাম তা শেষ করার, যে-সব অন্যায় করেছি তার ক্ষতিপূরণের, যাদের ভালোবাসি তাদের ভালোবাসা জানাবার—কিছুরই আর স্বাধীনতা নেই আমার—আমি যে এমন অসহায় বন্দী তা এর আগে ভাবিনি কেন কোনোদিন?

—এখনো কি সময় আছে, আরতি? রাগ আর দুঃখ একসঙ্গে ঠেলে উঠলো শ্রীপতির বুকের মধ্যে, সবচেয়ে রাগ তার নিজেরই ওপর, যেহেতু সে এতদিন বোঝেনি জীবন কত মূল্যবান, যেহেতু সে এক ছেলেমানুষি অহংকারে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তার সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত পানপাত্র থেকে। বড্ড তেতে উঠেছে বিছানাটা—এ কি তার রাগের তাপ, না জ্বরের, না কামনার তা কে জানে—কিন্তু হঠাৎ তার মনে হ'লো তার মাথায় যেন হাওয়া করছে কেউ, ঠাণ্ডা হাওয়া, ধুলোর গন্ধ, আর তার পরেই এক সজল ও সুন্দর শব্দ তার তপ্ত

চেতনার ওপর ঝ'রে পড়লো। বৃষ্টি—আ, বৃষ্টি—কী ভালো—কী আরাম—আর কতদিন এই বৃষ্টির শব্দ শুনবো কে জানে। নোংরা বালিশে মুখ চেপে শ্রীপতি নিঃসাড় হ'য়ে প'ড়ে রইলো, তার সমস্ত প্রাণশক্তি কানের মধ্যে সংহত ক'রে শুনতে লাগলো বৃষ্টির শব্দ, নিজেকে মিলিয়ে দিতে চাইলো তার মধ্যে, জলের মধ্যে জল হ'য়ে গ'লে যেতে চাইলো। সেই সন্ধ্যায় জল দাঁড়ালো কলকাতার অনেক রাস্তায়, ছুটির দিনের ফুর্তি-বোঝাই ট্রাম-বাস্ নিশ্চল হ'লো, কোনো-কোনো পাড়ায় আলো জ্বললো না, এক দীর্ঘ তপ্ত দিনের পরে একই সঙ্গে সান্ত্বনা ও অসুবিধের বর্ষণ হ'লো আকাশ থেকে, ঝাপসা-হ'য়ে-যাওয়া নানা পথ ঘুরে ডাক্তার মৈত্র কোনোরকমে শ্রীপতির আস্তানায় পৌঁছলেন। সে বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিলো গভীরভাবে, হঠাৎ চোখ মেলে দেখলো আলো জ্বলছে, ঘর-ভরা লোক। মনে হ'লো তাদের মধ্যে আরতিও আছে। চোখ বড়ো ক'রে খুলে তাকিয়ে রইলো শ্রীপতি, যেন সারাটা দিন নিজের অন্তরঙ্গতার মধ্যে কাটাবার পর বাইরের বাস্তবের সঙ্গে নিজেকে ঠিক মেলাতে পারছে না।

৮

আর পরের মুহূর্তেই দুর্গাদাস আর গৌতম এক সঙ্গে কথা বলতে শুরু ক'রে দিলো।

'এই এলাম আমরা,' দুর্গাদাস যেন জবাবদিহি দিলো শ্রীপতির কাছে, 'কাকাবাবুকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলাম।'

'তোমার নাকি অসুখ করেছে, শ্রীপতি?' শ্রীপতির বিছানা থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে গৌতম বললো, 'আমিও ভাবলাম তোমাকে একবার দেখে যাই। অন্য একটা কথাও আছে তোমার সঙ্গে।'

'তোমার "অন্য কথা"-টথা এখন থাক। তোমার আই. এ. এস.-এর পড়া নিয়ে শ্রীপতিকে আর বিরক্ত কোরো না।'

'আমার কথা শুনে শ্রীপতি যদি "বিরক্ত" হয় সেটা তার আর আমার ব্যাপার—তোমার নয়, দুর্গাদাস। আর এও জেনে রাখো যে কোনো পরীক্ষায় পাশ করার জন্য আমি অন্য কারো ওপর নির্ভর করি না কখনো।'

'কী মুশকিল! গৌতম হঠাৎ রেগে যাচ্ছো কেন বলো তো? আমি শুধু বলতে চাচ্ছিলাম যে শ্রীপতি এখন অসুস্থ আছে—'

'অসুস্থ? না তো।' এতক্ষণে যেন চারদিকের অবস্থাটা উপলব্ধি করলো শ্রীপতি, আগন্তুকদের ঠিকমতো চিনতে পারলো। ব্যস্ত হ'য়ে উঠে ব'সে বললো, 'বলো, গৌতম, কী বলবে, বলো! কাল না দেখা হ'লো তোমার সঙ্গে—কাল?—হ্যাঁ, কালই তো, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতদিন আগে—কী যেন হয়েছে আমার, ভালো ক'রে মনে পড়ছে না কিছু—বড্ড ঘুমিয়েছি বোধহয় দুপুরে—দুর্গাদাস, তুই কি

আজ দুপুরে এসেছিলি একবার? আমার কাছে বেশি ঘন-ঘন আসাটা বোধহয় উচিত হচ্ছে না তোর, তা এসেছিস যখন বল, সব খবর বল শহরের—একটু আগে বৃষ্টি হচ্ছিলো না?—কী কাণ্ড। সব দাঁড়িয়ে কেন—কিন্তু বসতেই বা বলি কোথায়, এই বিছানাটা তেমন পরিষ্কার নয় আবার, আর তাছাড়া—' হঠাৎ একটু থেমে কেশববাবুর দিকে তাকালো শ্রীপতি, আরো দ্রুত স্বরে আবার বললো, 'আপনি বসুন না ঐ চেয়ারটায়—এত দূরে কষ্ট ক'রে আপনার আসার কী দরকার ছিলো—মানে, আমি বলছি আমিই তো যেতে পারতাম, মানে, আমারই যাওয়া উচিত ছিলো—রোগীরই তো ডাক্তারকে দরকার, যদিও আমি নিজেকে ঠিক রোগী ব'লে মানতে পারছি না।' কথা শেষ ক'রে একটু হাসলো শ্রীপতি, তার জ্বোরো মুখ মুহূর্তের জন্য স্বাভাবিক দেখালো।

'তুমি ব্যস্ত হোয়ো না, আমরা ঠিক আছি,' কেশববাবু চেয়ারটি টেনে আনলেন তক্তাপোশের কাছে। 'তুমি বরং শুয়ে পড়ো আবার।'

'দুর্গাদাস, বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে এখনো?'

'তেমন জোরে আর হচ্ছে না।'

'খুব বৃষ্টি হ'য়ে গেলো—না? শুয়ে-শুয়ে শব্দ শুনছিলাম আমি, অদ্ভুত একটা নেশা আছে এই বৃষ্টির শব্দের। তোর মনে আছে, দুর্গা, গেলো বছর এ-রকম দিনে তুই আর আমি লেক-এর ধারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কেমন ভিজেছিলাম? আর তারপর সূর্যাস্তের আগে বৃষ্টি থেমে গিয়ে মেঘের গা ফেটে কেমন আলো বেরোতে লাগলো? আর কেমন চিকচিক করছিলো ভেজা ঘাসের ডগাগুলো সেই রোদ্দুরে? মনে আছে?'

দুর্গাদাস একটু অবাক হ'য়ে তাকালো শ্রীপতির দিকে। আজ দুপুরে তাকে যে-রকম দেখেছিলো, কাল তাকে যে-রকম দেখেছিলো—তা থেকে এই মুহূর্তের শ্রীপতি যেন আলাদা মানুষ। মনে-মনে

ছুর্গাদাসের ভয় ছিলো যে শ্রীপতি হয়তো রেগে যাবে তাদের দেখে, কিন্তু তা তো নয়—সে যেন ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়েছে, আর কথা বলছে কী-সব অবান্তর বিষয়ে—আজ যে বৃষ্টি হয়েছে সেটাই যেন সবচেয়ে জরুরি ঘটনা তার কাছে—এটা কি ওর ঘুমের ঘোর, না জ্বরের ঘোর, না নিজের মনে মানতে চাচ্ছে না ওর অসুখ? আজ ছুপুর থেকে ছুর্গাদাসের মনে সন্দেহ ঢুকেছে যে শ্রীপতির অসুখটা কিছু উড়িয়ে দেবার মতো নয়; তাই, যদিও সে খোলামেলা তরল প্রকৃতির মানুষ, বেশিক্ষণ মন-খারাপ ক'রে থাকতে পারে না—ভেতরে-ভেতরে তার অনবরত অস্বস্তি হচ্ছিলো, কাকাবাবু দেখে কী বলেন তা জানার জন্য ছটফট করছিলো, সত্যি বলতে।

'বৃষ্টির দিন বড়ো ভালো লাগে আমার,' ছুর্গাদাসের কাছ থেকে কোনো উত্তর না-পাওয়া সত্ত্বেও আবার বলতে লাগলো শ্রীপতি। 'এক-এক বছর হয় না—দশ দিন, পনেরো দিন ধ'রে আকাশ অনবরত মেঘলা হ'য়ে থাকে—সে-রকম হবে কি এ-বছর? সে-ক'দিন আমি ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে চাই, বাস্-এর দোতলা থেকে দেখতে চাই আকাশ আর মেঘ, আর সন্ধেবেলায় বৃষ্টিতে ভেজা চকচকে কালো চৌরঙ্গি, আর গাড়ির পেছনের আলোর লম্বা লাল ছায়াগুলো রাস্তাকে কেমন রঙিন ক'রে-ক'রে স'রে যায়।—কিন্তু না, সন্ধের চেয়ে ছুপুরই বোধহয় ভালো, ঠাণ্ডা আর মেঘলা ছুপুরের মতো ভালো আর-কিছুই নয়, কিন্তু তার চেয়েও ভালো যদি সকালে ঘুম ভেঙেই আধো আলোয় বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাই।'

এই কথাগুলো বলতে শ্রীপতির যেটুকু সময় লাগলো তার মধ্যে কেশববাবুর দিকে ঘন-ঘন দৃষ্টিপাত করলো ছুর্গাদাস, আর গৌতম প্রশান্ত মুখে শ্রীপতির দিকে তাকিয়ে রইলো। হলদে ধরনের ফর্শা রঙের জন্যই হোক, বা দাড়িগোঁফ খুব পাৎলা ব'লেই হোক, গৌতমের মুখে ভাবের অভিব্যক্তি বেশি বোঝা যায় না, প্রায় সব সময় একই রকম গম্ভীর হ'য়ে থাকে সে—ভাবটা এই রকম যে

চারদিকের জগৎটা তার পক্ষে খুব বেশি কৌতূহলের যোগ্য নয়। তার গলার আওয়াজেও ওঠা-পড়া বেশি নেই, একটু উঁচু পর্দায় একটানা কথা বলে সে, উচ্চারণ খুব পরিষ্কার—অন্যদের মতো কেঁপে যায় না রাগলে, খুশি হ'লে বা অবাক হ'লে, আর এইজন্যে বন্ধুদের মধ্যে কেউ-কেউ তাকে খুব তারিফ ক'রে থাকে।

শ্রীপতি কথা শেষ করামাত্র গৌতম বললো, 'তোমার বইগুলো আমি একটু ব্যবহার করতে চাই, শ্রীপতি। তোমার আপত্তি নেই তো?'

'আমার বই? আমার আবার বই কোথায়?'

'আরতির কাছে যে-সব বই রেখে দিয়েছিলে সেগুলোর কথা বলছি।'

একটি হালকা ছায়া শ্রীপতির মুখের ওপর দিয়ে ভেসে গেলো।

'বইগুলো তো আরতির কাছেই আছে দেখছি। তোমার কোনো কাজে লাগে না?'

'নাঃ!' খুব নিচু গলায় জবাব দিলো শ্রীপতি, 'বই আমার বিশ্রী লাগে।'

'তাহ'লে বন্ধুদের বিলিয়ে দাও না।'

'তা দিলে হয়। ক্ষতি কী?'

'আমার যেগুলো ইচ্ছে আমি নিয়ে নেবো?'

'বা রে! নিয়ে নেবে কেন?' দুর্গাদাস প্রতিবাদ করলো, 'আজ ওর বিশ্রী লাগছে ব'লে কালকেই যে বইয়ের জন্য পাগল হ'য়ে যাবে না তার কি ঠিক আছে কিছু?'

'তখন আবার আমার কাছ থেকে শ্রীপতি নিতে পারবে।'

শ্রীপতি কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু দুর্গাদাস তাড়াতাড়ি বাধা দিলো তাকে—'থাক গে, সে-সব পরে হবে। কাকাবাবু ওকে একবার দেখবেন নাকি?'

'তুমি একটু শুয়ে পড়ো দেখি,' ডাক্তার মৈত্র ব্যাগ খুলে স্টেথোস্কোপ বের করলেন।

'আমাকে পরীক্ষা করবেন? এখনই? সকলের সামনে?'

'আমরা না-হয় বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি একটু—' গৌতম দ্রুত পায়ে স'রে এলো আরতির কাছে, তার কানের কাছে মৃদু গলায় বললো, 'চলো বাইরে। শ্রীপতিকে বোধহয় গায়ের জামা খুলতে হবে, আর সেটা খুব সুশোভন দৃশ্য হবে না।'

ইস্পাতের মতো ঠাণ্ডা চোখে গৌতমের দিকে একবার তাকালো আরতি। এর আগের দিন সে যেখানটায় দাঁড়িয়ে ছিলো, আজও ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়েছে, অন্যদের থেকে দূরে, তেমনি সোজা হ'য়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে।—'কেন, সুশোভন হবে না কেন?'

'অন্তুতপক্ষে তোমার উপস্থিত থাকাটা অশোভন হবে।' আরতিকে নিভৃতে পাবার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠছিলো গৌতম, আর শ্রীপতিকে নিয়ে তার মতে এই যে বাড়াবাড়িটা এরা করছে তাতেও তার মেজাজটা খিঁচড়ে ছিলো। 'আমি বাইরে যাচ্ছি, তোমার ইচ্ছে হ'লে আসতে পারো।' কিন্তু কথাটা ব'লে একটু অপেক্ষা করলো সে, আরতি আস্তে-আস্তে তার সঙ্গে নিচে নেমে এলো।

ছোট্ট সরু রোয়াক, রেলিং নেই, সোজা রাস্তা থেকে দুটো সিঁড়ি উঠেছে, দুপুরবেলা ফেরিওলার বিশ্রামের জায়গা, রাত্রে কোনো ভিখিরির ঘুমোবার। গলিটাও সরু, সম্ভ্রান্ত নয়, ফুটপাত নেই, মাঝামাঝি এসে হঠাৎ বস্তিতে পরিণত হয়েছে, দুই দিকে বাড়ির চাপের জন্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না বৃষ্টি এখনো হচ্ছে কি হচ্ছে না। ডাক্তার মৈত্রর পুরোনো কালো গাড়িটাকে মস্ত আর বড্ড বেশি ঝকঝকে দেখাচ্ছে এই গলিতে।

বাইরে এসেই গৌতম বললে, 'ইশ! কত সময় নষ্ট হ'লো বলো তো!'

আরতি নিঃশব্দে মলিন গলিটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'কথা বলছো না কেন? গাড়িতেও একটা কথা বলোনি তুমি।'

'আমি চাই তুমিও এখন কথা বলবে না।'

'না-ব'লে পারছি না। তোমাকে একটা কথা জিগেস করেছিলাম ঘণ্টাখানেক আগে—'

'তার উত্তরও পেয়েছো।'

'সে-উত্তর আমার কাছে অগ্রাহ্য।—চলো না তোমাদের গাড়িতে ব'সে কথা বলি।'

'না, এই ভালো।'

'তোমাদের ড্রাইভার ব'সে আছে,' পাৎলা ক'রে হাসলো গৌতম, 'তোমার আশঙ্কার কোনো কারণ নেই।'

'গৌতম, তোমার চেহারাটি তো মন্দ নয়, জামা-কাপড়ও ভালোই পরো, কিন্তু মানুষটা তুমি এত কুৎসিত কেন?'

গলা দিয়ে একটি ছোট্ট, সরু হাসি বের করলো গৌতম। 'শ্রীপতির মতো আলুথালু বেশ বুঝি ভালো লাগে তোমার? তা যা-ই বলো, এর চেয়ে একটা ভালো রাস্তায় শ্রীপতির থাকা উচিত—একা মানুষ, আর উপার্জন তো নেহাৎ কম করে না।'

'শ্রীপতি যদি ভালো রাস্তায় থাকবে তাহ'লে তোমাদের চলবে কেমন ক'রে?'

'তার মানে?'

'তোমাদের কফি-হাউসের দল, "সুনন্দা"র দল—তার মধ্যে এমন কে আছে যে শ্রীপতির কাছে টাকা নেয়নি?'

'এ-সব খবর নিশ্চয়ই দুর্গাদাস তোমাকে সরবরাহ করে?'

'মিথ্যে বলে?'

'কিন্তু এ-কথাটা বলতে ওর মনে থাকে না যে আমি শ্রীপতির কাছে যতবার টাকা নিয়েছি কোনোবারই ফেরৎ দিতে ভুলিনি।'

'কিন্তু সবাই তো তোমার মতো কর্তব্যপরায়ণ নয়—ভাগ্যিশ নয়!'

'আরতি, আজ হঠাৎ আমার ওপর এমন খেপে আছো কেন?'

আরতি জবাব দিলো না।

গৌতম স'রে এসে আরতির গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। শাড়ি-জামার তলায় আরতির সুগঠিত দেহটি তার মনের সামনে ভোজ বিছিয়ে দিলো। চাপা গলায় বললো, 'তোমার হয়েছে কী, আরতি? কী ভাবছো?'

'ভাবছি, ঠিক কী-ধরনের অপমান করলে তোমার মগজের মধ্যে সেটা প্রবিষ্ট হবে।'

নিচু গলায় আবার হাসলো গৌতম।—'এই যে তুমি কথাটা বললে, আমার কানে শোনালো যেন প্রেমালাপ। কোনো আশা নেই, আরতি, আমার ধৈর্য অশেষ। আমাকে তুমি ছাড়াতে পারবে না।'

'ছিনেজোঁকের মতো লেগে থাকবে?'

'সে তুমি যা খুশি তা-ই বলতে পারো, তাতে আমার কিছু এসে যায় না।'

'তুমি ভাবছো আমার কথাগুলো ভান?'

'নিজে যা জানো তা আমাকে আর জিগেস করো কেন? আর এও তুমি জানো যে ভানই আমি ভালোবাসি। ভান যার নেই এমন মেয়ে আমার অসহ্য।'

'আবার বন্দনার কথা ভাবছো বোধহয়?'

'তোমরা বলো বন্দনা খুব ভাল মেয়ে,' হঠাৎ একটু অন্য সুরে কথা বললো গৌতম, 'কিন্তু জানো না বন্দনা তার ভালোত্বের চাপেই পাগল ক'রে দিতে পারে মানুষকে।'

'তোমার পূর্বপ্রণয়ের ইতিহাসে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, গৌতম।'

'নেই বুঝি? কিন্তু বন্দনার কথা আমি তুলিনি, মনে রেখো— তুমিই দু-বার তুললে এই দু-ঘণ্টার মধ্যে।'

একটু স'রে গিয়ে গৌতম একটি সিগারেট ধরালো, ছোট্ট রোয়াকে পাইচারি করতে-করতে ঘন-ঘন টান দিতে লাগলো সিগারেটে। বাইরের ছিমছাম চেহারার আড়ালে তার ভেতরটা যেন অস্থির হ'য়ে উঠেছে, মনের মধ্যে যে-কথাটা নাড়া দিচ্ছে সেটাকে একটা নিষ্পত্তিতে না-নিয়ে গিয়ে সে ছাড়বে না। — 'ইশ!' হাতের একটা ভঙ্গি ক'রে হঠাৎ ব'লে উঠলো সে, 'আবার বৃষ্টি! কী যে হয়েছে আজ! আর এই বৃষ্টি নিয়ে কত কবিত্ব করছিলো শ্রীপতি। একটু স'রে দাঁড়াও— ভিজে যাবে যে।'

'একটু ভিজি।'

'দেখছো কী-রকম কাদা জ'মে উঠছে গলিটায়। আর ঐ বাড়ির রেলিঙে মেলে-দেয়া কাঁথা-কাপড় আজ আর শুকোলো না। ওদিকে ট্রাম বন্ধ, বাস্‌গুলোর অবস্থা ভাবো!'

'তা বৃষ্টির কিছু উপকারিতা নেই কি? তারই জন্য শস্য জন্মায় শুনতে পাই।'

'অতএব দেখছো বৃষ্টিও একজন কাজের লোক, আমাদের মন উদাস ক'রে দেয়া মেঘের উদ্দেশ্য নয়।'

'মেঘ বুঝি তোমার কানে-কানে ব'লে গেছে যে পৃথিবীতে শস্য ফলানোই তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য?'

আরতির কানের কাছে মুখ নিয়ে গৌতম বললো, 'খামকা কেন ঝগড়া করছো বলো তো! মুখ ফুটে সেই কথাটি বলো, যা শোনার জন্য আজ সারাদিন আমি ছটফট করছি।'

'আশ্চর্য অহমিকা তোমার! তুমি ছটফট করছো ব'লেই আমাকে তা বলতে হবে?'

'না—শুধু সেজন্যে নয়। ব্যাপারটা স্থির হ'য়ে গেলে তুমিও শান্তি পাবে।'

'আমি শান্তি চাই তা ধ'রে নিচ্ছো কেন?'

'কে না চায়?'

'আমি বরং অন্য একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম তোমাকে—'

'বলো!' আগ্রহে ঝুঁকে পড়লো গৌতম।

'আমি একজনকে ভালোবাসি।'

'বিশ্বাস করি না।'

'অন্ততপক্ষে তোমাকে ভালোবাসি না।'

'তুমি কাউকেই ভালোবাসো না সে-কথা বরং বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় আমার।'

'তাহ'লে? যে-মেয়ে ভালোবাসতেই পারে না তাকে বিয়ে করার জন্য খেপেছো?'

'ভালোবাসা ব'লে সত্যি কিছু আছে নাকি, আরতি?'

'তোমার মতে ওটা বানানো কথা?'

'পুরোপুরি তা নয়। দেহ ব'লে একটা ব্যাপার আছে, আছে সান্নিধ্য, স্বার্থ এক হবার ফলে ঘনিষ্ঠতা, আর সবার ওপরে আছে পরম ক্ষমতাশালী অভ্যেস। দেখতে পাচ্ছো, আমি তোমার কাছেও রেখে-ঢেকে কথা বলছি না—ইচ্ছে করলে যে একটু-আধটু রোমিও সাজতে না পারি তা নয়—তোমার সাহিত্য-পড়া ন্যাকাদের চাইতে ভালোই পারি হয়তো, কিন্তু—ঐ আরকি—আমি মানুষটা অনেস্ট, এবং অনেস্টি ভালোবাসি।'

সন্ধে পেরিয়ে গেছে ততক্ষণে, বৃষ্টিতে ঝাপসা হ'য়ে আছে গলি, ল্যাম্পোস্টের গা বেয়ে জলের ধারা নেমে যাচ্ছে চিকচিকে সরু একটা সাপের মতো। মিনিটখানেক এই দৃশ্যটি দেখলো আরতি, তারপর হঠাৎ মুখ ফেরালো গৌতমের দিকে।

'আমি দেখছি তুমিই সবচেয়ে বড়ো ন্যাকা, কেননা তুমি যা বলছো সেই অনুসারেই যে-কোনো মেয়েকে বিয়ে করলে তোমার চলতে পারে।'

'না তো! বিয়ের ব্যাপারে পছন্দ-অপছন্দের কথা না-উঠেই পারে না। আগেকার দিনে মা-বাবারা পছন্দ করতেন, আজকাল

আমরা নিজেরা পছন্দ করছি। ব্যাপারটা একই।'

'আমি কি জানতে পারি তোমার মনোনীতা হবার মতো সৌভাগ্য আমার কী ক'রে হ'লো?'

'আরতি, তোমার চপলতা বোধহয় সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।' গৌতম তার লম্বা চেহারা নিয়ে আরতির মুখের উপর ঝুঁকে পড়লো।

'চপলতা?...' সরু চোখে একবার তাকালো আরতি, নিজের অজান্তেই এক পা পেছনে স'রে গেলো গৌতম। — 'না, আমি সত্যি জানতে চাই। কেননা আমার নিজের ধারণা যে তোমার সঙ্গে আমার কিছু মেলে না — কিছুই না।'

'সেজন্যেই ক-মাস ধ'রে অনবরত মেলামেশা করছো আমার সঙ্গে?'

'সেজন্যেই আরো ভালো ক'রে বুঝতে পেরেছি যে মেলে না।'

'ভুল করছো, আরতি — হয়তো জেনে-শুনেই ভুল করছো। তুমি আমারই মতো সুস্থ, আত্মস্থ, সক্ষম — আর আমারই মতো ঠাণ্ডা মাথার মানুষ, যা সত্যি বলতে কোনো মেয়ের পক্ষে অসাধারণ। তোমার আমার বিয়ে হ'লে রোমাঞ্চ-টোমাঞ্চ কী-রকম হবে জানি না, কিন্তু সমাজের পক্ষে সেটা সম্পদ হবে তাতে আমার সন্দেহ নেই।'

শব্দ ক'রে হেসে উঠলো আরতি। গৌতমের স্বল্পলোম গালে আঙুলের টোকা দিয়ে বললে, 'তোমার অনেক গুণ আছে, গৌতম, কিন্তু সত্যি তুমি বড়ো বোকা — বড্ডই বোকা তুমি।'

অন্ধকারে লণ্ঠনের মতো লাল হ'য়ে উঠলো গৌতমের মুখ। তা লক্ষ ক'রে গম্ভীর হ'লো আরতি, মৃদু স্বরে আবার বললো, 'সত্যি কি তোমার এমন সন্দেহ কখনো হয়নি যে তুমি যাকে অনেস্টি ভাবছো সেটা তোমার নির্বুদ্ধিতা? তুমি যেহেতু রং-কানা, সেইজন্য যে লাল রংটা মরীচিকা নয় এ-কথাও কি মাথায় ঢোকে না তোমার?'

একটু তাকিয়ে থাকলো গৌতম, হঠাৎ হাসির মতো ভঙ্গিতে দাঁত

দেখিয়ে বললে, 'আমাকে রাগাবার জন্য এই যে তুমি প্রাণপণ চেষ্টা করছো, এটা বেশ ভালো লাগছে আমার।'

'আমি তোমাকে রাগাতে চাচ্ছি না ; আমি শুধু বলতে চাচ্ছি যে আমারই মতো সুস্থ, সক্ষম, ঠাণ্ডা মাথার মেয়ে আরো অনেক আছে এই কলকাতায়। তোমার মা-কে একবার বলো না — তিনি দশ দিনের মধ্যে পঞ্চাশ মেয়ে দেখিয়ে দেবেন তোমাকে। কিংবা — চারদিকে চোখ ফেললে তুমি নিজেই দেখতে পাবে। আমি এখন জিগেস করছি, তুমি যে আর-কোনো মেয়েকে চোখে দেখছো না তার কারণটা কী?'

'তার কারণ — তুমি। সুস্থ হ'তে পারে, ঠাণ্ডা মাথার হ'তে পারে, কিন্তু তোমার মতো আর-একজনকে আমি কোথায় পাবো?'

'আমার মতো আর-কেউ নেই, এটা তোমার মত হ'তে পারে, কিন্তু অন্যেরা মানবে ব'লে কি তোমার মনে হয়?'

'বেশ!' দাঁতের ফাঁকে উচ্চারণ করলো গৌতম, 'না-হয় মানছি আমি তোমাকে ভালোবাসি। হ'লো?'

'এই তো লক্ষ্মী ছেলে!' মিষ্টি ক'রে একটু হাসলো আরতি। 'এখন একটু দাঁড়াও তো এখানে, আমি চট ক'রে দেখে আসি বাবার কদ্দূর হ'লো। না কি বাড়ি চ'লে যাবে? ইচ্ছে হয় তো গাড়িটা নিয়ে যেতে পারো।'

ওপর থেকে দুর্গাদাসের হাঁক শোনা গেলো, 'আরতি, কাকাবাবু তোমাকে ডাকছেন।'

'তোমরাই নামিয়ে দিয়ো আমাকে। আর আমিও দেখে একবার যাই শ্রীপতি কেমন আছে-টাছে,' ব'লে গৌতমই আগে-আগে ওপরে উঠে এলো। এবার তাকে পাশ কাটিয়ে সোজা এগিয়ে গেলো আরতি। শ্রীপতি মেঝেতে পা ঠেকিয়ে বিছানার ওপর ব'সে আছে, তার মুখের ভাবটি শান্ত, যেমন হয় অসুখের সময় ডাক্তারের কথা শোনার পর। ডাক্তার যদি অভয় না-ও দেন, যদি স্পষ্ট ক'রে না-ও

বলেন কিছু, তবু ডাক্তারের উপস্থিতিরই একটা আরাম আছে, অন্তত কয়েক মিনিটের জন্য মন একটু হালকা লাগে, ইচ্ছে হয় উঠে বসতে, কথা বলতে। কিংবা হয়তো সারাদিন আধো ঘুমে আধো জ্বরে কাটাবার পর শ্রীপতির ঘোর এখনো কাটেনি; তার হাতে একটা জলের গ্লাশ ধরা আছে, কিন্তু সেটা নিয়ে কী করবে তা যেন ঠিক বুঝতে পারছে না; হঠাৎ আরতিকে ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার মুখে অকটি অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠলো, আর পরের মুহূর্তেই সে জলের গ্লাশে চোখ নামিয়ে নিলো।

'কাশি এলেই একটু-একটু ক'রে জল খাবে,' মৈত্র নির্দেশ দিলেন রোগীকে, 'একবারে বেশি খাবে না, বার-বার একটু-একটু ক'রে। আর—হ্যাঁ—তুমি নিজেই নিজের ঠিক ওষুধ বের করেছো: তোমার এখন সবচেয়ে বেশি দরকার বিশ্রাম। ওষুধ আজ বেশি কিছু দিচ্ছি না, কিন্তু জ্বর কখন কত ওঠে তা দেখতে হবে—দুর্গাদাস, যাও তো একটু আমার গাড়িটা নিয়ে—আচ্ছা চলো, আমিও যাই—অরু, তুই কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ?'

'এই তো এখানেই।' বাবার মুখের দিকে স্থির চোখে একটু তাকিয়ে থাকলো আরতি, আর তার পেছন থেকে গৌতম গম্ভীর গলায় জিগেস করলো, 'কী হয়েছে শ্রীপতির?'

'এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কাল আবার দেখতে হবে। আমি এক্ষুনি একটু ঘুরে আসছি, অরু—দুর্গাদাসকে নিয়ে যাচ্ছি—চলো হে।' কেশববাবু একটু ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন।

শ্রীপতির বিছানার কাছে আরো দু-পা এগিয়ে এলো আরতি। শ্রীপতির দেহে কোনো ভঙ্গি হ'লো না; একই ভাবে ব'সে আছে সে, তার মুখের লালচে আভা এখন আরো স্পষ্ট, ঘামে লেপ্টে আছে কপালের ওপর একগোছা চুল, একই সঙ্গে ক্লান্ত আর সুখী দেখাচ্ছে তাকে, উদ্দীপ্ত আর অবসন্ন। আরতি বললো, 'কেমন আছো?'

শ্রীপতি এক ঢোঁক জল খেলো, কোনো জবাব দিলো না।

'কেমন আছো, শ্রীপতি ?'

'আমি ? আমাকে বলছো ? আমি ভালো আছি। তোমরা এসে খুব ভালো করলে।'

'গ্লাশটা ধ'রে আছো কেন সারাক্ষণ ? নামিয়ে রাখো না।— দাও।' শ্রীপতির হাত থেকে আরতি জলের গ্লাশ নিয়ে নিলো, চেয়ারে সেটা রেখে চেয়ারটা আরো এগিয়ে দিলো বিছানার কাছে।— 'এই রইলো।— শোনো, তুমি চোখ নামিয়ে আছো কেন ? তাকাতে পারো না ?'

মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে তাকালো শ্রীপতি, একটি লাজুক, সুন্দর, ছেলেমানুষি হাসি তার মুখে জ্ব'লে উঠেই মিলিয়ে গেলো। হঠাৎ বললো, 'তোমাকে কী-একটা কথা বলবো ভেবেছিলাম — কিন্তু এখন আর মনে পড়ছে না।'

'আমি কাল আবার আসবো।— কিন্তু এখানে তোমার আর থাকা চলবে না, শ্রীপতি।'

'হ্যাঁ — আমিও মাঝে-মাঝে ভাবি অন্য কোথাও চ'লে যাই। পঁচাত্তর তলার কোনো-এক ঘরে।'

'পঁচাত্তর তলা !' গৌতম ভুরু কুঁচকে বললে, 'তার মানে ?'

'কী জানি। বাসা-বদলের কথা ভাবলেই আমার পঁচাত্তর তলার একটা ঘর মনে পড়ে। সেখানে আকাশ খুব কাছে। জানলার বাইরে গোল আর গোলাপি মেঘ আস্তে ভেসে-ভেসে বাতাসকে রঙিন ক'রে দিয়ে চ'লে যায়।'

'শ্রীপতি !' নিচু গলায় হেসে উঠলো গৌতম, 'তুমিও আমাকে লজ্জা দেবে দেখছি। তোমাকে কড়া পাকের মানুষ ব'লে জানতাম, কিন্তু তোমারও এই স্বপ্নবিলাস !'

' "বিলাস" কেন ?'

'তুমি জানো ও-রকম কোনো ঘরে তুমি কোনোকালেও থাকবে না।'

'কে বলতে পারে? মানুষের সম্ভাবনা তো অন্তহীন। আর তাছাড়া —'

'ওর সঙ্গে তর্ক কোরো না, শ্রীপতি,' আরতি বাধা দিলো কথায়। 'সব কথা সকলকে বলতে নেই তা কি তুমি জানো না? এখন শোনো — আমার একটা কথা শোনো। আমি একটা প্রশ্ন নিয়ে তোমার কাছে এসেছি।'

'কিন্তু আমারও একটা কথা ছিলো তোমার সঙ্গে। হ্যাঁ — মনে পড়েছে এবার, তোমার চিঠি। সেই চিঠির কোনো উত্তর তুমি পাওনি, কিন্তু তাই ব'লে এ-কথা ভেবো না যে সে-উত্তর আমি লিখিনি বা লিখছি না বা লিখতে চাই না। রোজই লিখি মনে-মনে, একটু-একটু ক'রে লিখি আর ছিঁড়ে ফেলি — বলতে পারো আমি অনবরত তোমাকে চিঠি লিখে চলেছি, আমার এত কথা আছে যে সে-চিঠি কোনোদিন ফুরোবে না।'

'চিঠি!' ব'লে উঠলো গৌতম। 'চিঠি কিসের? কী নিয়ে লিখেছিলে, আরতি।'

'চিঠির কথা এখন থাক। শোনো, শ্রীপতি। এই যে তোমার বন্ধু গৌতম বর্ধন — এই গৌতমের জেদ আমাকে বিয়ে করবে। রোজ এক কথা ব'লে-ব'লে অস্থির ক'রে দিচ্ছে আমাকে। এখন বলো তো —'

'আরতি, আমি প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করার আগে তোমার স্থানকালপাত্র ভেবে দেখা উচিত ছিলো।'

'স্থান, কাল, পাত্র? সবই ঠিক আছে। একটু আগে আমাকে তুমি কী বলছিলে ঐ রোয়াকে দাঁড়িয়ে? বদলের মধ্যে এইটুকু হয়েছে যে শ্রীপতি এখন আছে এখানে। — তা ভালোই, আমি এ-বিষয়ে তারই মতটা জানতে চাই। শ্রীপতি, গৌতমের দিকে একবার তাকাও, আমার দিকেও তাকিয়ে দ্যাখো। তুমি গৌতমকে ভালো ক'রেই চেনো, আমাকে চেনো না তাও নয়। এখন বলো —

বেশ ভেবে উত্তর দাও— আমি কি ওকে বিয়ে করবো? তুমি যদি বলো, যদি মুখ ফুটে একবারও বলো তুমি, তাহ'লে আমি আর এক মুহূর্ত ভাববো না, তোমার সামনেই কথা দেবো ওকে। চুপ ক'রে আছো কেন— তোমার একটি কথার ওপর সব নির্ভর করছে আমার।'

'অসহ্য!' ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ শোনালো গৌতমের গলা, 'তোমার স্পর্ধা অসহ্য হ'য়ে উঠেছে, আরতি!'

গৌতমের দিকে না-তাকিয়ে আরতি আবার বললো, 'শ্রীপতি, কিছু বলো। আমি তোমার কথা শুনতে চাই। তোমার কি কিছুই বলার নেই আমাকে?'

কিন্তু শ্রীপতির মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোলো না। স্তব্ধ হ'য়ে সে তাকিয়ে রইলো সামনের দিকে, অন্য দু-জন মানুষের কাউকেই যেন সে দেখতে পাচ্ছে না।

'— আমি আর-একটু বলি, শ্রীপতি, তাহ'লে ব্যাপারটা তুমি আরো ভালো ক'রে বুঝতে পারবে। গৌতম বলে, ভালোবাসা ব'লে কিছু নেই, ওটা মানুষের বানানো কথা। হয়তো তা-ই সত্য, কিন্তু কথাটা হচ্ছে: মানুষকে তা বানাতে হ'লো কেন? আর "বানানো" মানেই বা কী? আমরা কি ধ'রে নিতে পারি না যে মানুষ যা অনবরত বানিয়ে চলে সেটা তার অস্তিত্বের পক্ষেই একটা জরুরি ব্যাপার? আর-এক প্রশ্ন: সত্য কি ক্ষণিক হ'তে পারে না? কিংবা, স্থায়িত্ব দিয়েই কি সত্য-মিথ্যার বিচার করতে হবে? যেহেতু জীবনে প্রতিদিন আমরা ভালোবাসি না, অথচ আমাদের রোজ তিন বার ক'রে নির্ভুলভাবে খিদে পায়, তাই কি প্রমাণ হ'লো যে ভালোবাসার চাইতে খিদে জিনিশটা বেশি সত্য? আর, অনবরত ভালোবাসা, প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে ভালোবাসা— তা কি মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব? তুমি একটু আগে যা বললে তা যদি ঠিক হয়, যদি মানুষের সম্ভাবনার সত্যিই অন্ত না থাকে, তাহ'লে তো কোনো-একদিন এমনও

হ'তে পারে যে প্রতিটি মানুষ প্রতি মুহূর্তে ভালোবাসবে, কখনো শুকিয়ে যাবে না, ফুরিয়ে যাবে না, ক্লান্ত হবে না? আর সেই কোনো-এক দিন যে আজকের দিনই নয়, তা-ই বা কী ক'রে জানবো আমরা? আমি ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু সংক্ষেপে কথাটা এই: যদি ভালোবাসা সত্য হয় তাহ'লে এসো না আমরা এখনই ভালোবাসতে আরম্ভ করি। বলো তুমি, কার কথা আমি বিশ্বাস করবো: তোমার, না গৌতমের? বলো, উত্তর দাও।'

যতক্ষণ তারা নিভৃতে ছিলো আরতির যে-কোনো কথা সহ্য করতে পেরেছিলো গৌতম, এমনকি ধ'রে নিচ্ছিলো ওগুলো সবই প্রেমকলার অঙ্গ, কিন্তু শ্রীপতির সামনে আরতির এই নির্লজ্জতায় তার মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্ব'লে উঠলো। তার সংযম ছুটে গেলো এতক্ষণে, যা নিয়ে সে গর্ব ক'রে থাকে সেই 'ঠাণ্ডা মেজাজ' ছারখার হ'লো, কুটিল রেখা পড়লো মুখে, তার সুশ্রী, অমায়িক, নিরুদ্বেগ চেহারাটি কেঁপে-কেঁপে ফুলে উঠতে লাগলো নিজের আর অন্যের ওপর অবিশ্বাসে।—'আরতি, তোমার কি চক্ষুলজ্জাও নেই, সাধারণ একটা ভদ্রতাজ্ঞানও নেই? কিছু মনে কোরো না—তোমার মা নেই, তোমার বাবা স্নেহে অন্ধ, ছেলেবেলা থেকে অত্যন্ত প্রশ্রয় পেয়ে-পেয়ে তুমি উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে গিয়েছো—আজ এর সঙ্গে, কাল ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াও, ছেলেদের নিয়ে খেলা করা তোমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে, ভেবে দেখছো না এই খেলার পরিণাম কত খারাপ হ'তে পারে। আমি তোমাকে তোমার নিজের হাত থেকে বাঁচাতে চাচ্ছি—নিয়ে যেতে চাচ্ছি এক সুস্থ, পরিচ্ছন্ন জীবনে—আর তাই তোমার এত আক্রোশ আমার ওপর, তাই অগত্যা ভালোবাসার বুলি কপচাতে শুরু করেছো, এইমাত্র এমনও ভান করলে যে শ্রীপতিকে তুমি ভালোবাসো। ছি! একটা অসুস্থ মানুষ, যাকে কোনো কারণেই উত্তেজিত করা উচিত নয়, এ-মুহূর্তে যার সবচেয়ে বেশি দরকার বিশ্রাম, তার সঙ্গে এ-রকম অভিনয় কি নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পড়ে না? শ্রীপতি

যে তার বন্ধুর কোনো ক্ষতি করতে চাইবে না এ-কথা বোঝার মতো শ্রদ্ধাটুকুও তাকে করলে না তুমি। আমাকে ভুল বুঝো না, আমি জানি তোমার মধ্যে অনেক গুণ আছে, আমি সেগুলোকে উজ্জ্বল ক'রে ফোটাতে চাই ব'লেই তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করছি। এতেই বুঝবে যে তোমরা যাকে ভালোবাসা বলো তার চেয়ে অনেক বেশি দামি জিনিশ আমার বুদ্ধি, আমার ধৈর্য, আমার বিবেচনা।'

গৌতমের কথা শেষ পর্যন্ত শুনে নিচু গলায় টেনে-টেনে হেসে উঠলো আরতি। ঢেউয়ে-ঢেউয়ে গড়িয়ে গেলো সেই হাসি, তার রেশ ভেসে রইলো বাতাসে।

'অসহ্য!' হাতের মুঠো পাকিয়ে গৌতম ব'লে উঠলো। 'শ্রীপতি, তোমার কি প্রতিবাদ করা উচিত নয়?'

শ্রীপতি উঠে দাঁড়ালো বিছানা ছেড়ে, তার মুখ ফ্যাকাশে, কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট কেঁপে উঠলো। 'গৌতম,' প্রায় ফিশফিশ ক'রে বললো সে, 'আমার খুব খারাপ লাগছে—কিন্তু এ-ব্যাপারে কিছুই আমার করার নেই।'

'আচ্ছা, আমিই এর ব্যবস্থা করবো!' দাঁতের ফাঁকে এ-কথা ক-টি ছুঁড়ে দিয়ে গৌতম হনহন ক'রে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

একটু পরে কেশববাবু দুর্গাদাসকে নিয়ে ফিরে এলেন। দুর্গাদাস টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো এক শিশি মিকশ্চার, ওষুধ খাবার গ্লাশ, থার্মোমিটার, এক শিশি ডেটল, এক টিন বিস্কুট, তা ছাড়া কিছু রুটি মাখন ফল মিষ্টি। বাড়িওলার দরোয়ান এসে একখানা ক্যাম্প-খাট রেখে গেলো।

'শ্রীপতি, শোনো,' কেশববাবু বলতে লাগলেন 'দুর্গাদাসকে আমি আজ রাত্রে তোমার কাছে থাকতে বলেছি। তুমি আপত্তি কোরো না। ওর মা-কে আমরা খবর দিয়ে যাবো, কাছেই ওর মাসির বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসবে। তুমিও কিছু খেয়ো কিন্তু রাত্রে—যা ইচ্ছে হয় খেয়ো। দুর্গাদাস তোমাকে ওষুধ দেবে, তোমার টেম্পারেচর

নেবে। আমি কাল যত শিগগির পারি আসবো, আমি না-আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো, দুর্গাদাস। এখন চলি।'

শ্রীপতি চোখ তুলে তাকালো একবার, কথা বললো না।

আরতি তার চোখে চোখ ফেলে বললো, 'শ্রীপতি, ভালো থেকো। এখন চলি।'

ডাক্তার মৈত্র আর আরতিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে দুর্গাদাস ঘরে ফিরে এসে দেখলো শ্রীপতি আবার শুয়ে পড়েছে। চেষ্টা ক'রে গলায় একটু ফুর্তি এনে দুর্গাদাস বললো, 'চা খাবি, শ্রীপতি? নিয়ে আসি দোকান থেকে?'

'আমার বড়ো ক্লান্ত লাগছে,' ব'লে শ্রীপতি দেয়ালের দিকে পাশ ফিরলো।

৯

দিন সাতেক পরে কলেজ স্ট্রিটের এক বইয়ের দোকানে গৌতমের সঙ্গে হিমেন্দুর দেখা হ'য়ে গেলো। হিমেন্দু নানা রকম বই দেখছিলো কাউন্টারে দাঁড়িয়ে, বইয়ের পাতায় প্রায় নাক ঠেকিয়ে, গৌতম যে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা লক্ষ করেনি— —চেনা গলার আওয়াজে চমকে মুখ তুললো।

—'এই যে, ভালো আছেন?'

'আপনি ভালো?' কিছুটা ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলো হিমেন্দু।

'অনেক বই কিনছেন মনে হচ্ছে?

'দেখছিলাম—আমাদের কলেজ-লাইব্রেরির জন্য—'

'অত স্বরলিপি আর রবীন্দ্র-সংগীত বিষয়ে বই? আপনাদের কলেজে গানের ডিপার্টমেণ্ট আছে বুঝি?'

'ঠিক তা নয়—' আবছা জবাব দিলো হিমেন্দু। আসলে এগুলো বন্দনার ফরমাশ, একটা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও নিতে হবে তার জন্য, তার হঠাৎ খেয়াল হয়েছে বাংলায় এম. এ. দেবে সামনের বছর—আসলে মনস্থির করতে পারছে না কী করবে—বন্দনার এই অস্থির অবস্থার জন্য তার পাশে দাঁড়ানো মানুষটিই দায়ী, এ-কথা হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো হিমেন্দুর। মুহূর্তে নানারকম ভাব খেলে গেলো তার মনের মধ্যে—প্রথমে গতানুগতিকভাবে মনে হ'লো গৌতম অপরাধী, তারপর ভাবলো ঠিক হয়েছে, বন্দনার মতো মেয়ের যোগ্য নয় গৌতম, আর তারপর তার আনন্দ হ'লো এ-কথা ভেবে যে তাকে না-হ'লে বন্দনার প্রায় চলে না আজকাল, ছোটো বড়ো যে-কোনো ব্যাপারে হিমেন্দুর সাহায্য তার চাই।

পেপার-ব্যাকে একটা আধুনিক গণিতের বই কিনে গৌতম একটু অপেক্ষা করলো।—'যাবেন নাকি এখন ?'

'হুঁ, যাচ্ছি।' তার নির্বাচিত বইগুলো পর-পর সাজাতে-সাজাতে হিমেন্দু দোকানিকে বললো, 'একখানা দীনেশ সেন জোগাড় ক'রে দিতে পারেন নাকি ?'

'ছাপা নেই—পুরোনো বইয়ের দোকানে পেতে পারেন।'

'আপনি হঠাৎ দীনেশ সেন পড়তে চাচ্ছেন ?'

'এমনি একটু দেখতে চেয়েছিলাম। আপনার চেনাশোনা কারো আছে নাকি বইটা ?'

কথাটা ব'লেই অনুতপ্ত হ'লো হিমেন্দু; গৌতমের সাহায্যে বই জোগাড় ক'রে বন্দনাকে দেবে, এই চিন্তাটা ঘৃণ্য মনে হ'লো তার। কিন্তু গৌতম খুব সহজভাবে উত্তর দিলো—'কারো কাছে কি আর না আছে। খোঁজ নেবো।—তা শ্রীপতির খবর তো শুনেছেন ?'

'শ্রীপতি ? হ্যাঁ—কী যেন শুনছিলুম—অসুখ করেছে নাকি ?'

'কী কাণ্ড! সত্যি একেবারে যক্ষ্মা বাধিয়ে বসেছে শেষ পর্যন্ত।'

'যক্ষ্মা ?'

গৌতম মুখ গম্ভীর ক'রে ওপর থেকে নিচে মাথা নাড়লো। —'আমি একটু কফি-হাউসে যাচ্ছি। আপনি আসবেন নাকি ?'

মুহূর্তের জন্য দ্বিধা ক'রে হিমেন্দু রাজি হ'লো।—'চলুন।' হঠাৎ গৌতমের দিকে কেমন একটা অস্পষ্ট আকর্ষণ অনুভব করলো সে—যেহেতু গৌতম ছিলো এই সেদিনও বন্দনার সবচেয়ে কাছের মানুষ, তাই যেন তার মধ্য দিয়ে বন্দনার সঙ্গে হিমেন্দুর এক রহস্যময় সম্বন্ধ স্থাপিত হ'য়ে যাচ্ছে।

'—এ-বইগুলো আলাদা ক'রে রাখুন, আমাদের কলেজে পাঠিয়ে দিতে হবে।'

'সবগুলো ?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি বিকেলে আবার আসবো।'

রাস্তায় বেরিয়ে গৌতম বললো, 'কলেজের জন্য বই কিনবেন, তা নিয়ে অত ভাববার কী আছে?'

'টাকা অল্প, বই অনেক। বাছা শক্ত।'

'ছোটো-ছোটো ব্যাপার নিয়ে অত যদি ভাবেন তাহ'লে তো মুশকিল।'

হিমেন্দু কোনো জবাব দিলো না।

গৌতম অপাঙ্গে একবার নিরীক্ষণ করলো হিমেন্দুকে। তার চেয়ে লম্বায় প্রায় এক মাথা ছোটো, বিনয় অথবা অস্বাস্থ্যের ফলে এই বয়সেই পিঠ একটু কুঁজো হ'য়ে গেছে, দেখে মনে হয় পড়া আর পড়ানো ছাড়া আর-কোনো কাজেরই সে যোগ্য নয়। এই পুঁথি-খেকো সম্প্রদায়কে মনে-মনে বেশ অবজ্ঞা করে গৌতম, কিন্তু এরা কেউ-কেউ কথাবার্তা মন্দ বলে না, যেমন ভালো রান্নার জন্য নানা রকম মশলার সঙ্গে শুকনো তেজপাতাটিরও দরকার হয়, তেমনি একটি উপভোগ্য আড্ডাতেও এদের এক-আধজনকে না-হ'লে ঠিক চলে না। কফি-হাউসে মিনিট চল্লিশ — গৌতম মনে-মনে হিশেব করলো — এর সঙ্গে সময়টা হয়তো ভালোই কাটবে, অন্তত গৌতম জোর গলায় কোনো মতামত ঘোষণা করলে এই ছোটোখাটো রোগা মানুষটি প্রতিবাদ করতে পারবে না।

বেলা দুপুর, কলেজগুলোতে গ্রীষ্মের ছুটি চলছে তখনও, কফি-হাউসে ভিড় নেই, ঘরের মধ্যিখানে একটি টেবিলে জন পাঁচেক ছেলে ব'সে চেঁচিয়ে কথা বলছে। সেই দল থেকে দুর্গাদাস তাদের দিকে হাত নাড়লো, অন্যেরাও একেবারে অচেনা নয়, কিন্তু গৌতম তাদের থেকে দূরে একটি টেবিল বেছে নিলো। একটু পরে দুর্গাদাস এসে যোগ দিলো তাদের সঙ্গে।

'এই যে,' দু-জনের দিকে আলাদা ক'রে তাকালো দুর্গাদাস। 'একসঙ্গে কোত্থেকে তোমরা?'

'আকাশ থেকে পড়েছি ধ'রে নে,' গৌতম তার লম্বা শরীরটি চেয়ারের পিঠে এলিয়ে দিয়ে দুর্গাদাসের দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকালো। 'আরম্ভ কর, দুর্গাদাস। দু-একটা নতুন গসিপ শুনিয়ে দে আমাদের।'

'গসিপ হিশেবে আমি বিখ্যাত নাকি? জানতাম না তো।'

'আমি তোকে দোষ দিচ্ছি না, কেননা এই কফি-হাউসের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেরই তা-ই পেশা।'

'—অবশ্য তুই ছাড়া। তা আমি কোন কথাটা বলেছি যা সত্য নয়?'

'কে কার কাছে টাকা ধার করে সে-বিষয়ে তোর স্মরণশক্তি যদি তীক্ষ্ণ হয় তাহ'লে কে কবে টাকা ফেরৎ দিলো সেটাও মনে রাখা তোর কর্তব্য।'

'তুই কী বলছিস আমি বুঝতে পারছি না।'

'আমাদের দু-জনেরই পরিচিত একজন মহিলাকে তুই কি বলিসনি যে শ্রীপতির কাছে আমি নিয়মিত টাকা ধার নিয়ে থাকি?'

'বাপ্স্! একেবারে উকিলের মতো জেরা করছিস যে!' দুর্গাদাস হাসলো। 'হ্যাঁ—বলেছি তো কী হয়েছে? ঠিক কথাই তো। আর কথাটা কিছু গোপনও নয়—আমরা সকলেই টাকা নিই শ্রীপতির কাছে, আর সকলে তা জানেও।'

'কিন্তু সকলের সঙ্গে আমার তফাৎ এই যে তারা অনেকেই ফেরৎ দেয় না, আর আমি দিই।'

'আমি শ্রীপতির অনেক টাকা ফেরৎ দিইনি, এই তো বলতে চাচ্ছিস? কিন্তু ওর সঙ্গে আমি যা পারি, তুই তো তা পারিস না।'

'যুক্তিটা ঠিক বোঝা গেলো না, দুর্গা। তুই যদি কারো কাছ থেকে দান নিতে আপত্তি না করিস সেটা তোর ব্যাপার, আমার নয়। কথাটা হচ্ছে আমার আত্মসম্মানজ্ঞান একটু অন্য রকম, আর তুই কারো কাছে আমার সম্মানহানি ঘটাবি, তা আমি সহ্য করবো না। ভবিষ্যতে একটু সাবধান হ'য়ে কথা বলিস।'

গৌতমের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে দুর্গাদাস ব'লে উঠলো, 'কী বাজে বকছিস! এই যে, তিনটে ঠাণ্ডা কফি এখানে।' হাতের একটা সহৃদয় ভঙ্গি ক'রে আবার বললো, 'ঝগড়াঝাঁটি একটুও ভালোবাসি না আমি। এমনিতেই যা অশান্তিতে আছি এখন।'

'অশান্তি কেন?' এবারে হিমেন্দু একটা কথা বলার সুযোগ পেলো।

'এই তো পরীক্ষা এসে যাচ্ছে, কিচ্ছু পড়া হয়নি—আর এর মধ্যে শ্রীপতির এই অসুখ।'

'তুই এবার পরীক্ষা দিচ্ছিস তাহ'লে?' হাসলো গৌতম।

'তা-ই তো ভেবেছিলাম মনে-মনে, ফীও জমা দিয়েছিলাম। কিছু কে জানে শেষ পর্যন্ত—'

'এবারেও আবার ড্রপ করবি? তুই হাসালি, দুর্গাদাস!'

'বললাম তো, শ্রীপতির অসুখে এমন উদ্‌ভ্রান্ত লাগছে—'

'তা তুই পরীক্ষা না-দিলে শ্রীপতির আরোগ্যের সহায়তা হবে নাকি?'

'তা জানি না, কিন্তু বিশ্রী লাগছে আমার। শুনছি অসুখটা বেশ এগিয়েও গেছে।'

হিমেন্দু জিগেস করলো, 'শ্রীপতিবাবু কি সে-বাড়িতেই আছেন?'

'না, না, এ-অবস্থায় কি সেখানে ফেলে রাখা যায় ওকে? কাকাবাবু ওকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এসেছেন।'

'কে?' জিগেস করলো গৌতম।

'কেশব মৈত্র। আরতির বাবা।'

'শ্রীপতি এখন তাদের বাড়িতে?'

'সেই যেদিন আমরা সবাই মিলে কাকাবাবুকে শ্রীপতির কাছে নিয়ে গেলাম, তার পরের দিনই এক্স-রে করানো হ'লো, আর এক্স-রে প্লেট দেখে কাকাবাবুর মুখের যা চেহারা হ'লো তা

আর কী বলবো। 'সেই রাত্তিরেই ওঁদের তেতলার ঘরে নিয়ে আসা হ'লো ওকে। তুই জানতিস না?'

খবরটা গৌতমকে অদ্ভুতভাবে বিচলিত করলো। আরতি বা তার বাড়ি সংক্রান্ত এমন একটা ঘটনা সে জানতো না, সেটা তাকে প্রথম দুর্গাদাসের মুখে শুনতে হচ্ছে, এতে তার আত্মাভিমানে আঘাত লাগলো। আসলে, সেদিন শ্রীপতির ঘরে ঐ বচসা হ'য়ে যাবার পর সেও মনে-মনে একটু রেগে গিয়েছিলো, মাঝে এ-ক'দিন দেখা করেনি আরতির সঙ্গে, এমনকি আরতির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার কথাও ভাবেনি তা নয়। কিন্তু শ্রীপতি ঐ বাড়িতেই আছে, এ-খবর শোনামাত্র আরতিকে ছিনিয়ে নেবার, দখল ক'রে নেবার ইচ্ছেটা আবার তীব্র হ'য়ে উঠলো তার মনে। মনে হ'লো, এ-ক'দিন আরতিকে এড়িয়ে থেকে সে বড্ড ভুল করেছে, এক ভীষণ, বিপজ্জনক পথে পা দিয়েছে আরতি, সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারবে শুধু সে, গৌতম—তাই একটু চুপ ক'রে থেকে ভারিক্কি চালে বললো, 'আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম এ-ক'দিন। তা শ্রীপতির কি যক্ষ্মাই হয়েছে সত্যি, না কি ডায়াগনসিসে ভুল হয়েছে?'

খুব বিষণ্ণ সুরে দুর্গাদাস বললো, 'একজন স্পেশলিস্ট এসেও দেখে গেছেন। কাকাবাবুর ধরন-ধারনও গম্ভীর।'

'হুঁ, তা-ই নাকি? তা আজকাল তো স্পেসিফিক বেরিয়ে গেছে, খুব একটা দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। আমার কিন্তু অবাক লাগছে যে শ্রীপতির মতো স্বাধীনচেতা মানুষ অন্য একজনদের বাড়িতে এসে উঠতে আপত্তি করলো না।'

'ও আপত্তি করলেই বা শুনছে কে?' বললো দুর্গাদাস। 'অসুখটা কী তা ও নিজেই সন্দেহ করেছিলো নিশ্চয়ই—এখন নিশ্চিত জানার পর একেবারে চুপ ক'রে গেছে, ওর জন্যে যা-কিছু ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তা নিয়ে কোনো কথাই বলছে না।'

'তা ওকে হাসপাতালে সরানো হচ্ছে তো?'

'কলকাতার হাসপাতালের ওপর তেমন আস্থা নেই কাকাবাবুর। ওঁর তেতলার ঘরটিকেই হাসপাতালের কেবিন ক'রে তুলেছেন শ্রীপতির জন্য।'

'সে কী!' গৌতম পিঠ খাড়া ক'রে গলা বাড়িয়ে দিলো দুর্গাদাসের দিকে। 'বলছিস কী তুই? ঐ বাড়িতেই রাখা হবে শ্রীপতিকে? ফ্যানটা-স্টিক! কেশব মৈত্রর কি মাথা-খারাপ হয়েছে?'

'দেখতে পাচ্ছি কেশব মৈত্র খুবই অন্যায় করেছেন তোর সঙ্গে পরামর্শ না-ক'রে।'

দুর্গাদাসের এই ব্যঙ্গে একটুও অপ্রতিভ হ'লো না গৌতম, একই রকম সুরে বলতে লাগলো, 'আমি কল্পনা করতে পারি না যে ও-রকম সাংঘাতিক ছোঁয়াচে অসুখের রোগীকে—'

'ও—সে-কথা! তা তোর অত ভয় থাকলে তুই না-হয় আর যাস না ও-বাড়িতে—তাহ'লেই হ'লো।'

'তোর বা আমার কথা হচ্ছে না—কিন্তু ও-বাড়িতেই আরো লোক আছে তো।'

'আরতির কথা ভাবছিস? তা আরতি বেশ আনন্দে আছে—'

'আনন্দে! তার মানে?'

'মানে, আরতির ভাবটা এই রকম যেন এতদিনে খুব মনের মতো একটা কাজ পেয়েছে। এই বেরোচ্ছে রোগীর জন্য কিছু কিনতে-টিনতে, এই টেলিফোন করছে, এই তেতলার ঘরের জানলার পর্দা বদলে দিচ্ছে—এখন ঝোঁক চেপেছে ছাতে টব সাজিয়ে বাগান করবে।'

গৌতমের মুখে গাঢ় হ'য়ে ছায়া পড়লো। বিড়বিড় ক'রে বললো, 'তাহ'লে এই ব্যাপার!' তারপর, একটু চুপ ক'রে থেকে, যেন নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে অনেকটা স্বাভাবিক গলায় বললো, 'ব্যাপারটার আর-একটা দিক আছে, তা আমাদের ভাবা উচিত। চিকিৎসার খরচ।'

'তার জন্য তোকে ভাবতে হবে না।'

'তুই বলছিস একা কেশব মৈত্রর ওপর এত বড়ো একটা ভার আমরা চাপিয়ে দেবো ?'

'থাম তো তুই — সব ব্যাপারে ফোঁপরদালালি করিস না।'

'আশ্চর্য — আমরা যারা শ্রীপতির বন্ধু, আমাদের কি ওর জন্য কিছু করার নেই ? আপনি কী বলেন, হিমেন্দু ?'

হিমেন্দু একবার কেশে দ্বিধান্বিতভাবে জবাব দিলো, 'তা — আপনি কী বলেন ? কী করা যায় ?'

'আমরা চাঁদা তুলতে পারি নিজেদের মধ্যে, কলেজগুলো খুললে একটা চ্যারিটি-শো করতে পারি ওর চিকিৎসার জন্য — চেষ্টা করতে পারি ওকে ভালো কোনো স্যানাটরিয়মে পাঠাতে — অনেক কিছুই করতে পারি। তোর তো এ-সব হৈ-চৈ বেশ আসে, দুর্গাদাস — লেগে যা না।'

'আমার মনে হয় না এ-সবের কোনো দরকার হবে। এ-সব ওঁরা পছন্দ করবেন বলেও মনে হয় না।'

'ওঁরা মানে — ঐ মৈত্র পরিবার ?'

গৌতমের ভুরু কুঁচকে গেলো, চোখের মণি দুটি ছোটো দেখালো একটু, পালিশ-করা বিষাক্ত গলায় সে ব'লে উঠলো, 'কিন্তু আমাদের বন্ধুর জন্য আমরা কী করবো বা না করবো তার জন্য কেশব মৈত্র বা তাঁর কন্যার অনুমতি নিতে আমরা তো বাধ্য নই। শ্রীপতি যেন তাঁদেরই সম্পত্তি, তার ভালো-মন্দ সব-কিছুর জন্য শুধু তাঁরাই দায়ী, তাঁদের মনের এই ভাবটা আসে কোথেকে জানতে পারি কি ? শ্রীপতি ও-বাড়ির ছেলেও নয়, আত্মীয়ও নয়, তার জন্য বাড়িসুদ্ধু লোক হৈ-চৈ বাধাবেন — এটাকে আর যা-ই হোক যুক্তিসংগত বলে না।'

'ব্যবস্থা তো ভালো হয়েছে, তাহ'লেই হ'লো। এবার অন্য কথা বল।'

'ব্যবস্থা যে-রকমই হোক,' দুর্গাদাসের দিকে এক পলক তাকিয়ে গৌতম বলতে লাগলো, 'সেটা কী-ভাবে হয়েছে তাও দেখতে হবে আমাদের। তাকেই ভালো ব্যবস্থা বলে যার পেছনে আছে মানুষের বুদ্ধি, বিবেচনা, মাত্রাজ্ঞান। কিন্তু তোমরা — তুমি, মৈত্রমশাই, আর তাঁর কন্যা — এই তোমাদের যা ব্যাপার দেখছি তা নেহাৎই সেন্টিমেণ্টল, উচ্ছ্বাসের ফেনা — মাত্রাজ্ঞান দূরে থাক, কোনো কাণ্ডজ্ঞানেরও পরিচয় নেই তাতে। একজনের অসুখ করেছে, শক্ত আর ছোঁয়াচে ব্যামো, রোগীর কিছুই টাকা নেই অথচ চিকিৎসার খরচ অনেক — এ-অবস্থায় তার বন্ধুবান্ধব হিতৈষীদের কর্তব্য কী? এমন কোনো ব্যবস্থা করা — যাতে সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হয়, আর রোগ ছড়াবার আশঙ্কাও না থাকে — অর্থাৎ, হাসপাতাল। চিকিৎসার খরচ অনেকে মিলে ভাগ ক'রে নিলে সকলের পক্ষেই সহজ হয়, আর রোগীকেও বাকি জন্মের মতো আকণ্ঠ ঋণী ক'রে রাখা হয় না শুধু একজনের বা একটি পরিবারের কাছে। এই সবই ভাবা উচিত ছিলো, এখনো নতুন ক'রে ভাবার সময় নেই তা নয়। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে দুর্বলচিত্ত স্ত্রীলোকের মতো বড্ড বেশি অস্থির হচ্ছো তোমরা, বুদ্ধিমান পুরুষমানুষের মতো কাজ করছো না; কোনো বিপদের সময় সবচেয়ে বেশি যা দরকার সেই সংযমে জলাঞ্জলি দিয়েছো, বুদ্ধি তোমাদের এত ঝাপসা হ'য়ে গিয়েছে যে কিসে শ্রীপতির সত্যিকার ভালো হবে তাও বুঝতে পারছো না। এই তো তুমি, দুর্গাদাস, একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক — তুমি বলছো শ্রীপতির অসুখে তুমি এত উদ্‌ভ্রান্ত যে পরীক্ষার পড়া তৈরি করা তোমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। একবার ভেবে দেখছো না যে এ-দুটো বিষয়ের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ নেই, যে তুমি রোজ চোদ্দ ঘণ্টা ক'রে পড়লেও ওর অসুখ যেদিন সারবার সেদিনই সারবে, আর যদি না-সারবার হয় তাহ'লে তুমি ব্যাকুল হ'য়ে বুক চাপড়ালেও কোনো সুবিধে হবে না। রোগীর শুশ্রূষার জন্য

তোমার ডাক পড়েনি, তোমার কিছুই করার নেই এ-ব্যাপারে, অনর্থক তুমি নিজের সময় নষ্ট করছো, নিজের যেটুকু উপকার করতে পারো তারও সুযোগ নিজেকে দিচ্ছো না। তেমনি — ঐ যে বললে আরতি "আনন্দে" আছে, ছুটোছুটি করছে কারণে অকারণে, ছাদে বাগান করার স্বপ্ন দেখছে — এগুলো আমার কানে রীতিমতো শকিং শোনালো, অতি বাজে ধরনের রোমান্টিক — সত্যি ব্যাপারটা কী, সে-বিষয়ে কোনো ধারণাই এতে দেখা যায় না। একজন অসুস্থ মানুষের ভালো করা নয় — আমরা কারো জন্য কিছু করছি, আত্মত্যাগ করছি, সেই ভাবটাই বড়ো হ'য়ে উঠছে, আর এমনিতর ভাবালুতার জন্যই আমাদের দেশের আজ এই অবস্থা।'

'আমার পক্ষে গুরুপাক হ'য়ে যাচ্ছে, গৌতম,' হালকা গলায় হাসলো দুর্গাদাস, 'এক দমকে এতটা উপদেশ হজম হবে না। আমি চলি। — এই যে, দামটা নিয়ে যাও।'

পকেটে হাত দিয়ে গৌতম বললো, 'দামটা আমারই দেবার কথা, দুর্গা।'

'একই কথা —' বিল চুকিয়ে দুর্গাদাস উঠে দাঁড়ালো।

হিমেন্দু তাড়াতাড়ি বললো, 'আমাকেও যেতে হবে।' এতক্ষণ নেহাৎ ভদ্রতা ক'রেই ব'সে ছিলো সে, উঠে পড়ার সুযোগ পেয়ে খুশি হ'লো। 'দুর্গাদাস কোনদিকে?'

'আমি একটু আরতিদের ওখানে যাচ্ছি। তুমি?'

'আমিও ঐদিকেই যাবো ভাবছিলাম। মানিকতলার মোড়ে যে-পুরোনো বইয়ের দোকানটা আছে —'

'তাহ'লে চলো একসঙ্গে যাই। যদি দশ মিনিট বেণীমাধব মল্লিক রোডে থামতে তোমার আপত্তি না থাকে তাহ'লে আমিও বইয়ের দোকানে তোমার সঙ্গী হ'তে পারি।'

'আমি — আমি ও-বাড়িতে গিয়ে কী করবো? তুমি পরে বরং —'

'আরে চলো না!'

আরতির সঙ্গে সেই টেলিফোনের আলাপ হিমেন্দুর মনে প'ড়ে গেলো। 'একদিন আসেন তো খুশি হবো—আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে।' নেহাৎই ভদ্রতা অবশ্য, কিন্তু মুখ ফুটে অতটাই যখন বলেছিলো তখন একদিন বোধহয় যাওয়াই উচিত। আর সেই সঙ্গে শ্রীপতির খোঁজটাও নিয়ে আসা যায়।

'বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে না?' ক্ষীণ আপত্তি করলো হিমেন্দু।

'এই তো মাত্র বারোটা—একটা-দেড়টার আগে খাওয়া হয় না ও-বাড়িতে। গৌতম এখন বাড়ির দিকে?—না কফি-হাউসে বসবে আর-একটু?'

'চল আমিও যাই তোদের সঙ্গে—আরতির সঙ্গে একটু দরকার আছে আমার।'

'ওকে সংশোধন করতে চাস তো? দ্যাখ চেষ্টা ক'রে।'

দুর্গাদাসের এই মন্তব্যটি নিঃশব্দে উপেক্ষা করলো গৌতম, বিপুল গাম্ভীর্য নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ভেবেছিলো আজ বিকেলের দিকে যাবে—কিন্তু আরতিকে বলার কথাগুলো তার মনের মধ্যে এমনভাবে ঠেলে-ঠেলে উঠছে যে অতগুলো ঘণ্টা অপেক্ষা করা অসম্ভব ব'লে মনে হ'লো সেই মুহূর্তে। এই তো—কয়েকদিন সে একটু আড়ালে ছিলো, আর তার অনুপস্থিতির সুযোগে কী একটা কাণ্ড ক'রে ফেললো আরতি, এক যক্ষ্মারোগীকে নিজের বাড়িতে এনে তুললো। বোকামি! পাগলামি! কিন্তু সে কাছাকাছি থাকলেও এই পাগলামি থেকে বিরত করতে পারতো কি আরতিকে? কথাটা সে যতবার ভাবছে ততবার জ্বালা ক'রে উঠছে মনের মধ্যে। আরতির ওপরে শ্রীপতির প্রভাব যে খুব জোরালো, এই কথাটা সে স্পষ্ট বুঝে নিয়েছিলো সেদিন, আর এও বুঝেছিলো যে শ্রীপতির প্রভাব তার নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে অনুকূল হবে না। ওরা দু-জন যে একই বাড়িতে বাস করছে এই চিন্তা এখন অসহ্য লাগছে তার, মনে হচ্ছে আরতির মনে এখন যে-সব বিকৃত

ধারণা জন্ম নিতে পারে তা যক্ষ্মার বীজাণুর চেয়েও ভয়াবহ। এখন তার কর্তব্য—এই 'কর্তব্য' কথাটাকে খুব ভালোবাসে গৌতম—আরতিকে রক্ষা করার জন্য উঠে-প'ড়ে লাগা, এমনকি আত্মাভিমান পর্যন্ত ভুলে গিয়ে আরতির ভালোর জন্য চেষ্টা করা, যাতে নিজেকে নষ্ট না করে সে, শেষ পর্যন্ত সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন জীবন বেছে নেয়। 'নষ্ট', 'সুস্থ', 'পরিচ্ছন্ন'—এই বিশেষণগুলি বার-বার যাওয়া-আসা করছে গৌতমের মনে, যে-বিপদ এতদিন শুধু আনুমানিক ছিলো এখন তা যেন স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, তার তপ্ত মস্তিষ্কে বেড়ে উঠতে লাগলো মিনিটে-মিনিটে। আজ—এখনই—এখনই এর একটা নিষ্পত্তি তাকে ক'রে ফেলতে হবে।

মিনিট দশেক পরে তিনজনে বাস্‌ থেকে নামলো হেদোর মোড়ে। তখন তপ্ত বেলা, রোদ্দুর যেন চাবুক মারছে শহরটাকে।

*

দোতলায় বসার ঘর, জানলা ভেজানো, পাখার হাওয়ায় সুশীতল। এক কোণে নিচু আওয়াজে রেডিও চলছে, আবহাওয়াটি শান্ত ও নিরিবিলি। হাতের মাসিকপত্র নামিয়ে রেখে যে-মেয়েটি এগিয়ে এলো তাকে আরতি ব'লে চিনতে একটু সময় লাগলো হিমেন্দুর। স্নান ক'রে এসেছে একটু আগে, পরনে বেগনি পাড়ের শাদা শাড়ি—আজ যেন ছোটো দেখাচ্ছে তাকে, আকারেও ছোটো, বয়সেও ছেলেমানুষ।

'এই যে, হিমেন্দু এসেছেন। খুব ভালো। আমি কিন্তু বন্দনাকেও আশা করেছিলাম।'

'আমি—আমি হঠাৎ চ'লে এলাম এদের সঙ্গে। শ্রীপতির অসুখ শুনলাম। কেমন আছে?'

'ভালোই,' সংক্ষেপে জবাব দিলো আরতি। 'তা গৌতম, তোমার কী খবর? মাঝে তোমাকে দেখিনি কয়েকদিন?'

ঘরে ঢোকামাত্র আরতিকে অমন শান্ত ও সুখীভাবে ব'সে

থাকতে দেখে (রেডিও খুলে, মাসিকপত্র হাতে নিয়ে, যেন দুশ্চিন্তা করার কিছুই নেই !) গৌতমের মেজাজ আরো চ'ড়ে গিয়েছিলো, কিন্তু উদ্যত ক্রোধ চাপা দিয়ে হালকা সুরে বললো, 'শ্রীপতির সঙ্গে একবার দেখা হ'তে পারে কি ?'

'নিশ্চয়ই — যদি সকাল ন-টায় আসো কোনোদিন, নয়তো বিকেল পাঁচটা নাগাদ ।'

'কড়া হুকুম ?'

'ডাক্তারের হুকুম । নড়চড় হবার জো নেই ।'

'তোমাদের পক্ষেও না ?' বাঁকা হাসলো গৌতম ।

' "আমরা" মানে কী ? আমি তেতলার ঘরে কমই যাই, কারো অসুখ দেখতে ভালো লাগে না আমার । আর দোহাই তোমাদের — এ-বাড়িতে শ্রীপতি অসুস্থ হ'য়ে আছে ব'লে তোমরাও হাঁড়িমুখ ক'রে থেকো না । বোসো — কথাবার্তা বলা যাক । হিমেন্দু দাঁড়িয়ে কেন ?'

দরজার বাইরে করিডরে এক আলমারি বই হিমেন্দুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো, সসংকোচে বললো, 'আপনার বইগুলো একটু দেখতে পারি কি ?'

'নিশ্চয়ই । বইগুলো ঠিক আমার নয় অবশ্য —'

'কোনো অসুবিধে হবে না ?'

'না, না, অসুবিধে কী — আসুন ।' আরতির সঙ্গে করিডরে আসামাত্র হিমেন্দুর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো । — 'খুব ভালো-ভালো বই দেখছি ।'

আলমারি খুলে দিলো আরতি । 'আপনার যেটা ইচ্ছে পড়তে নিতে পারেন । আচ্ছা, আপনি দেখুন — আমরা পাশের ঘরে আছি ।'

হিমেন্দু দেখলো, অনেকগুলো বইয়ে শ্রীপতির নাম লেখা, পাশে আরতির, কোনো-কোনোটায় শুধু আরতির নাম, কিন্তু হাতের লেখাটা

শ্রীপতির ব'লে মনে হ'লো, কোনো-কোনোটায় আরতি লিখে রেখেছে শ্রীপতির নাম। ঐ লেখাগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে একটা রঙিন গল্প শুনতে পেলো হিমেন্দু, মুহূর্তের জন্য উন্মন হ'লো, মনে হ'লো ভালোবাসবার ও ভালোবাসা পাবার মতো ভালো জিনিশ জীবনে আর-কিছু নেই। কিন্তু একটু পরেই ছাপার অক্ষরের প্রলোভনে তার ব্যক্তিগত ইচ্ছে সে ভুলে গেলো।

ঘরে এসে আরতি দেখলো, দুর্গাদাস আর গৌতম পাশাপাশি সোফায় ব'সে আছে। তাদের মুখোমুখি ব'সে আধো কৌতুকের সুরে আধো গম্ভীরভাবে বললো, 'আমি গৌতমকে একটা কথা বলতে চাই।'

'আমি কি উঠে যাবো এখান থেকে?' হাসলো দুর্গাদাস।

'না, না, তোমার থাকাই ভালো। তোমার সামনেই পরীক্ষাটা হ'য়ে যাক।'

'পরীক্ষা?'

'হ্যাঁ, পরীক্ষা। গৌতমকে নিয়ে।'

গৌতম একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো আরতির দিকে।

'গৌতম, আমি তোমাকে সেদিন যা বলেছিলাম তা বিশ্বাস করোনি বোধহয়?'

'আমাকে বলছো?' গৌতম দাঁত দেখিয়ে হাসলো। 'কোনদিন? কী বলেছিলে বলো তো?'

'ও, ভুলে গেছো? আমি মনে করিয়ে দেবো?' আরতি গৌতমের চোখে চোখ রাখলো।

কফি-হাউস থেকে মনের যে-ভাব নিয়ে গৌতম বেরিয়েছিলো, ইতিমধ্যে তার একটু বদল হয়েছে, আরতির সঙ্গে মুখোমুখি আবার ঝগড়া করতে সে চায় না — অন্তত এক্ষুনি নয়, এখানে নয়। তাই সে নরম ক'রে বললো, 'আমি এখন তর্ক করতে আসিনি, শ্রীপতির কথা বলতে এসেছিলাম। আমি ধারণাও করিনি ওর অসুখটা এত সাংঘাতিক—'

'অসুখের কথা থাক,' আরতি বাধা দিলো গৌতমের কথায়। 'আমি যা বলছি শোনো। একটা ছোট্ট পরীক্ষা নিতে চাই তোমার — যদি তাতে উৎরে যাও তাহ'লে তুমি যা বলবে আমি তা-ই করবো। রাজি ?'

গৌতম উদাসীনভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো গোল ক'রে। ভেতরে-ভেতরে কাৎরাচ্ছিলো সে, তাকে হেনস্তা করার জন্য আরতি আবার কী-ফন্দি এঁটেছে তা আড়চোখে বুঝে নেবার চেষ্টা করছিলো, কিন্তু মুখের ভাবটি তার এই রকম যেন এ-সবে তার কিছুই এসে যায় না, তার উদাসীনতা এতই গভীর যে আরতিকে বাধা দেবারও কোনো চেষ্টা করছে না সে। যদি পদে-পদে হিশেব ক'রে চলাটা তার অভ্যেস না হ'তো, তাহ'লে সে এক্ষুনি এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে সহজভাবে নিশ্বাস নিতে পারতো, কিংবা আরতিকে মনে-মনে যা বলছে তার কিছু অংশ মুখে উচ্চারণ ক'রে মনের ভার লাঘব করতে পারতো — কিন্তু কিছুতেই নিজেকে সে এমন-কিছু করতে দেবে না যাতে মনে হয় সে ভয় পেয়েছে বা রণে ভঙ্গ দিচ্ছে বা নিজের ওপর আর শাসন বজায় রাখতে পারছে না। মুখোমুখি হ'তে পারাটাই তার মতে এক রকমের নৈতিক জয় ; সে তাই অনেক আগেই মনে-মনে ঠিক ক'রে নিয়েছিলো যে আরতি যদি নির্লজ্জ হয় সে আরো বেশি নির্লজ্জ হ'য়ে তাকে হারিয়ে দেবে।

উঠে গিয়ে একটি বড়ো ফোটোগ্রাফ নিয়ে এলো আরতি। গৌতমের কাছে দাঁড়িয়ে বললো, 'গৌতম, এই ছবিটা তোমাকে দেখাতে চাই।'

দূর থেকে এক ঝলক দেখেই ছবিটা চিনতে পেরেছিলো গৌতম ; শক্ত মুখে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলো।

'বাঃ! দ্যাখো না! এদিকে তাকাও। হাতে নিয়ে দ্যাখো! এই সেদিনও এত ভালোবাসতে, আর এখন ছবি দেখলেও মুখ ফিরিয়ে নাও ?'

'অসহ্য!' গৌতম লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, রুমালে একবার মুখ মুছে বললো, 'যদি ভেবে থাকো, আরতি, যে এমনি নির্যাতন ক'রে আমার হাত থেকে রেহাই পাবে তাহ'লে ভুল করেছো। এক-এক ধরনের প্রতিশোধ আছে যা পুরুষ কিছুতেই নিতে পারে না, তা জেনেই তুমি এই সুবিধে নিচ্ছো আমার ওপর। ধরো, আমি যদি এর উত্তরে তোমার অতীত ঘাঁটতে শুরু ক'রে দিই, কিংবা তোমার বর্তমানেরই বিশ্লেষণ করি, তাহ'লে তোমার দাঁড়াবার জায়গা কোথায় থাকে? সত্যি কথা, আমি একজনকে ছেড়ে আর-একজনের দিকে ছুটেছি, কিন্তু তোমার মতো একসঙ্গে দশজনকে নিয়ে—' হঠাৎ থেমে গেলো গৌতম।

ঝকঝকে চোখে গৌতমের দিকে তাকালো আরতি।—'থামলে কেন? বলো।'

'বলছিলাম—একজনের হাতে হাত রেখে বেড়ানো, আর-একজনকে প্রেমপত্র লেখা—এ-সব অন্তত আমার মাথায় আসে না!'

'প্রেমপত্র আবার কাকে লিখলাম? ও—' আরতি নিচু গলায় হেসে উঠলো, 'শ্রীপতি সেদিন যে-চিঠির কথা বলছিলো সেটা ভোলোনি দেখছি। যেহেতু তুমি চিঠিটা দ্যাখোনি, তাই সেটাকে প্রেমপত্র ব'লে ধ'রে নিলে? বেশ, যদি প্রেমপত্র হয়, তা নিয়েই বা তুমি কথা বলার কে? আমি তো তোমাকে এমন কথা দিইনি যে কাউকে কোনো চিঠি লিখবো না! দেখছো দুর্গাদাস, তোমাদের বন্ধুর ব্যবহার দেখছো? এর হাতে যে-মেয়ে পড়বে তার দুর্দশা ভেবে কি কষ্ট হচ্ছে না তোমার?'

'কী বাজে—!' দুর্গাদাস হাত নাড়লো, 'তোমাদের এ-সব ঝগড়া-ঝাটিগুলো লোকের সামনে না-ক'রে পারো না? আর যদি এমন হয় যে তোমাদের দেখা হ'লেই ঝগড়া বেধে যায় তাহ'লে তোমরা বাপু হয় বিয়ে ক'রে ফ্যালো, নয় মুখ-দেখাদেখি বন্ধ ক'রে

দাও — আমি সোজা কথা যা বুঝি বললাম। এ-রকম ভাবে ঝুলিয়ে রাখাটা খুব বিশ্রী হচ্ছে।'

'ঠিক!' ছোট্ট তালি দিয়ে আরতি বললো। 'দুর্গাদাস ঠিক কথা বলেছে। এখন কথাটা হচ্ছে: কে কাকে ঝুলিয়ে রাখছে? গৌতম, তুমি আমাকে খারাপ ব'লে জেনেও বিয়ে করতে চাচ্ছো কেন তা বলতে পারো কি? না কি এখন আর চাচ্ছো না? যদি এই ক-দিনে তোমার মনের বদল হ'য়ে থাকে তাহ'লে বলো — ব'লে ঐ সিঁড়ি দিয়ে আস্তে-আস্তে নেমে যাও, আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে এই ছবিটাকে আবার দেরাজে তুলে ফেলি। কিন্তু যদি তুমি না যাও, গৌতম, যদি এর পরেও বীরের মতো দাঁড়িয়ে থাকো, তাহ'লে আমি বুঝবো আমার বিষয়ে তোমার অভিপ্রায় একই আছে, আর তাহ'লে তোমাকে ছোট্ট একটা পরীক্ষা ক'রে নেবো — এখনই! কী, কিছু বলছো না?'

বলতে-বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠলো আরতি, গৌতমের ঠিক মুখোমুখি দাঁড়ালো। একটি উষ্ণ আভা ছড়িয়ে পড়েছে তার মুখে, তার ঘন নিশ্বাসের হাওয়া গৌতমকে ছুঁয়ে যাচ্ছে যেন। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার কামনার ঢেউ উঠলো গৌতমের বুকে, মনে হ'লো ঐ শরীরটাকে কাছে পাবার জন্য কিছু নেই যা সে করতে না পারে। দুই হাত বুকের ওপর জোড় ক'রে দৃঢ়তার সঙ্গে বললো 'বেশ। পরীক্ষা করো। আমি পালাচ্ছি না।'

'রাজি?' খুশিতে জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো আরতি, দুর্গাদাসের দিকে ফিরে বললো, 'এই ছবিটা তুমি আগে দেখেছিলে, দুর্গাদাস?

'ঠিক বুঝতে পারছি না, দেখি—' হাত বাড়িয়ে ছবিটা কাছে নিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে দেখতে লাগলো দুর্গাদাস — 'বাঃ, বেশ তো! সুন্দর ছবি। না, আগে দেখেছি ব'লে মনে পড়ছে না। কবেকার তোলা এটা?'

'আমার সঙ্গে বন্দনার খুব বন্ধুতা ছিলো তখন।'

'বুঝেছি। তা ছবিতে আরো ভালো দেখাচ্ছে বন্দনাকে—তা-ই না?' হাত বাড়িয়ে ছবিটাকে একটু দূরে ধরলো দুর্গাদাস, আরো ভালো ক'রে দেখবে ব'লে।

দু-খানা বই হাতে ক'রে ঘরে এলো হিমেন্দু; থমকে দাঁড়ালো হঠাৎ। ঐ ছবি কেন দুর্গাদাসের হাতে? একটু আগে বন্দনার নাম কানে এলো না? কী হচ্ছিলো এখানে? কী হচ্ছে? আবার কোনো প্রণয়কলহ? ব্যাপারটা বোঝার জন্য একজন থেকে অন্যজনের মুখের দিকে সে তাকালো, আর তারপর আরতিকে যা বলতে শুনলো তা যেন বিদ্যুতের মতো আঘাত করলো তার শরীরে।

—'একটা ছোট্ট কাজ করবে, গৌতম? এই ছবিটাকে মেঝেতে ফেলে তিনবার লাথি মারবে?'

গৌতমের মুখ এমন টকটকে লাল হ'য়ে উঠলো যে তাকে প্রায় কালো দেখালো, আর দুর্গাদাস চেঁচিয়ে উঠলো, 'তুমি বলছো কী, আরতি?'

'বেশি কিছু না—এই ছবিটার ওপর তিনবার লাথি মারবে গৌতম। জানো তো, দুর্গাদাস, গৌতমের কোনো কুসংস্কার নেই, সে জানে এই ছবিটা এক টুকরো কাগজ মাত্র, নিষ্প্রাণ, জড় পদার্থ, অতএব ওটাকে মাড়িয়ে দিলে কী-বা এসে যায়। পা দিয়ে ফুটপাত মাড়িয়ে চলি আমরা, মাটির ঢেলা গুঁড়ো ক'রে দিই—তার সঙ্গে এই ছবিটার তো কিছু তফাৎ নেই। কোনো সত্যিকার ক্ষতিও হচ্ছে না—এটা নষ্ট হ'লে আরো অনেক কপি পাওয়া যাবে।—দাও আমাকে,' দুর্গাদাসের হাত থেকে ছবিটা নিয়ে মেঝের ওপর শুইয়ে দিলো আরতি, বন্দনার সুশ্রী মুখটি সীলিঙের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো—'গৌতম, কোথায়? তিনটি লাথি শুধু—আর তারপরেই তুমি রঙিন চিঠি ছাপতে দিতে পারো।'

'কী পাগলামি হচ্ছে, আরতি!' দুর্গাদাস হাত বাড়ালো ছবিটা

তুলে নিতে, কিন্তু আরতি দু-হাতে বাধা দিলো—'তোমাদের মতো মুর্গির কলজে নিয়ে গৌতম বর্ধন জন্মায়নি। দ্যাখো না, এখনই সে তার আশ্চর্য পৌরুষের প্রমাণ দেবে তোমাদের সামনে!'

একটু সময় কারো মুখে কথা নেই, ঘর স্তব্ধ। চশমার পেছনে হিমেন্দুর চোখ দুটো বড়ো-বড়ো হ'য়ে উঠেছে, আর সেই চোখ মেঝেতে শোয়ানো বন্দনার ছবি থেকে সে সরাতে পারছে না, তার মনে হচ্ছে এখনই দম বন্ধ হ'য়ে ম'রে যাবে সে। আর গৌতম দাঁড়িয়ে আছে হাতের মুঠো চেপে, ঘাড় বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম নামছে তার জামার তলায়, ব'য়ে যাচ্ছে শিরশির ক'রে মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে, অসহ্য গরমে তার গালের ওপর পিন ফুটছে যেন, তার সারা শরীর পাথরের মতো ভারি, একটি আঙুলও যেন নড়াতে পারছে না। মনে-মনে সে বলছে—'ছী-ছি, শেষটায় এই ফাঁদে আমি ধরা দিলাম!' আবার ভাবছে—'তাতে কী। আমি করবো, তা-ই করবো, আরতি আমাকে বোকা ভাবতে পারে মনে-মনে, কিন্তু এর পরে বিয়ে না-ক'রে তো পারবে না!'—কিন্তু যতবার সে পা তুলতে চেষ্টা করছে ততবার মনে হচ্ছে কে যেন তাকে পেরেক ঠুকে আটকে রেখেছে মেঝেতে।

কোমরে হাত রেখে, মাথাটি একটু পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে আরতি বললো, 'গৌতম, এসো। আমাকে লজ্জা দিয়ো না। এগিয়ে এসো। এত বুদ্ধি তোমার, এত যুক্তির তেজ, আর এই সহজ কাজটুকু পারবে না! পা তোলো, বলছি। তোলো পা!'

গৌতমের লম্বা শরীরে হঠাৎ উত্তাল একটা ভঙ্গি হ'লো, চোখ-মুখ হিংস্র হ'য়ে উঠলো তার, যেন কোনো বন্য জন্তু শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়ছে। শুধু তিনবার নয়, দশবার, কুড়িবার, পঞ্চাশবার লাথি মেরে-মেরে ছবিটাকে থেঁৎলে দিতে পারতো সে, কিন্তু সেই মুহূর্তে মেঝের ওপর উপুড় হ'য়ে পড়লো হিমেন্দু, ছবিটাকে বুকে চেপে ধ'রে মেঝেতে ব'সে প'ড়ে দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ ঢাকলো। একটা আর্তস্বর

বেরোলো তার গলা দিয়ে, কান্নার বেগে ফুলে উঠলো তার শরীর, কয়েক সেকেণ্ড বাদ দিয়ে-দিয়ে একটা চাপা কষ্টের শব্দ বেরোতে লাগলো তার গলা দিয়ে। তার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গৌতম হঠাৎ শূন্যে হাত ছুঁড়ে ব'লে উঠলো, 'তুমি আমাকে রক্ষা করলে, হিমেন্দু! তুমি আমাকে উদ্ধার করলে!' অদ্ভুত শোনালো তার কণ্ঠস্বর, যেন তার বাক্‌যন্ত্রের একটা অংশ বিকল হ'য়ে গেছে, কিংবা যেন সে পাগল হ'য়ে গেছে এই মুহূর্তে। দাঁতে দাঁত ঘ'ষে আবার বললো, 'ডাইনি! তোর মুখ আর দেখবো না!' নিচু হ'য়ে দুই হাতে হিমেন্দুকে টেনে তুললো, তাকে হাতে ধ'রে আস্তে নিয়ে গেলো দরজার দিকে। দু-জনে আর কোনো দিকে না-তাকিয়ে আস্তে-আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

ঠোঁটের কোণে কৌতুক নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো আরতি।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

আস্তে চলছিলো সে, স্টিয়ারিং হুইলে আলগোছে হাত রেখে, পিঠ এলিয়ে, মাঝে-মাঝে চোখ বুজে দু-চার সেকেণ্ড ঝিমিয়ে নিয়ে—তখন সবেমাত্র ভোর, ছায়া স'রে যাচ্ছে কেঁপে-কেঁপে, আলো-জ্বলা প্রথম ট্রামগুলো যাত্রীহীন, ফুটপাত ফাঁকা, আর রাস্তায় যাদের সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে তারা কাগজের হকার (তারই সমব্যবসায়ী বলা যায়)—সাইকেলে চেপে দিগ্বিদিকে ছুটছে, আজ একটা দিনের মতো দিন তাদের, একটা কাগজও ফেরৎ হবে না। শান্ত প'ড়ে আছে চৌরঙ্গি, তার অ্যাম্বাসেডর যেন হাওয়ায় ভেসে চলছে। একটু আগে জল দিয়ে গেছে রাস্তায়, অ্যাসফল্ট স্নিগ্ধ কালোবরন। ঝাপসা আলোয় রংটা ভালো লাগলো তার, এক ঝাঁক উপমা মগজের মধ্য দিয়ে উড়ে গেলো। মেঘের মতো—হাতির মতো—তালফলের মতো—গর্ভিণীর স্তনের বোঁটা ঘিরে যে-গোল, কালো প্রলেপটি পড়ে, তেমনি। কালিদাসে পড়া—চোখেও দেখেছিলো, ময়না যখন মা হ'তে চলেছে, যখন সে নতুন মা হ'লো। সারারাত ঘুমোয়নি, একটানা আঠারো ঘণ্টা আপিশে—আর এখন এই আলো-আঁধারি ভোর, অঘ্রানের শিরশিরে হাওয়া—খুব হালকা কোনো নেশার মতো। চমৎকার ভান—যেন পৃথিবীটা সুন্দর, যেন নতুন দিন মানুষের জন্য আনন্দ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কতক্ষণ? আর দেড় ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা : তারপরেই শহর উতরোল, কর্কশ দিন, গরম তর্ক ঘরে-ঘরে। কিন্তু তার কোনো অংশ নেই ও-সবে ; তার উত্তেজনা সে আপিশে রেখে এসেছে। পশ্চিম-বাংলার মন্ত্রীসভায় সংকট—দল, উপদল, টুকরো-দল, জোড়া দেবার চেষ্টা,

ভেঙে দেবার চেষ্টা, ছিঁড়ে যাবার টান — এ-সব নিয়েই ছিলো সে এতক্ষণ, একটানা আঠারো ঘণ্টা — প্রায়। দু-বার বেরিয়েছিলো শুধু একটু আত্মিক উজ্জীবনের জন্য — চটপট একটা-দুটো গিলেই আবার আপিশ : এ-রকম একটা সময়ে, যখন এই ঘটনাময়ী কলকাতাতে আরো একটা বড়ো খবর তৈরি হচ্ছে, তখন সে হাজির না-থাকলে চলবে কেন — কে সাজাবে খবরগুলোকে আরো বেশি চমকপ্রদ ক'রে, কে জোগাবে লঙ্কা-ঝাল-মিষ্টি-মেশানো চাটনি — দু-দিক বাঁচিয়ে, চারদিক বাঁচিয়ে, দশ দিক বাঁচিয়ে কে লিখবে এডিটরিয়েল — সে ছাড়া — সে, শ্রীপতি ভদ্র, সাংবাদিকতার এক তথাকথিত টেক্কা তাস, 'সুপ্রভাত'-এর বার্তা-সম্পাদক, সাড়ে-চার লক্ষ স্বদেশবাসীর প্রভাতী আফিঙের জোগানদার ?

'বার্তা কী ?' 'কাল প্রাণীসমূহকে রান্না করছে, রাত্রি দিন তার ইন্ধন, মাস ঋতু তার হাতাখুন্তি। এ-ই বার্তা।' আমরা নিজেরাই নিজেদের আহার করছি। — কিন্তু কোনো আসল খবর কাগজে বেরোয় না, তা লুকিয়ে থাকে আমাদের মনের মধ্যে, বুকের তলায়, যদি না দৈবে ধরা পড়ে কোনো কবিতায়, গানে, উপন্যাসে। কেন একটা উপন্যাস লেখো না, শ্রীপতি, আর-একটা, শেষবারের মতো ? খুব সহজে আরম্ভ ক'রে দাও : 'হঠাৎ বহুদিন পরে তার সঙ্গে আমার দেখা হ'য়ে গেলো।' বা — 'হঠাৎ বহুদিন পরে দেখা হ'য়ে গেলো জয়ন্তীর সঙ্গে সুব্রতর।' জয়ন্তী ? সুব্রত ? বড্ড সাধারণ হ'য়ে গেলো না নাম দুটো ? তা হ'লোই বা, নাম নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট কোরো না, আরম্ভ ক'রে দাও। প্রথম বাক্য ··· দ্বিতীয় ··· তৃতীয় ··· প্রথম প্যারাগ্রাফ ··· আস্তে-আস্তে এগিয়ে যাও এমনি ক'রে। অদ্ভুত : আপিশে আমার কলম যেন তুরঙ্গম, কিন্তু অন্য কিছু লিখতে গেলেই তা কচ্ছপের গতি পায়। তা হোক : রোজ তিন — দুই — এক পৃষ্ঠা, তা তো হ'তে পারে ? রোজ এক পৃষ্ঠা হ'লেও ছ-মাসে শেষ হ'য়ে যায় — মাত্র ছ-মাস। শুধু মনে একটু জোর আনো, শ্রীপতি,

বিশ্বাস আনো নিজের ওপর, নতুন-বিয়ে-হওয়া যুবকের মতো আগে থেকেই ভয় পেয়ো না, ভয় পেলে সমর্থ লোকেরও তাক ফশকে যায়। তাছাড়া, এটা নিয়ে তেমন মুশকিলও নেই তোমার, কেননা এর আরম্ভ এখন অতীত, তাই তোমার জানা, আর এর কোথায় শেষ তাও তোমার অজানা নয়, কেননা এটা তোমার নিজেরই জীবন। অজানা নয় কেন? আমি কি জানি কাল আমার কী হবে? আমি কি জানি আর দু-মিনিট পরে একটা দোতলা বাস্ আমাকে ইঁদুরের মতো থেঁৎলে দেবে না? অন্তত এটুকু জানো যে তুমি এখন শান-বাঁধানো শড়ক দিয়ে চলেছো—এই চৌরঙ্গিরই মতো কোনো রাস্তা ধরা যাক—কোথাও আর এবড়োখেবড়ো নেই, নেই ডাইনে-বাঁয়ে অলিগলির আবছায়া—মানে, তোমার জীবনে আর নতুন কিছু ঘটবে না। তা-ই লেখো, সেটাও উপন্যাসের বিষয় হ'তে পারে।—কিন্তু, তা-ই যদি, তাহ'লে··· আবার কেন দেখা হ'লো?

বাঁয়ে বেঁকলো শ্রীপতি, পার্ক স্ট্রিটে পুবের আকাশ লাল, একটি সোনালি তীর হঠাৎ এসে বিঁধলো তার চোখে, তার গাড়ির কাচে ঝিলিক তুলে মিলিয়ে গেলো। এমনি এক মুহূর্তে উপন্যাসটা শুরু হ'তে পারে; আমার নায়ক (চলতি বুলিতে অপনায়ক) আঠারো ঘণ্টা আপিশে কাটিয়ে এইমাত্র বেরিয়েছে, রাত জেগে হালকা তার শরীর, চোখ অলস, যান্ত্রিক হাতে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছে। আশ্চর্য—তাহ'লে বাড়ি ব'লে কিছু আছে তার, নিজের গাড়িও আছে? সে নয় আর এক অনিশ্চিত, অস্থির যুবক যার সহ্য হচ্ছে না জীবন, অথচ যে মৃত্যুকেও ভয় পায়? তার কি বৌ আছে ঘরে: নাম কী? দেখতে কেমন? ও-সব পরে হবে, আগে আসল ব্যাপারটা ঠিক করা যাক: কখন দেখা হবে নায়িকার সঙ্গে (সে কিন্তু অপনায়িকা নয়)—কোথায় দেখা হবে? ধরা যাক সকাল থেকে অনেক কিছু করলো সে: বাড়িতে বৌয়ের

সঙ্গে গতানুগতিক ঘণ্টখানেক, এক বন্ধুর বাড়িতে গতানুগতিক আড্ডা, আপিশে ব'সে লিখলো একটি গতানুগতিক এডিটরিয়েল, তারপর গতানুগতিক নিউ-ব্রিস্টল—তারপর—সন্ধের পরে—কোথায়?

হঠাৎ আমি তাকে দেখতে পেলাম—অন্তত তা-ই মনে হ'লো আমার, তক্ষুনি ঠিক বিশ্বাস যদিও হ'লো না। ওখানটায় আলো কম, মাঝে-মাঝে আড়াল—কোনো কালো-কোর্তা-আঁটা চওড়া পিঠ, বেনারসিতে বেমানান কোনো শ্বেতাঙ্গিনী। আমি তখন যে-দলটিতে প'ড়ে গেছি সেখানে প্রধান বক্তা অভিজিৎ ঘোষাল, 'ছারখার' নামক কবিতার বই ছেপে টাটকা নামজাদা, দাড়িতে চুলে লাল শার্টে জমকালো—তুটি সরল চেহারার মার্কিনী মেয়েকে সে বোঝাচ্ছে যে রাত বারোটায় নিমতলা ঘাটে গঞ্জিকাসেবনের মতো স্বর্গসুখ এল. এস. ডি.ও দিতে পারে না—আর, মাত্র কয়েক গজ দূরে, আধো অন্ধকারে, এক বানিয়ে-তোলা অ্যাল্কহলগন্ধী ক্ষণস্থায়ী আন্তর্জাতিক কামারাদেরির মধ্যে: সে।

শ্রীপতির মগজ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেলো একটা ইলেকট্রিক হর্নের তীক্ষ্ণ গিটকিরি, একটা কুৎসিত ইংরিজি গালি ঢিলের মতো পড়লো তার তন্দ্রায়। তাকিয়ে দেখলো, একটা মেরুন রঙের জাগুয়ার তাকে ছাড়িয়ে দূরে চ'লে যাচ্ছে। কী অসভ্য লোকটা! ধাওয়া করবো নাকি পেছনে, কোনো লাল আলোয় ধ'রে ফেলে বুঝিয়ে দেবো, ইংরিজি খিস্তিবুলিতে আমিও কম ওস্তাদ নই? কিন্তু—এটা কোন জায়গা? আরে, ক্যামাক স্ট্রিট-থিয়েটার রোডের মোড়, কী হয়েছিলো আমার, আমি কি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো শ্রীপতি, বাঁ হাতে লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরালো। আর আট মিনিটে বাড়ি: ঘুম। আমার একটা বাড়ি আছে। আর স্ত্রী। সুখী স্ত্রী। স্বামী নিয়ে গর্বিত। আমার সন্তানের মা। সংসারের কর্ত্রী। আমার শরীর আর উপার্জনের অধিকারিণী। আ—কত

বোঝা, কত শেকল, কত পিছু টান। আমি কেটে পড়লাম গল্পিকার গুণগান থেকে, আমাকে দেখে হাত বাড়িয়ে দিলো একটি গোল মুখের ছোকরা ইংরেজ—ব্রিটিশ হাই কমিশনের কোনো চাকুরে ব'লে মনে হ'লো—তার মধ্যস্থতায় আমি পরিচিত হলাম ডক্টর মিস মাইট্রর সঙ্গে। দিশি সাহেব, বিলিতি সাহেব, আফ্রিকান সাহেব: মসৃণ চলছে কথাবার্তা। আমার কানের ওপর দিয়ে ভেসে গেলো কিছু সাহিত্য, কিছু সিনেমা, ছিটেফোঁটা প্রান্তিক পলিটিক্স—সেই এক খবুরে-কাগুজে বুকনি (আমার চেনা, আমার ঘেন্না!), কিন্তু আরো জোলো, আরো নিস্বাদ, শুধু বলার জন্যেই বলা, মাঝে-মাঝে বলটা ছুঁড়ে দেয়া হচ্ছে আমারও দিকে, কিন্তু আমি ভদ্রতা ক'রেও কিছু বলতে পারছি না, আমার চোখ স'রে-স'রে যাচ্ছে বার-বার।

আরতি, তুমি?

আরব-ইস্রায়েল, চেক দেশের নতুন সাহিত্য, তারপর হঠাৎ জাপানি ফিল্ম। কী-অর্থ হয় এ-সবের, কী এসে যায়? ঝ'রে পড়ছে যথাসময়ে যথোচিত মন্তব্য—তার সুন্দর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে, আধো আলোয় শাদা দাঁতের ঝিলিক ছিটিয়ে, ছিপছিপে হাল আমলের ইংরিজিতে, মার্কিনী-ঘেঁষা অ্যাকসেন্টে—প্রমাণ হচ্ছে যে ককটেল-পার্টির আদবকায়দায় সে দক্ষ, অন্য কারো-কারো মতো (ধরা যাক আমারই মতো) শুধু মদের জন্যই আসেনি। আমার মনে পড়লো হাজরা রোডের গলির মধ্যে দোতলার ঘর, জ্বরে ঘামে শীতে গরমে আমি কাঁপছি, আমার মাথার মধ্যে আবোলতাবোল ঘূর্ণি, বালিশের তলায় একটা রক্তের দাগ-লাগা রুমাল, কেশব মৈত্র নিচু হ'য়ে পরীক্ষা করছেন আমাকে, আমার ক্লান্ত লাগছে, বড্ড—আমার ঘুম পেয়েছে, আমি ঘুমোতে পারছি না। আমি ছিলাম মৃত্যুর মুখে, তুমি আমাকে ফিরিয়ে আনলে: ভাবা যায়? ভাবা কি যায়, আমরা ছিলাম পরস্পরের জীবনের অংশ, দূরে, কাছে, ব্যক্ত, নীরব—যেন একটা টান,

যা এড়ানো যায় না ; এক গোপনে-ব'য়ে-চলা সুর, যা শুনতে পায় শুধু দু-জন ? আমি, আর এই আরতি মৈত্র।

সত্যি কি দেখা হয়েছিলো ? কবে ? কাল ? —না, কাল তো সারারাত আপিশে ছিলাম। পর্শু ? তার আগের দিন ? আরো আগে চ'লে যাও, শ্রীপতি, তলিয়ে যাও তোমার নিজের মধ্যে, থমকে যেয়ো না। কিন্তু না—এখন সময় নেই, আমি ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে চলেছি, আর কয়েক মিনিটে বাড়ি। কিন্তু যদি গিয়ে দেখি বাড়িটা নেই, কোনো আরব্যোপন্যাসের জিন ওটাকে তুলে নিয়ে গেছে, প'ড়ে আছে শুধু কয়েক কাঠা ফাঁকা জমি পণ্ডিতিয়া রোডে ? আনন্দ, যেন হাজার মাইল প্রান্তর-পেরোনো বাতাস, ব'য়ে গেলো তার বুকের মধ্যে মুহূর্তের জন্য। মিনিটখানেক খেলা করলো এই ভাবনাটাকে নিয়ে ; মনে-মনে বললো, 'সে কোথায় থাকে তাও জানা হ'লো না, হঠাৎ যেন মিলিয়ে গেলো।' আর তারপরেই এই রাজনৈতিক তোলপাড়, আমার আপিশ আমাকে দখল ক'রে নিয়েছে, আমি নিশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছি না, কিন্তু ফাঁকে-ফাঁকে, থেকে-থেকে, অন্য এক খবর—যেন বুকের ওপর চাপ, যেন ফেটে বেরোতে চায়, সবচেয়ে জরুরি, মন্তব্যহীন, তর্কাতীত। কতবার, রাত-জাগা আঠারো ঘণ্টার মধ্যে কতবার তার মনের ওপর দিয়ে ভেসে গেছে সেই কয়েকটি মুহূর্ত, যখন আকাশের তলায়, আধো অন্ধকারে তারা দাঁড়িয়ে ছিলো, মুখোমুখি, আর চারদিকে ভিড় পাৎলা হ'য়ে আসছে, কাছাকাছি আর-কেউ নেই। টুকরো কথা, টুকরো ছবি, সেই সন্ধ্যার, কখনো কোনো দূর সময়ের, যেন পাশাপাশি অতীত আর এই মুহূর্ত ; যা বলা যায় না এবং যা বলতে হয়, এ-দুটোতে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। 'এই যে শ্রীপতি, কেমন আছো ?' অদ্ভুত শোনালো তার গলায় আমার নামটা, যেন আমার নয়, অন্য কারো। 'তোমার কী খবর ?' 'এই দেখছো।' 'তুমি কি এইমাত্র কোনো স্বাস্থ্যকর ঠাণ্ডা দেশ থেকে ফিরলে?' 'মাসখানেক হ'লো।' 'এখন ?' 'একটা চাকরি করছি—

আপাতত।' 'আপাতত? আবার চ'লে যাবে?' 'দেখি।' আমাদের হুইস্কির গ্লাশ দুটো আবার ভ'রে নিলাম আমরা, আমি তার সিগারেট ধরিয়ে দিলাম। 'হেদোর পেছনে সেই বাড়িটা?' 'ধ'রে নিতে হবে সেটার অস্তিত্ব আছে এখনো।' 'তোমার বাবা?' এর উত্তরে একটি হাত উঁচু ক'রে ওপরের দিকে আঙুল তুললো আরতি, আমার চোখে পড়লো আকাশের গায়ে ছিটোনো কয়েকটা তারা—স্থির, অবিচল, অন্তত আমরা তা-ই ভাবি তাদের। আরতিদের তেতলায় সেই একখানা ঘর, আমার শিয়রের দিকে ছাদ, আমার চোখের সামনে বড়ো-বড়ো দুটো জানলা খোলা—আমার কথা বলা বারণ, বই পড়া বারণ, যতদূর সম্ভব নড়াচড়াও বারণ—আমি শুয়ে আছি অন্ধকারে, স্তব্ধ, জানলা দিয়ে তারার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে কিছু না-ভাবার চেষ্টা করছি। 'সেই বাড়িটা, সে কি মনে রেখেছে আমাদের?' আমি প্রায় শব্দ ক'রে ব'লে ফেলেছিলাম কথাটা, কিন্তু আমার মুখ দিয়ে বেরোলো, 'তুমি কি অনেকদিন বিদেশে ছিলে?' 'আট বছর—প্রায় সাড়ে আট।' 'কোন দেশে?' 'ইংলণ্ড, আমেরিকা, ক্যানাডা।' 'আমি দু-বার ঘুরে এলাম এর মধ্যে। জানতাম না যে তুমি—' কথাটা শেষ না-ক'রে তক্ষুনি আবার বললাম, 'তুমি কি ডক্টরেট ক'রে এলে?' 'করেছি একটা ছ-বছর ধ'রে টেনে-বুনে।' 'কী-দরকার ছিলো?' 'জানতে চাও?' তার চোখ আমাকে হালকা ক'রে ছুঁয়ে গেলো। আমি নিজেকে আবার দেখতে পেলাম সেই চারদিক-খোলা তেতলার ঘরে, জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, আমার জীবন থেমে গেছে হঠাৎ, কিংবা এক বিন্দুতে এসে ঠেকেছে, কী-একটা ইঞ্জেকশন দেয় যার জন্য আচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়ে থাকি অনেক সময়, কিন্তু মাঝে-মাঝে দেখতে পাই কেশববাবুকে, আমার মুখে থার্মোমিটার দিচ্ছেন, আমার নিশ্বাসের শব্দ শুনছেন স্টেথোস্কোপে—আর মাঝে-মাঝে, স্বপ্নের মতো, আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে আরতি, উজ্জ্বল, যেন আশায় আর আশ্বাসে গড়া এক প্রতিমা। 'তোমার বাবার কী

হয়েছিলো?’ ‘কী-একটা শক্ত নামের অসুখ। মেরুদণ্ডের মজ্জা শুকিয়ে যায়।’ ‘তুমি—কাছে ছিলে?’ ‘ছিলাম।’ ‘মানে—তুমি বিদেশে যাবার আগেই—?’ ‘ঠিক তা নয়।’ ‘তিনি কি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন?’—কিন্তু এ-কথাটাও আমার গলায় বেধে গেলো, তার বদলে গ্লাশে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বললাম, ‘হুইস্কিটা এবার জোলো দিয়েছে।’ ‘বিদায়ের ইঙ্গিত,’ ঠোঁটের কোণে হাসলো আরতি। আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেলো, ‘প্রায় দশ বছর পর দেখা হ’লো—তা-ই না?’ আরতি আমাকে পেরিয়ে সামনের দিকে তাকালো, লম্বা পা ফেলে একটি বলিষ্ঠ পুরুষকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। কী-একটা অস্পষ্ট নাম, উভয় পক্ষের মাথা নোওয়ানো, দু-একটা অর্থহীন কথা, একটু পরে আরতি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, ‘চলি তাহ’লে।’ ‘তোমাকে পৌঁছিয়ে দিতে পারি কি?’ ‘আমি বাড়ি যাচ্ছি না, একটা ডিনার আছে। আচ্ছা…চলি।’ ‘আরতি!—’ নামটা আমার নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এসে রাতের হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। আর তারপর—এই গাড়ি, এই রাস্তা, ক্যামাক স্ট্রিট, ল্যান্সডাউন রোড, মনোহরপুকুর—বাঁয়ে, ডাইনে আবার বাঁয়ে—বাড়ি। হাওয়া হ’য়ে যায়নি, অটুটভাবে দাঁড়িয়ে আছে, নিচু পাঁচিল-ঘেরা আস্ত একটি একতলা, সামনে ঘাসের জমি, ফুলগাছে রোদ্দুর, কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে টুকটুকে লাল চওড়া বারান্দা, জানলায়-জানলায় চাঁপারঙের পর্দাগুলো শৌখিন—বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় কতই না একটি সুখী পরিবার এখানে বাস করে।

২

গোরুসমেত গয়লার কাছে হরিদাসী টাটকা-দোয়ানো দুধ রাখছে; সামনের বারান্দায়, দিদিমার মুগ্ধ ও সতর্ক দৃষ্টির তত্ত্বাবধানে, ট্রাইসিকল চালাচ্ছে খোকন—তার গায়ে লাল সোয়েটার, গাল দুটো ফুলো-ফুলো গোলাপি, হাতে একটা টিনের ভেঁপু; আর দরজার কাছে পাপোশের ওপর শুয়ে আছে ময়নার পুষ্যি বেশি-খেয়ে-খেয়ে কোঁৎকা-হ'য়ে-যাওয়া শাদা-আর-বাদামি বেড়ালটা, কোনো বাদশাজাদির মতো অলস আর গোলগাল। বাবাকে দেখে টিনের ভেঁপুতে জয়ধ্বনি ক'রে উঠলো খোকন, ময়নার মা-ও বোধহয় বললেন কিছু; শ্রীপতি ফিরে তাকালো না, বেড়ালটাকে টপকে ডিঙিয়ে সোজা শোবার ঘরে চ'লে এলো। ঢোকামাত্র একটা গন্ধ—বন্ধ ঘরে ঘুমন্ত মানুষের, সারারাতের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের—বাসি, ঘন, একটু আঠা-আঠা। বাইরে দিন শুরু হ'য়ে গেছে, কিন্তু এ-ঘরে এখনো আটকে আছে ছায়া, খড়খড়িগুলো বন্ধ, খাটের ওপর মশারি ফেলা—পাছে খোকনের ঠাণ্ডা লাগে, ময়নার নিজেরও সর্দির ধাত। আমি রোজ এ-ঘরে ঘুমোই, কিন্তু এই গন্ধ আগে পাইনি। এইমাত্র বাইরে থেকে এলাম, তাই বোধহয়। বা হয়তো রাত জাগলে নাক আরো সূক্ষ্ম হয় আমাদের। ঘুম, যাতে বিশ্রাম, যাতে স্বাস্থ্য, তাও পুরোপুরি ভালো নয়— দাঁতে ছাতা জমে, চোখে পিঁচুটি। পাজামা প'রে নিয়ে বিছানার ধারে এলো শ্রীপতি, মশারি তুলে থমকে দাঁড়ালো। ময়না ঘুমুচ্ছে—কাৎ হ'য়ে, ঈষৎ ঠোঁট খুলে, পরনে একটা ঢিলে নাইলনের শেমিজ—বোধহয় আমিই এনে দিয়েছিলাম লণ্ডন থেকে—পায়ের গোড়ালি থেকে কোমর পর্যন্ত চাদর টানা—

ঘুমের তলায় গা ছেড়ে দিয়ে জোরে-জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে সে, মাঝে-মাঝে নাকের ভেতর দিয়ে শব্দ ক'রে, কিন্তু তবু যেন তার মুখ থেকে মুছে যায়নি তার সারাদিনের তৃপ্তি—সচ্ছল ও নিশ্চিন্ত গৃহিণীর গভীর তৃপ্তি। শোবার ভঙ্গির জন্য মোটা ভাঁজ পড়েছে কাঁধের তলায়, একটা বুক ওর কনুইয়ের খাঁজে চেপ্টে আছে। শ্রীপতি তাকিয়ে রইলো একটুক্ষণ: আমার স্ত্রী, আমি বিবাহিত। তথ্যটাকে কাজে খাটালে কেমন হয়—এক্ষুনি, আঠারো ঘণ্টা পর বাড়িতে পা দেয়ামাত্র? যেন এক রাত্রির বিচ্ছেদে আমি অস্থির, এমনি একটা ভাব আনা যায় না? একটু চেষ্টা করো, শ্রীপতি—ভেবে দ্যাখো, এটাও তোমার কর্তব্য, এটাই তোমার স্বামিত্বের প্রমাণ। তোমার ইচ্ছে নেই, তোমার লোভ হচ্ছে না—কী এসে যায়? বিনা ইচ্ছায়, শুধু কর্তব্যবোধে যে কর্ম করে, তাকেই তো বলে সচ্চরিত্র। নিষ্কাম কর্ম, আক্ষরিক অর্থে নিষ্কাম। শ্রীপতি একটা নিঃশব্দ হাসি গিলে ফেললো, আস্তে উঠে শুয়ে পড়লো স্ত্রীর পাশে, ঘুমের মধ্যে চমকে উঠলো ময়না। 'কে—?' প্রায় একটা আর্তনাদ বেরোলো তার গলা দিয়ে, হঠাৎ চমকাবার জন্য কথার সঙ্গে খানিকটা লালা তার কষ বেয়ে নেমে এলো, হাতের উল্টো পিঠে তা মুছে ফেলে বললো, 'ও, তুমি! এই এলে?' শ্রীপতি জবাব দিলো না, আরো স'রে এলো ময়নার দিকে, চুলের তলায় তার ঘাড়ের ওপর মুখ গুঁজলো। ময়না ফিরলো শ্রীপতির দিকে, ক্ষিপ্র আঙুলে শেমিজের গলা টেনে দিলো, সদ্য-ঘুম-ভাঙা ঝাপসা একটু হাসি ফুটলো তার মুখে। 'খোকনকে বাইরে পাঠিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কী দুষ্ট হয়েছে জানো তো, কাকভোরে জেগে উঠবে, আর চোখ মেলে তাকালো কি সাইকেল ছাড়া কথা নেই!' শ্রীপতির গলার একটা পেশী কাঁপলো একবার। খোকন—ন্যাকা নাম—বুড়ো বয়েস অবধি 'খোকন' শুনতে হবে বেচারাকে; দিদিমা আবার পোশাকি নাম রেখেছেন চন্দনতরু—জঘন্য। কিন্তু আমি কিছু বলিনি—বলবোও

না—আমার কী এসে যায়? 'একটু ওঠো—বিছানাটা পাট ক'রে দিই,' ব'লে ময়না উঠে পড়ার মতো ভঙ্গি করলো। 'ঠিক আছে, তুমি উঠো না।' শ্রীপতি ময়নার মাথাটা নামিয়ে আনলো বালিশের ওপর, তার গলার খাঁজে মুখ চেপে ধ'রে নিশ্বাসের সঙ্গে টানতে লাগলো ঐ ঘরের বাসি গন্ধ, ময়নার ঘুমিয়ে-ওঠা শরীরের আর নিশ্বাসের গন্ধের সঙ্গে মিশে যা মুহূর্তে-মুহূর্তে আরো কটু হ'য়ে উঠছে—মশারির তলায় প্রায় দম-আটকানো। একটু চুপ ক'রে রইলো ময়না, শ্রীপতিকে আস্তে ঠেলা দিয়ে বললো, 'আমি উঠি, খোকনের খাওয়ার সময় হ'লো।' 'এখনই যেয়ো না,' ব'লে ময়নার কাঁধের ওপর আস্তে হাত রাখলো শ্রীপতি। 'এই রাত জাগা, আপিশে সাংঘাতিক খাটুনি—তোমার কি ঘুমও পায় না?' একটা ভঙ্গি হ'লো ময়নার শরীরে, নতুন-বৌ ধরনের, আহ্লাদি, তার ঠোঁট খুলে গেলো, এক ঝলক নিশ্বাস মিশলো শ্রীপতির নিশ্বাসে। হঠাৎ বমির মতো কিছু-একটা শ্রীপতির গলা ঠেলে উঠে এলো—অসহ্য—এই বন্ধ ঘর, এই দুর্গন্ধ, নিশ্বাসে অন্য একজনের নিশ্বাস, শরীরের সঙ্গে শরীরের এই আটকে থাকা—সে মুক্তি চায়, চ'লে যেতে চায় অন্য কোথাও, অন্য কেউ হ'তে চায়। মস্ত একটা ঢোঁক গিললো শ্রীপতি, একটা উগ্র তেতো ঝাঁঝালো বিষ ছড়িয়ে পড়লো তার শরীরে—যেন নিজেকে শাস্তি দিচ্ছে, বলা-যায়-না এমন কোনো অপরাধের জন্য নিজেরই ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে, এমনি ক'রে সেই ঝাঁঝালো বিষ উগরে দিলো। আর তক্ষুনি, এক মুহূর্ত দেরি না-ক'রে, যেন ক্লান্তিতে গ'লে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সে—ময়নার শরীরের চাপে কুঁচকে-যাওয়া চাদরে, ময়নার চুলের গন্ধমাখা বালিশে গাল চেপে; টের পেলো না, ময়না কখন উঠলো, প'রে নিলো জামা-কাপড়; মশারি খুলে, শ্রীপতি শুয়ে থাকা সত্ত্বেও যতটা সম্ভব বিছানাটার চেহারা ফেরালো; ছড়িয়ে দিলো একটি পাট-ভাঙা চাদর তার গায়ের ওপর; জানলাগুলো খুলে দিয়ে ভারি পর্দা টেনে দিলো,

যাতে ঘরে টাটকা হাওয়া আসে কিন্তু আলোয় তার ঘুম ভেঙে না যায়, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে, সিঁদুর প'রে নিলো; বেরিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিলো দরজা, তারপর খোকনের জন্য দুধ ডিম আপেল মিষ্টি সাজাতে-সাজাতে বললো, 'ওদিকে গোল কোরো না, সোনামণি, বাবা ঘুমোচ্ছেন।'

ঘণ্টাখানেক ঘুমোলো শ্রীপতি, হয়তো চল্লিশ মিনিট—হঠাৎ কার গলার আওয়াজে জেগে উঠলো। একটা কথা—ঘুমের মধ্যে শোনা, এখনো একেবারে মিলিয়ে যায়নি: কী? বালিশে কান পেতে শুনলো সে: কোনো পাখির ডাক, কোনো বাঁশিতে ফুঁ—না কি তার নিজেরই গলা—সে-ই কি কিছু ব'লে উঠছিলো ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নে? তাই তো, একটা স্বপ্ন দেখছিলো বোধহয়—কোনো শহর, কোনো ঘর, খুব উঁচুতে, মনে হয় যেন চেনা, যেন সে কখনো ছিলো সেখানে—কোথায়? ন্যুয়র্কের এম্বাসি হোটেল? সান্ ফ্রানসিস্কোর কার্লটন? কান্? নেপলস? না—অত উঁচুতে সে ঘর পায়নি কোথাও, কোনো জানলা থেকে অমন দৃশ্য দ্যাখেনি। অন্য কোথাও—সাধারণ যাতায়াতের পথে নয়, হয়তো প্যাসিফিকের কোনো দ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকার কোনো রাজধানী। কিন্তু সে তো ও-সব দেশে যায়নি কখনো। শ্রীপতি মনে-মনে বললো, 'আমি এখনো স্বপ্ন দেখছি।' তার বোজা চোখের তলায় অন্ধকার কেঁপে উঠলো। সকালে একবার বাইরে ঘুরে এসেছে, গাইড-বুক্-এর পাতা উল্টেছে কফিখানায় ব'সে; চোখ বুলিয়েছে একমাত্র স্থানীয় ইংরেজি দৈনিকের পাতায়; তাই সে জানে, এই শহরে আছে অনেক বড়ো-বড়ো চওড়া রাস্তা; অনেক দোকান বাগান আমোদ-প্রমোদ গির্জে; অনেক আমেরিকান মোটর-গাড়ি; অনেক নতুন ধরনের চমক-লাগানো স্থাপত্য; সারি-সারি ঝাউ আর নারকোলগাছ; পথের ধারে-ধারে অজস্র ফুল, মোড়ে-মোড়ে ঘন সবুজ ঘাসের চত্বর, লোকেদের বাড়ির উঠোনে আপেল জবা কমলালেবু পাতাবাহার;

অনেক সুখী ও সুস্থ শিশু ; হলদে, শাদা, বাদামি রঙের মেয়ে-পুরুষের বিলাসী ভিড় ; অনেক খেলা, মেলা, নাচ, সাঁতার, উল্লাস ; মুদিখানায় পেঁপে তরমুজ আনারসের স্তূপ, সরাইখানায় সারা পৃথিবীর মদের জোগান। দারিদ্র্যও আছে, বস্তিপাড়ায় এক নতুন ধরনের ছোঁয়াচে জ্বর, মসৃণভাবে লুকিয়ে-রাখা বর্ণবিদ্বেষ, মাত্র দশ মাইল দূরে এক বিরাট জঙ্গি আস্তানা। কিন্তু সে তার জানলা দিয়ে যা দেখতে পাচ্ছে, তাতে কিছু নেই যাকে বলা যায় দাগি, ময়লা বা সন্দেহজনক। ছড়িয়ে আছে আধো-চাঁদের আকার নিয়ে উপসাগর, শহরটিকে তিন দিক দিয়ে ঘিরে ; সমুদ্রের গায়ে নানা রঙের ফুটকির মতো জেলে-ডিঙির পাল, গাংচিলের শাদা পাখার ঝলক, রাজহাঁসের মতো খেলায়-মেতে-ওঠা মোটরবোটগুলো ; আর সৈকতের ঐ বাঁকে পাহাড়—ঘন গাছপালায় সবুজ, ধাপে-ধাপে আধেক লুকোনো বাংলো, ফাঁকে-ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে বেগনি আর তুঁতে আর ম্যাজেণ্টা রঙের টালির ছাদ ;—আর এই সব-কিছুর ওপর স্থির হ'য়ে আছে এক বিশাল নীল উদ্ভাসিত আকাশ, গোল হ'য়ে নুয়ে পড়েছে দিগন্তে, এক মাইল-মাইল-জোড়া উজ্জ্বল বাঁকা রেখা এঁকে সমুদ্রে মিশে গেছে। বেলা প'ড়ে এলো, সমুদ্রের রং পশ্চিম ঘেঁষে আগুন-রঙা, মধ্যিখানে রুপোলি, আর তীরের কাছে আকাশের মতোই নীল ;—নরম স্নিগ্ধ অফুরান আলোয় প্লাবিত এই পৃথিবী, কাচ কাঠ পাথর ইস্পাত কংক্রিটে গড়া শহরটা যেন হালকা হ'য়ে যাচ্ছে, বায়বীয়, যেন শূন্যে ঝোলানো। সেই আলোয় তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তার মনে হ'লো, যেন আকাশ আর সমুদ্রের মধ্যে আর-কিছু নেই, শুধু এক অনন্ত আশা ছড়িয়ে আছে মানুষের জন্য। কিন্তু আশা মানেই অস্বস্তি, পাছে তা পূরণ না হয় সেই আশঙ্কা। কেন সেই চাঞ্চল্য এখানেও—এই শান্ত আকাশের তলায়, এই উচ্ছ্বাসহীন সমুদ্রের তীরে? আস্তে-আস্তে শ্রীপতির মনে একটা উৎকণ্ঠার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো—ভেবে পেলো না কী ক'রে সে

এলো এখানে, এই আশ্চর্য, দূরতম শহরে—কেন এলো? আকাশ-পথে লম্বা পাড়ি দিতে-দিতে বিশ্রামের জন্য? বিজ্ঞাপনে বিখ্যাত কোনো দৃশ্য দেখার জন্য? না কি কথা ছিলো কারো সঙ্গে দেখা হবে? না কি তার অজানা কেউ তাকে দিয়ে কোনো কূট উদ্দেশ্য সাধন ক'রে নিতে চায়?

খুব মৃদু একটা শব্দ শুনে ফিরে তাকালো শ্রীপতি, পা বাড়াতে গিয়ে থমকে গেলো। লাল মখমলে মোড়া ডিভানটায় শুয়ে আছে—কে? দেয়ালের দিকে মুখ ফেরানো, সূর্যমুখী রঙের সিল্কের সুজনিতে গা ঢাকা। শ্রীপতি বেশি অবাক হ'লো না, মন দিয়ে দেখতে লাগলো। একমাথা কুচকুচে কালো চুল, চুলের ফাঁকে গ্রীবার ঝলক, আধখানা কপাল, গালের আভা ঈষৎ উঁচু হ'য়ে ফুটে আছে, মাজা কাঁসার মতো রঙের একটি বাহু, একটি নিশ্বসিত শরীর। এই শহরের একটা বদনাম মনে প'ড়ে গেলো শ্রীপতির, আন্তর্জাতিক চক্রান্তের একটি লীলাভূমি এটা, বিশেষত মেয়ে-গোয়েন্দায় অধ্যুষিত—নানা দেশের ভাষা বলতে পারে তারা, নানা ছদ্মবেশ ধারণ করে, তাদের পক্ষে অসাধ্য নাকি কিছু নেই। টেবিলের ওপর টেলিফোনটার দিকে একবার তাকালো সে: হোটেলের রিসেপশনে জানাবে? পুলিশে? কিন্তু সে—এক দুর্বল দরিদ্র পরনির্ভর দেশের নাগরিক, তার ওপর কেন নজর দেবে কোনো আন্তর্জাতিক মেয়ে-গোয়েন্দা, যারা পৃথিবীর বাঘা-সিঙ্গিদের নিয়ে খেলা ক'রে থাকে? তবে কি কোনো চড়া দামের বেশ্যা—এই শহরে এ-রকমই রেওয়াজ? এই দ্বিতীয় অনুমান নিয়ে কয়েক মুহূর্ত খেলা করলো শ্রীপতি, কল্পনা করলো সুজনির তলায় এক আধা-হিস্পানি বা পলিনেশীয় যুবতীর শরীর; তার লালসা জাগলো না। এই সূর্যাস্তের মুহূর্ত, গোলাপি আলোয় ভ'রে-যাওয়া এই ঘর—এর সঙ্গে ও-সব কিছুকেই খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না, এ যেন জগৎ-সংসারের বাইরে, ঘড়ির কাঁটার বাইরে কোনো মুহূর্ত—যেন

কিছু হ'তে যাচ্ছে, হ'য়ে উঠছে, কিন্তু নাও হ'তে পারে—এমনি এক অনিশ্চয়তার মুহূর্ত যেন। মেয়েটির দিকে আর-একবার তাকালো সে, এবার তাকে অন্য রকম দেখলো, সে যেন আকস্মিক নয়, অচেনাও নয়; বরং, শ্রীপতি এতক্ষণ যা-কিছু দেখছিলো, তারই গোপন অর্থ ও পরিণাম এই মেয়েটি। তার শুয়ে থাকার ভঙ্গিটা যেন উদাসীন অথচ তীব্র, যেন সূক্ষ্ম একটি অপেক্ষার স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে তার কপাল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত। কে তুমি? এই আলো আর স্বচ্ছতার মধ্যে অশান্তির বীজ, অগাধ সাচ্ছল্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা—তুমি কি তা-ই? নারী, প্রেমিকা, আমার হারানো যৌবন, আমার লুপ্ত প্রেরণা—তা-ই? হঠাৎ—বাইরে ঐ আকাশ যেমন আলোয়, তেমনি আনন্দে ভ'রে গেলো শ্রীপতির শরীর, মন, অন্তরাত্মা; মনে হ'লো এরই জন্য সে এসেছিলো এখানে, এই অতি দূর অবিশ্বাস্য শহরে, এই উঁচু ঘরে, আকাশ আর সমুদ্রের মধ্যখানে। সে আর দ্বিধা করলো না, এগিয়ে গিয়ে ডিভানের ওপর মুখ নিচু করলো, আর তক্ষুনি—যেমন অনেকক্ষণ দম আটকে রাখার পর এক দমকে বেরিয়ে আসে বাতাস, তেমনি তার গলা চিরে একটা আওয়াজ বেরোলো, মিলিয়ে গেলো বায়ুমণ্ডলে ঢেউ তুলে-তুলে—যেন উড়ে-চলা কোনো পাখির ডাক, দূর-থেকে-শোনা বাঁশির ফুঁ—এখনো একেবারে মিলিয়ে যায়নি।

—আরতি, তুমি?

একটা কষ্ট নিয়ে জেগে উঠলো শ্রীপতি, মুহূর্তের জন্য চোখ মেলে তাকিয়ে আবার চোখ বুজলো। মনে-মনে বললো, 'স্বপ্ন, ফিরে এসো।' আবার বললো, 'আমি এখনো স্বপ্ন দেখছি।' স্বপ্ন—না কি সব আমার নিজেরই বানানো, মন-গড়া? না কি শুধু স্মৃতি, অতীতের এক ক্ষণিক পুনরুত্থান—যেমন, কোনো-কোনো মেঘলা সকালে ঘুম ভাঙামাত্র হঠাৎ আমাদের মনে প'ড়ে যায় ছেলেবেলার কোনো ঘটনা, দাঁতের ফাঁকে উনুনে-সেঁকা কাঁঠালবিচির কুড়মুড়ে গরম মাংসালো স্বাদ,

বা কুড়ি বছর আগেকার পড়া প্রায়-ভুলে-যাওয়া 'চোখের বালি'র বিশেষ-কোনো অংশ — বইটা যে-ঘরে ব'সে পড়েছিলাম, পড়তে-পড়তে মনে যে-সব আলোড়ন চলছিলো, ছাপার অক্ষরগুলো, কাগজের স্পর্শ, গন্ধ, রং — সব যেমন ঝাপটে ধরে জেগে ওঠার মুহূর্তটিকে (অথচ মনে-মনে জানি আমি আর সেখানে নেই) — তেমনি, শুধু তার চেয়ে অনেক বেশি সুখের ও কষ্টের, এই স্বপ্ন বা স্মৃতি বা যা-ই হোক না। স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন, গর্তের তলায় আরো গর্ত, এক স্মৃতি অন্য অনেক স্মৃতিকে টেনে আনে — বড়ো গোলমেলে ব্যাপার, কোনো শৃঙ্খলা নেই, কোনো অর্থ হয় না শেষ পর্যন্ত। আমাদের জীবনটা এ-রকম নয়, সেখানে সাতটার এক ঘণ্টা পরে নির্ভুলভাবে আটটা বাজে, ছোটো ছেলে ট্রাইসিকলে ব'সে বিজয়ীভাবে ভেঁপু বাজায়। শ্রীপতি সাহস ক'রে চোখ মেললো এবার : ভেসে উঠলো দেয়াল, ময়নার ড্রেসিংটেবিল, পাশাপাশি দুটো কাপড়ের আলমারি, জানলা ঘেঁষে সোফা, টেবিলে বাংলা-ইংরেজি পত্রিকার স্তূপ — এই তার বাড়ি, এটা উপস্থিত, কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই এর মধ্যে, কিছুক্ষণ আগে আপিশ থেকে ফিরেছে সে, নিজের বিছানায় শুয়ে আছে। শ্রীপতির বাস্তববোধ ফিরে এলো ; তার মনে পড়লো এই স্বপ্ন, বা এই ধরনের কোনো স্বপ্ন আগে একবার দেখেছিলো সে। চার নম্বর নিমু দত্ত লেনে, হাজরা রোড থেকে বেরিয়েছে গলিটা — নোংরা, সরু, আঁকাবাঁকা, আধা-বস্তি গোছের ব্যাপার, আমার অসুখ তখন, গলা দিয়ে রক্ত পড়েছে, আমি ভয় পেয়েছি, কিন্তু ভাব দেখাচ্ছি যেন ওতে কিছুই এসে যায় না আমার। তারপর আরতি এসে আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেলো, তার বাবা আমার চিকিৎসা করলেন।

পাশ ফিরে চোখ বুজলো শ্রীপতি, কিন্তু ঘুম আর এলো না।

৩

মনে আছে, শ্রীপতি, তোমার মৃত্যুভয়? কত বক্তৃতা করেছো বন্ধুদের কাছে; জীবনকে বলেছো ঘৃণ্য, যেহেতু অন্যায় না-ক'রে বেঁচে থাকা যায় না, সমাজকে বলেছো দুর্বলের বিরুদ্ধে প্রবলের চক্রান্ত; সংসারে যারা স্বাভাবিকভাবে সুখী হবার চেষ্টা করে তাদের বলেছো নর্দমার ব্যাং, বাথরুমের নোংরা-খুঁটে-খাওয়া আরশোলা—আর সেই তুমি যখন মৃত্যুকে মুখোমুখি দেখলে, তোমার কাশির সঙ্গে উঠে-আসা টকটকে লাল রক্তের ঝলকে, এক্স-রে ছবিতে তোমার ফুশফুশের কালো-কালো গর্ত দুটোয়, তখন—আর-কিছু নয়, ভয়—ভয়ে তুমি কুঁকড়ে গিয়েছিলে; কাপুরুষের মতো, অমানুষের মতো চেয়েছিলে শুধু সেরে উঠতে, বাঁচতে, যে-কোনো উপায়ে যে-কোনো অবস্থায় এই পৃথিবীর বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে শুধু বেঁচে থাকতে! মনে আছে? বিপুল ছিলো মনে-মনে তোমার দম্ভ, যেহেতু তুমি দশ বছর বয়স থেকেই একা ও সত্যিকার অর্থে স্বাধীন; অন্য অনেক ছেলের মতো পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের সব সুবিধে ভোগ ক'রে শুধু শৌখিন ও ক্ষণস্থায়ী বিদ্রোহ করছো না, কলকাতার পথে-পথে ঘুরে অনেক দুঃখে তুমি বড়ো হ'য়ে উঠেছিলে, তোমার বিদ্যেবুদ্ধিকে টাকার অঙ্কে ভাঙিয়ে নিতে রাজি হওনি; যেহেতু তুমি ধরা দিচ্ছো না চিরাচরিত বিয়ে কিংবা চাকরির ফাঁদে, সকলের চাইতে আলাদা হ'য়ে আছো তোমার খামখেয়ালি উচ্ছৃঙ্খল জীবন নিয়ে। কিন্তু সেই তুমি—যখন বুঝলে এঁদো গলিতে একলা প'ড়ে থাকলে তোমার মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত, তখন বিনা প্রতিবাদে উঠে বসলে আরতির বাবার গাড়িতে, উঠে এলে তাদের তেতলায়;

মেনে নিলে কেশববাবুর চিকিৎসা, আরতির অবিচল মনোযোগ; তোমার জন্য সেই পরিবারের দুশ্চিন্তা, পরিশ্রম, অর্থব্যয়—সব অনায়াসে গ্রহণ করলে, যেন তুমি যাকে ঘৃণ্য বলো সেই জীবনের কাছে এটা তোমার প্রাপ্যই ছিলো! সুবোধ বালক—ডাক্তারদের কথা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করছো, চার ঘণ্টা পর-পর খাওয়া, রোজ একটি ক'রে ইঞ্জেকশন, এ-বেলা ও-বেলা ওষুধ, বই পড়া বন্ধ, কথা বলা বন্ধ—শুধু শুয়ে থাকা, অন্তহীনভাবে শুয়ে থাকা। অবস্থাটা তোমার মনে হ'তে পারতো অকথ্যরকম দুর্নৈতিক, কিন্তু তুমি ছটফট করোনি, পালিয়ে যাবার চেষ্টা করোনি কখনো। কী ভেবেছিলে শুয়ে-শুয়ে? ভগবান—মৃত্যু—অবসানের সৌন্দর্য—অনন্তের মহিমা? না, ঈশ্বর বিষয়ে কিছুমাত্র কৌতূহল তুমি অনুভব করোনি; মৃত্যুকে তোমার মনে হয়নি কোনো করুণাময়ী মাতা বা প্রেমিকার মতো; তুমি চাওনি সমুদ্রের মধ্যে বিন্দুর মতো মিলিয়ে যেতে, অস্তিত্বের ছোট্ট খোলশ ভেঙে কোনো অকল্পনীয় অসীমে বেরিয়ে আসতে চাওনি। যত সুবচন অনেক বইয়ে অনেকবার প'ড়ে তুমি মুগ্ধ হয়েছিলে, সে-সব তখন অর্থহীন হ'য়ে গেছে তোমার কাছে। তোমার মন প'ড়ে আছে থার্মোমিটারে, দু-এক পয়েন্টের সূক্ষ্ম ওঠা-নামায়; তুমি কল্পনা করছো তোমার রক্তের মধ্যে কী-বিরাট যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে বীজাণুর সঙ্গে রাসায়নিক ভেষজ, মনে-মনে নির্বংশ করছো বীজাণুগুলোকে। যাতে মৃত্যুর কথা ভাবতে না হয় তারই জন্য সারাক্ষণ চেষ্টা তোমার: দিনের আলোয় জানলার বাইরে তাকাতেও তোমার ভয়, কারণ তখন বড্ড বেশি বড়ো দেখায় আকাশটাকে, শরতের আলোয় বড়ো বেশি উজ্জ্বল ও গভীর; তোমার মনে হয় তুমি অসতর্ক হ'লে ঐ আকাশ তোমাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে ওপরে, এই পৃথিবী ছাড়িয়ে, চিরকালের মতো। তুমি কিছুটা স্বস্তি পেয়েছো রাত্রে—যখন অন্ধকার মুছে দিয়েছে আকাশটাকে, তুমি শুয়ে-শুয়ে কয়েকটার বেশি তারা দেখতে পাও

না, আর তাই অনেক বেশি নিরাপদ মনে হয় তোমার ঘর, তোমার বিছানা, তোমার অস্তিত্ব। স্থির চোখে তুমি তাকিয়ে থেকেছো শাদা দেয়ালটার দিকে ; মসৃণ চুনকামের মধ্যে আবিষ্কার করেছো অনেক সূক্ষ্ম রেখা, গর্ত, উঁচু-নিচু দাগ ; তুমি অধ্যয়ন করেছো টিকটিকিগুলোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, গায়ের রং, ল্যাজের খাঁজ, তাদের ক্ষিপ্রতা ও স্থৈর্য, খাদ্যসংগ্রহ ও বংশবৃদ্ধিতে তৎপরতা ; আর কখনো বা, কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্যসাধনের জন্য, তোমার খাটের পাশের বহুকোণ-ওলা বর্মি টেবিলটার কারুকার্য তৃপ্তিহীনভাবে বিশ্লেষণ ক'রে সময় কাটিয়েছো। যে-কোনো তুচ্ছ জিনিশ, যা পার্থিব, মানুষের জীবনের সঙ্গে যার সম্পর্ক আছে, নির্দিষ্ট স্থান আছে মানুষের সংসারে—তা-ই তুমি আঁকড়ে ধরেছিলে তখন ; মন থেকে সরিয়ে দিয়েছিলে সব কবিতা, সব কল্পনা, সব বিজ্ঞান, সব অনুমান, যা মূর্ত ক'রে তোলে মৃত্যুকে, কিংবা এমন ইঙ্গিত করে যে লোকেরা যাকে বাস্তব বলে সেটাই আমাদের সর্বস্ব নয়।

শ্রীপতির মনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেলো সেই সব দিন, সপ্তাহ, মাসগুলি—শরতের পরে শীত, তারপর হঠাৎ একদিন কোকিলের ডাক : একটি ঘর, একটি ছাদ, মহাপ্রাণ কেশব মৈত্র (না জানি মৃত্যুর আগে কত কষ্ট পেয়েছিলেন তিনি !), আর একটি মেয়ে—স্বাস্থ্যবতী, চারুযৌবনা, সংশয়হীন, আশ্বাসময়ী, যে সম্প্রতি দখল ক'রে নিয়েছে তাকে, যেন তার ভেতরকার ব্যাধির মতোই অপ্রতিরোধ্য। এক অপ্রত্যাশিত যুদ্ধে তার শরীরের কাছে সে হেরে গিয়েছে, তার প্রতিবাদ করার শক্তি নেই, অসহায়ভাবে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই তখনকার মতো। তিন মাস পরে ডাক্তাররা তাকে কিছুটা স্বাধীনতা দিলেন ; সে উঠে বসে, ছাদে পাইচারি করে ; বাছা-বাছা বন্ধুদের আসতে দেয়া হচ্ছে তার কাছে ; কিন্তু ওষুধ পথ্য দশ ঘণ্টা ঘুম তেমনি চলছে নিয়মিত, বাড়ির বাইরে পা বাড়ানো বারণ। সে, জন্ম-বাউণ্ডুলে, যে-কোনোরকম শৃঙ্খলার শত্রু, যে

কাটিয়ে দিয়েছে দিনের পর দিন শুধু নিরুদ্দেশভাবে ঘুরে বেড়িয়ে আর অফুরন্তভাবে সকলের সঙ্গে তর্ক ক'রে—এটাও মেনে নিতে আপত্তি করলো না (যদিও সে অনেকটা সুস্থ বোধ করছে তখন)—এতই সে ব্যগ্র ছিলো নিশ্চিন্ত হ'তে যে ছিদ্রানুসন্ধিৎসু মৃত্যু তাকে আপাতত আর খুঁজে পাবে না। তিন মাসের চিকিৎসা ও রোগশয্যায় তার অনেক অভ্যেসও বদলে গিয়েছিলো—আজকাল নির্দিষ্ট সময়ে খিদে পায় তার, দুপুরে খেয়ে উঠে ঘুম পায়, গরম জলে ছাড়া স্নান করতে পারে না, গা থেকে কখনো সোয়েটার খোলে না পাছে ঠাণ্ডা লাগে, সাবধানে এড়িয়ে চলে বৃষ্টির ছাঁট, উত্তুরে হাওয়া। আরো দু-মাস পরে সে শুনলো সে এখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত, মোটামুটি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে (যদিও রাত জাগা বা বেশি খাটা-খাটনি চলবে না), কিছুদিন বাদ দিয়ে বিয়ে করারও বাধা নেই। শ্রীপতি টের পেলো নেপথ্যে একটা আয়োজন চলছে এই বাড়িতে—কেশববাবুর মুখে এক নতুন ধরনের প্রফুল্লতা ও লুকিয়ে-রাখা কষ্টের চিহ্ন। অবশেষে এক চৈত্রের সন্ধ্যায় ছাদে ব'সে আরতি তাকে বললো, 'বাবা বলছেন তুমি মাস দুয়েক দেরাদূনে কাটিয়ে এলে ভালো হয়, এই সময়টা খুব ভালো ওখানে, তাঁর চেনা একটা স্যানাটরিয়ামও আছে। তারপর আষাঢ় মাসে একটা তারিখ ঠিক করতে চান। তুমি কী বলো?' হঠাৎ লজ্জায় অভিভূত হ'য়ে পড়লো শ্রীপতি, আরতির দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলো না।

—বিয়ে? পিতার আদরিণী এই মাতৃহীন একমাত্র কন্যার? এই অতি সুখে লালিত, অবিবেচক, একগুঁয়ে, কৌতুকপ্রিয়, আত্মবশ, বহু যুবকের বাঞ্ছিত ও উপেক্ষাকারিণী এই তরুণীর! আমার সঙ্গে? কিন্তু আমি কে? কফি-হাউসের বাগ্মী, বন্ধুমহলে বীর, ফার্স্ট ইয়ারের বটুকদের কাছে প্রবাদবাক্য (এখনই তা ফিকে হ'য়ে আসছে যদিও, প্রায় প্রতি বছরই একটি নতুন খুদে প্রফেটের আবির্ভাব হয় ছাত্রমহলে), এক অসমাপ্ত, অপ্রকাশিত উপন্যাসের লেখক (যা

না-প'ড়েই দুর্গাদাস 'অসাধারণ' ব'লে রটিয়েছে), এক বাক্যচ্ছুরিত অসাধিত বিপ্লবের দার্শনিক— এ-ই তো আমি। বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন— এ-সব কথার অর্থ আমি ভুলে গিয়েছি, আমার পেশা প্রাইভেট ট্যুশানি, ঠিকানা অনির্দিষ্ট, আর তার ওপর— এই অসুখ। কিন্তু না— আরতির কাছে কিছুতেই কিছু এসে যায় না: সে আমাকে··· ভালোবাসে। ভালোবাসা: ঠোঁট নেড়ে নিঃশব্দে কথাটা উচ্চারণ করলো শ্রীপতি— যেন কোনো বিদেশী ভাষার শব্দ, অতি প্রিয় ও সুস্বন, কিন্তু সে অনেক অভিধান ঘেঁটেও যার মর্মোদ্ধার করতে পারেনি। শুধু একটা ভার তার বুকের ওপর, বিরাট ভার, কষ্টের মতো— ঐ শব্দ, তার অনুরণন।

কেটে যাচ্ছে দিন একের পর এক, কেশববাবু দেরাদূনে ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছেন, ঋতু ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে গ্রীষ্মের দিকে। এই সেই সময়, যখন এতদিনের বন্দী অবস্থার কিছুটা ক্ষতিপূরণ ক'রে নিতে পারে শ্রীপতি, ভোগ করতে পারে স্যাণ্ডেলের তলায় কলকাতার ফুটপাতের আশ্বাসদায়ক স্পর্শ; নামহীন ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবার বর্ণনাতীত সঙ্গসুখ; বাস্-এর দোতলার ঝাঁকুনি খেতে-খেতে রাস্তার ধারের বারান্দায় বা ঘরের মধ্যে মুহূর্তের জন্য যাদের চোখে পড়ে, তাদের জীবন নিয়ে মনে-মনে গল্প বানাবার আমোদ; কফি-হাউসে তর্কযুদ্ধে মেতে ওঠার উত্তেজনা। এই সবই চেষ্টা করে শ্রীপতি, কিন্তু মনে হয় সারা কলকাতা যেন এ-কয়মাসেই অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে। সবই যেন নীরস হ'য়ে গেছে, নিষ্প্রভ— ঐ একটি ঘর, একটি ছাদ, একটি তরুণীর তুলনায়। ঐ ছাদেই সান্ধ্য আড্ডা জমে মাঝে-মাঝে; আসে দুর্গাদাস, হিমেন্দু, বন্দনা, মাঝে-মাঝে অমলাও আসে; সকলেই বলে তার চেহারা নাকি এত ভালো হয়েছে যে প্রায় চেনাই যায় না; সকলেই জানে, তরুণমহলে এতদিন যা ছিলো বহুবিতর্কিত, বহু জল্পনাকল্পনা ও হার্দ্য জ্বলুনির উপলক্ষ, সেই একটি বিয়ে ঘটতে যাচ্ছে শিগগিরই; একটা উৎসবের সুর লাগে তাদের

কথায়; হিমেন্দু তাকে চাকরির খবর দেয়, বন্দনা দেয় ফ্ল্যাট ভাড়ার খোঁজ, কারণে-অকারণে হো-হো ক'রে হেসে ওঠে দুর্গাদাস, বিনা অনুরোধে গান ধরে—নিধুবাবু, বা রামপ্রসাদ, বা চিরকালের চিরচেনা রবীন্দ্র-সংগীত, যাতে বন্দনাও মাঝে-মাঝে যোগ দেয়। ধরনটা ভিন্ন—সিগারেটের ধোঁয়ায় ঝাপসা কফি-হাউসের চ্যাঁচামেচি নয়, নয় 'সুনন্দা'র তর্কসভার হৈ-চৈ—কিছু নেই কড়া বা তেতো বা উগ্র, যেন চৈত্রের হাওয়ার সঙ্গে মিশে একটা সূক্ষ্ম সুখ ছড়িয়ে পড়ছে, সহজে মিলে যাচ্ছে মনের সঙ্গে মন—কখনো জ্যোছনায়, কখনো বা তারা-ফোটা অন্ধকারে। কিন্তু শ্রীপতি, যার জন্য এই আনন্দ, সে-ই অপেক্ষাকৃত নীরব; কথাবার্তায় তেমন উৎসাহ যেন আর নেই তার; অন্যের মুখ থেকে কথা খ'সে পড়ামাত্র প্রতিবাদ করে না; মাঝে-মাঝে সকলের চোখ এড়িয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্যেরা চ'লে যাবার পর আরতি তাকে জিগেস করে, 'এত চুপচাপ কেন? কী ভাবছো?' 'আমার অবাক লাগছে।' 'অবাক হবার কী আছে?' খুব সহজে উত্তর দেয় আরতি, 'এ তো হ'তোই—শুধু মাঝখানে অনর্থক তোমার অসুখটা—না, অনর্থক নয়, এরও দরকার ছিলো।' মুখে যা বলে, তার চেয়ে অনেক বেশি বলে তার চোখ, শ্রীপতির মনের ভেতরটা মেঘলা হ'য়ে আসে।

মেঘলা, ধোঁয়াটে, গুমরোনো—রাগ আর বিক্ষোভ ঠেলে উঠছে তার ভেতর থেকে, এই বাড়ির বিরুদ্ধে, আরতির বিরুদ্ধে, সবচেয়ে বেশি তার নিজের বিরুদ্ধে। কেন আমি হ'তে দিয়েছিলাম এটা, কেন নিখোঁজ হ'য়ে যাইনি, শেষ ক'রে দিইনি সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় আমার অস্তিত্বটাকে? লেকের জল, ঘুমের ওষুধ, কোনো তারা-ভরা আকাশের তলায় রেল-লাইনের ওপর মাথা পেতে দেয়া—কত উপায় ছিলো। তার বদলে—ভাগ্যের কাছে নয়, ভগবানের কাছে নয়, একজন মানুষের কাছে এই অধম আত্ম-সমর্পণ, এই আকণ্ঠ ঋণে ডুবে যাওয়া। সবাই ধ'রে নিয়েছে বিয়েটা হবেই, এটা অনিবার্য এখন,

আমার জন্য যা-কিছু এরা করেছেন তারই পরিণাম এটা, শেষ ফলাফল। কে এক শ্রীপতি ভদ্র, তাঁর মেয়েকে পড়িয়েছিলো পরীক্ষার আগে, মেয়ের এক কলেজি বন্ধু ধরা যাক—তার জন্য কেশব মৈত্রর এত যে দরদ, এত যত্ন, পরিচর্যা, অর্থব্যয়, এ কি বিশুদ্ধ মহানুভবতা, না কি সবই করেছিলেন শুধু তাঁর অবুঝ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, মেয়ের জেদ না-মেনে তাঁর উপায় নেই ব'লে, বলতে গেলে তাঁর নিজেরই স্বার্থে? আমি যেন একটা বুনো জন্তু, আমাকে পাকড়ানো হ'লো, ভূরিভোজনে নধর ক'রে তোলা হ'লো—এবারে দেবীর কাছে বলি দেয়া হবে। আমি উপকৃত, তাই প্রতিদান দিতে বাধ্য; আমি বিক্রি হ'য়ে গিয়েছি, আমার 'না' বলার আর অধিকার নেই।—ছি! কী কুৎসিত চিন্তা, কী ক'রে মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারলাম? আমি কি জানি না যে ঋণ, প্রতিদান, কৃতজ্ঞতা—এ-সব কোনো কথাই ওঠে না এখানে? দয়া নয়, পরোপকার নয়, মহত্ত্ব নয়—হৃদয়ের সেই বিশুদ্ধ ও দুর্লভ মদ, যার স্পর্শে কবর ফেঁড়ে বেরিয়ে আসে মৃত মানুষ, দেবতা ফিরিয়ে দেন পাশবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ প্রাণপুরুষকে। আমি জানি সব, জেনেছি বহুদিন ধ'রে, কিন্তু তবু—কোথায় যেন নিজেরই কাছে অপমানিত হ'য়ে আছি, যেহেতু আমি আগের মতো আর স্বাধীন নেই। অপমানিত—অপহৃত—যেন আমি নিজের কাছ থেকে নিজেই চুরি হ'য়ে গিয়েছি। মাঝে-মাঝে আমার দম আটকে আসে এই বাড়িতে; কোনো তীব্র সুগন্ধের মতো এই স্নেহ, যাতে বুদ্ধি অসাড় হ'য়ে যায়; অতি রমণীয় এক চোরাবালিতে যেন পা দিয়েছি আমি; প্রবলভাবে আমাকে আকর্ষণ করছে অন্য একজন; আমি তার সঙ্গে ডুবে যেতে চাই, তার মধ্যে হারিয়ে যেতে চাই। না—অসহ্য, এ-ভাবে আর চলতে পারে না; আমাকে চ'লে যেতে হবে।

প্রথমে একটা ঝাপসা কল্পনা—ঝলক দিয়েই মিলিয়ে গেলো, তারপর ফিরে এলো, ছড়িয়ে পড়লো তার চিন্তায় আস্তে-আস্তে,

সপক্ষে অনেক যুক্তি জুগিয়ে যেতে লাগলো। সাংসারিক যুক্তি, উত্তম সুবুদ্ধি-প্রণোদিত। ভুল, আরতি, তুমি ভুল করছো; আমি তোমাকে বলছি, শোনো: স্ত্রী, সন্তান, সংসার, এ-সব আমার জন্য নয়। আমি কিছুই করিনি, শুধু রাশি-রাশি বই গিলেছি আর কথা বলেছি। তুমি হয়তো ভাবো আমি অন্যদের চাইতে আলাদা (আমিও তা-ই ভাবি মনে-মনে), কিন্তু তার কোনো প্রমাণ এখনো দিতে পারিনি—অন্যদের কাছে না, নিজের কাছেও না। তুমি তো জানো আমি কী-রকম উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী, তুমি তো জানো যে-কোনোরকম বাঁধন আমার অসহ্য। আর তাছাড়া—এই সাংঘাতিক রোগ, আমার বুকের মধ্যে লুকোনো, সেরে গিয়েও সারে না, কোনো-একদিন আবার ফেটে বেরোয়, হাওয়ায় উড়ে ঢুকে পড়ে অন্যদের মধ্যে। পারি না, আরতি, আমি পারি না এই রুগ্ন শরীর নিয়ে তোমাকে স্পর্শ করতে; পারি না আমার বিকৃত মনের জঞ্জাল-গুলোকে চাপাতে তোমার মনের ওপর; আমার ভাঙাচোরা এলোমেলো অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গে তোমাকে আমি জড়াতে পারি না। আমাকে তুমি ক্ষমা করো, আরতি, আমাকে তুমি ছেড়ে দাও।

এমনি, মনে-মনে, বার-বার-প্রশ্ন, উত্তর, প্রত্যুত্তর: নিজেরই সঙ্গে নিজের এক বিরাট বিসংবাদ। মুখ ফুটে আরতিকে কিছু বলবো, এমন সাহস আমার নেই; কেননা, জানি, সে একবার চোখ তুলে তাকালেই আমাকে হার মানতে হবে। আর তার কাছে কোনো মিথ্যে কথা, কোনো ছলছুতোর আশ্রয়? অসম্ভব। কিন্তু যদি কিছু করতে হয় তো এখনই, এই মুহূর্তে, দেরি করলে আর ফেরার পথ পাবো না। অতএব—সত্যি একদিন চ'লে গেলাম আমি, পালিয়ে, কাউকে কিছু না-ব'লে, নিজেকে কষ্ট দেবার উন্মাদ প্রেরণায়, আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দে যা ধ্বনিত হচ্ছে সেই ইচ্ছাকে চেপে গুঁড়ো ক'রে দেবার আগ্রহে—পুষ্ট চেহারা ও কুড়ি পাউণ্ড বর্ধিত ওজন নিয়ে একেবারে এক দমকে দিল্লিতে। আর তারপর—এই দেখা হ'লো।

শ্রীপতির কানে এলো কয়েকটা শব্দ—দিনের বেলার, গৃহস্থালির, উপস্থিতের। একটা চেয়ার টানার শব্দ—হরিদাসী খাবার ঘর ঝাঁট দিচ্ছে ; পেণ্ডুলামে একটা ঘণ্টা (সাড়ে-সাতটা হ'লো বোধহয়); রেডিওতে নিচু আওয়াজে সেতার। দশ বছর কেটে গেছে মাঝখানে। চ'লে এলাম—পালিয়ে এলাম তাকে ছেড়ে—আশ্চর্য! কবে যেন একদিন শুনলাম সে লণ্ডনে পড়তে চ'লে গেছে—খবরটা তেমন দাগ কাটলো না আমার মনে, বরং যেন স্বস্তি বোধ করলাম এই ব্যবধানে। আর এই এতগুলো বছরের মধ্যে—আমি কি কখনো ভেবেছি তার কথা? কই, মনে তো পড়ে না। আত্মরক্ষার জন্য শামুকের যেমন খোলশ, এও তেমনি। শুধু সেই দিল্লিতে তিন বছর—একটা আধা-সরকারি চাকরি করছি, থাকি দরিয়াগঞ্জে একটা শস্তা হোটেলে, আড্ডা খুঁজে বেড়াই না, স্বাস্থ্যের যত্ন নিই, আপিশ থেকে ফিরে সময় কাটাবার জন্য লিখতে বসি। না—সময় কাটানো নয়, কোনো শূন্যতা ভরাবার জন্য, কোনো হাহাকার চাপা দেবার জন্য। আমার ভেতর থেকে উঠে এসেছিলো কথাগুলো—কোনো গোপন উৎস থেকে আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে-বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জলের মতো। বা যেন এক বিষব্রণ ফেটে গেলো আস্তে-আস্তে, রক্ত পুঁজ দগদগে ঘা কাগজের ওপর কালো-কালো অক্ষরে ছড়িয়ে পড়লো। একটা শো-দেড়েক পৃষ্ঠার উপন্যাস, আট-দশটি ছোটোগল্প। ছাপা হ'লো কলকাতায় মাসিকপত্রে, রোগা দু-খানা বই বেরোলো। আর, যেহেতু লোকেরা সর্বদাই দেখতে চায় ফিল্মের পর্দায় কোনো নতুন মুখ, বইয়ের মলাটে কোনো নতুন নাম, যেহেতু তরুণতম রাজহাঁসটির আশায় পৃথিবীর শিশুরা প্রতি বসন্তে হ্রদের ধারে অপেক্ষা করে মধুমাখা রুটি হাতে নিয়ে, তাই—অন্য অনেকের মতোই—সেও পেলো প্রচুর প্রশংসা, তার প্রাপ্যের চাইতে অনেক বেশি। আর ঠিক তখনই, যখন সে ভাবছে ঐ লেখাই হয়তো কোনো-এক রকম অর্থ দিতে পারবে তার জীবনকে, এমনকি হয়তো ওরই মধ্য দিয়ে সে খুজে পাবে

এতদিন-পর্যন্ত অস্তিত্বহীন তার ভবিষ্যৎকে—ঠিক তখনই কলকাতার 'সুপ্রভাত'-এ তার চাকরি, যা তার দিক থেকে চেষ্টাহীনভাবে উড়ে এসে পড়েছিলো তার কাছে, কিছুটা তার নবলব্ধ সাহিত্যিক খ্যাতির জোরে। আর তারপর এমন একটি ঘটনা ঘটলো, যা তার নিজের পক্ষে প্রায় অবিশ্বাস্য। সে নাকি বলতে গেলে একজন ক্ষণজন্মা সাংবাদিক—এমনি একটা গুজব কানে এলো তার, 'সুপ্রভাত'-এ যোগ দেবার কয়েক মাসের মধ্যেই : ইতিহাস, ভূগোল, সাল-তারিখ, নানা দেশের ও মহাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলি—এ-সব তথ্যের ওপর এমন অনায়াস তাৎক্ষণিক দখল নাকি কমই দেখা যায় ; তার স্মরণশক্তি নাকি অসাধারণ ; তাছাড়া সহজ চলতি বাংলায়, সকলের পক্ষে বোধগম্য ও উপাদেয় ক'রে, খবর লেখার ও সাজাবার দক্ষতায় তার নাকি জুড়ি নেই। একটা সময়ে সে আবোলতাবোল যত বই পড়েছিলো—কিছু শেখার জন্য নয়, অলস কৌতুহল মেটাতে, আর হয়তো আড্ডায় অন্য সকলের ওপর টেক্কা দেবার হীন উদ্দেশ্য নিয়েও—তাও যে কোনো কাজে লাগতে পারে, তা আবিষ্কার ক'রে অবাক হ'লো সে, মনে-মনে একটু খুশি হ'লো না তাও নয়। দরিয়াগঞ্জের শস্তা হোটেলে নিঃসঙ্গতা ও মনস্তাপে ভরা রাত্রিগুলিতে সে চেষ্টা করেছিলো তার নিজের একটি লেখার স্টাইল গ'ড়ে তুলতে—সহজ, কিন্তু তরল নয় ; চিত্রকল্পগুলি ঘরোয়া, সাধারণ জীবনের তথ্য থেকে সংগৃহীত ; চেষ্টা করেছিলো তার চিন্তার কুটিলতাকে একটি প্রতারক সরলতার ছদ্মবেশ পরাতে ;—তাও কাজে লেগে গেলো। দ্রুত কেটে যেতে লাগলো বছরগুলি ; ধারাবাহিক ঊর্ধ্ব রেখায় এগিয়ে চললো 'সুপ্রভাত'-এর কাটতির অঙ্ক, প্রতিদ্বন্দ্বী 'দৈনিক হরকরা'কে অনেক পেছনে ফেলে ; লাফিয়ে-লাফিয়ে তারও উন্নতি সেই সঙ্গে ;—হঠাৎ দেখলো, সে একটি বৃহৎ, প্রতিপত্তিশালী দৈনিকপত্রের বার্তা-সম্পাদক, বিবাহিত, একটি পুত্রের পিতা, কলকাতার এক গণ্যমান্য নাগরিক ও সচ্ছল, নিরুদ্বেগ গৃহস্থ।

কেমন ক'রে হ'লো? আমি নিজেও জানি না, আমি নিজেই অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম। আপিশে একদিকে আমার সুনাম, অন্যদিকে আমার প্রতি অনেক সহকর্মীর প্রচ্ছন্ন বা প্রকট ঈর্ষা, মালিকদের মধ্যে দু-একজনের আমার বিষয়ে অনুমোদন, অন্য কারো-কারো সন্দেহ—যা অব্যক্ত থাকলেও অনুভব করা যায়—এই ধরনের একটা আবর্তের মধ্যে প'ড়ে গিয়ে আমি কি চেয়েছিলাম নিজের যোগ্যতা প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণ করতে, একটু অতিরিক্ত উৎসাহ নিয়ে কাজ করেছিলাম? কিন্তু শুধুই উৎসাহ ন হয়তো—আমি ভুলিনি যে পালে খুব বেশি জোরালো হাওয়া লাগলে নৌকো আবার উল্টে যেতেও পারে—সেই সঙ্গে একটু সতর্কতা, সকলের সঙ্গে মোটামুটি সদ্ভাব বজায় রেখে চলার মতো সুবুদ্ধি। আসলে, যেমন 'সুপ্রভাত'-এর ওপর নিঃসন্দেহে আমার, তেমনি 'সুপ্রভাত'-এরও প্রভাব পড়ছিলো আমার ওপর; আমি তখনকার মতো সর্বসাধারণের উপদেষ্টা ব'নে গিয়েছিলাম; বিশ্বাস করেছিলাম (যাকে কোনোমতেই অসত্য বলা যায় না) যে এই সম্প্রতি-স্বাধীন গণতন্ত্রাভিলাষী দেশকে টেনে তোলার পক্ষে একটি মহৎ ও হাতে-হাতে-ফলপ্রসূ উপায় হ'লো মাতৃভাষায় সুসম্পাদিত দৈনিকপত্র। সব-কিছু নিয়ে ঠোঁট-বাঁকানো ব্যঙ্গ তো অনেক হ'লো, এবার কিছু কাজের মতো কাজ করা যাক—এমনি আমার মনের ভাবটা তখন। কিন্তু এই কৃতী হবার চেষ্টা আমার জীবনটাকে এমন বদলে দেবে, তা কল্পনাও করিনি।

বিয়ে কেন করেছিলাম? জানি না, কোনো কারণ ছিলো না। বা হয়তো উন্নতির ফাঁদে পড়লে অমনি হয় মানুষের। হয়তো টাকার চর্বিতে মাথার ঘিলুও ভেজাল হ'য়ে যায়। কথাটা প্রথম তুলেছিলো আমাদের চীফ রিপোর্টার পরমেশ, তার স্ত্রীর একটি পিসতুতো বোনের উল্লেখ ক'রেছিলো—অনুমান করি, তার স্ত্রীর পরামর্শেই প্ররোচিত হ'য়ে। আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম অবশ্য, কিন্তু পরমেশ মাঝে-

মাঝেই ফিরে আসে ঐ প্রসঙ্গে, মজা ক'রে বলে—'আমি তোমাকে কথা দিতে পারি, শ্রীপতি, ময়নার মধ্যে অসাধারণ কিছুই নেই—স্বাস্থ্য ভালো, মুখশ্রী মন্দ না, দশাচল বি. এ. পাশ—এর বেশি কিছুই বলার নেই তার বিষয়ে। অর্থাৎ—সে ভালো বৌ হবে।' কোনো-দিন বলে, 'তোমার যদি হোটেলই বেশি পছন্দ হয় সে-কথা আলাদা, তবে যদি বাড়ির স্বাদ পেতে চাও তা ময়না হয়তো দিতে পারবে তোমাকে।' আবার কোনোদিন হঠাৎ আমার ঘরে ঢুকে বলে, 'ভয় পেয়ো না, আমি ঘটকালি করতে আসিনি, আমি বুঝে নিয়েছি ময়নার অত ভাগ্য নয় যে তোমার বৌ হ'তে পারবে।' তারপর একদিন পরমেশ বললো, 'সামনের শনিবার তুমি ফাঁকা আছো নাকি, শ্রীপতি? তাহ'লে আমাদের সঙ্গে চৈনিক ভোজে যদি যোগ দাও।' 'তোমরা মানে?' 'আমি, আমার স্ত্রী, আর—' আমি ভুরু বাঁকিয়ে বললাম, 'তোমার শ্যালিকা?' 'তোমার আপত্তি থাকলে অবশ্য—' 'না, না—আপত্তির আর কী আছে? তোমার আর যে-ক'টি শ্যালিকা আছে তাদের সকলকে যদি নিয়ে আসো সে তো আরো ভালো!' ব'লে আমি দরাজ গলায় হাসলাম। 'কোনো উপলক্ষ আছে?' পরমেশ লাজুক হেসে জবাব দিলো, 'না, না—এমনি।'

বেশ ঝরঝরে মেজাজে, কিছুটা কৌতুক আর কিছুটা কৌতূহলের ভাব নিয়েও, গিয়েছিলাম সেদিন পরমেশের নিমন্ত্রণে ক্যান্টন রেস্তোরাঁয়। গিয়ে বুঝলাম, একটা উপলক্ষ আছে সত্যি—পরমেশের বিয়ের তারিখ সেটা—ওদের বিয়ের পাঁচ বছর পুরলো, আর স্পষ্টত ওদের বিয়েটা খুব সুখের হয়েছে। আমরা পাঁচজন ব'সে আছি টেবিলে—আমি, সস্ত্রীক পরমেশ আর তার দুটি শ্যালিকা—ছোটোটির বয়স বছর বারো—উচ্ছল, কিন্তু ইতিমধ্যেই কৈশোর-সচেতন, আর কিছুটা দিদির গরবে গরবিনী, আর দিদিটি—অর্থাৎ ময়না—তার চেহারা সাঁওতালনি ধরনের পুষ্ট, শামলা রং, কথা বলে মেয়েদের পক্ষে একটু মোটা গলায়,

আঁট-ক'রে-পরা নাইলনের শাড়িতে থেকে-থেকে বর্তুল রেখা ঝিলিক দিচ্ছে। পরমেশ আর আমি বিয়ার খাচ্ছি, আর আস্তে-আস্তে আবহাওয়াটা বেশ লাগছে আমার, ময়নাকে একটু ঘন-ঘন লক্ষ করছি, উপভোগ করছি তার আড়চোখে তাকানো, তার লজ্জার ভান, আর মনে-মনে বলছি, 'আমি চিনি তোমাকে—তুমি সেই মেয়েদেরই একজন, যারা ঘ'ষে-ঘ'ষে বি. এ. পাশ ক'রে পথ চেয়ে ব'সে আছে—চাকরি করছে না, যেহেতু বাড়ির অবস্থা ভালো আর নিজেদের সে-রকম যোগ্যতা বা ইচ্ছেও নেই ; বিয়ে হয়নি, যেহেতু পরিবারের উচ্চাশামাফিক কোনো স্বর্ণচন্দ্রের উদয় হয়নি এখনো ; পঁচিশ বা ছাব্বিশ বছরের টশটশে যৌবন নিয়ে যারা শুধু অপেক্ষা করছে কোনো সমজদারের জন্য।'—কিন্তু তবু, মনে-মনে ব্যঙ্গের বুলি আওড়ালেও, হঠাৎ ভালো লেগে যাওয়ার আমেজটাকেও কাটাতে পারলাম না—কাটাতে চাইলাম না—যেন নিজের সঙ্গে একটা মজাদার খেলা খেলছি, সেটাকে আরো খানিকদূর গড়াতে দিলেও ক্ষতি নেই, সময় বুঝে কেটে পড়লেই হবে। পরমেশের স্ত্রীও দেখলাম সুরসিকা—আমরা তিন জনে বেশ জমিয়ে তুলেছি হাসিঠাট্টা, খুচরো গল্প ; ময়না বেশি কথা বলছে না, শুধু হাসছে মাঝে-মাঝে, তাও বেশি হাসছে না—আমার উদ্দেশে তার জামাইবাবুর কোনো সূক্ষ্ম আদিরস-ঘেষা রসিকতা শুনে খাবার প্লেটে মুখ নামাচ্ছে—আর ওর সঙ্গে কখনো চোখোচোখি হ'লেই পরমেশের মুখে শোনা 'বৌ' কথাটা যেন শুড়শুড়ি দিচ্ছে আমাকে, মনে হচ্ছে হোটেলের চাইতে 'বাড়ি' সত্যি ভালো কিনা, তা যাচাই ক'রে দেখলে হয়—আবার ও-রকম ভাবছি ব'লে নিজেরই হাসি পাচ্ছে—এমনি আমোদে তরতর ক'রে দু-ঘণ্টা সময় কেটে গেলো। চললো কিছুদিন পাতানো কোর্টশিপের পুতুল-নাচ—একটা ফিল্ম, ময়নার পিত্রালয়ে আমার চায়ের নিমন্ত্রণ (পাত্র-পাত্রীকে 'একা হবার' সুযোগ দিয়ে অন্যেরা অদৃশ্য হলেন) আর-একটা ফিল্ম (সেদিন ময়নাকে পৌঁছিয়ে দিয়েই পরমেশকে অন্য কাজে চ'লে

যেতে হ'লো)—আর তারপর, ময়নার দিক থেকে সর্বদেহমনের আকুলতা ও প্রস্তুতি নিয়ে, আর আমার দিক থেকে কিছুটা খেলাচ্ছলে আর কিছুটা যেন এক অলীক সুখের উ[illegible]তে (যেহেতু সেদিন চীনে রেস্তোরাঁয় মুহূর্তের জন্য একটি সুখী দম্পতিকে আমি দেখে-ছিলাম)—বিয়ে হ'য়ে গেলো। পরে শুনেছিলাম, ময়নার মা-র একটু আপত্তি ছিলো আমার বয়স পঁয়ত্রিশ ব'লে, কিন্তু আমার মাস-মাইনের কাছে তিনি হার মেনেছিলেন।

শ্রীপতির শরীরের মধ্যে স্নায়ুগুলো যেন মুচড়ে উঠলো হঠাৎ, বিছানায় পা ঠুকলো একবার, চাদরটাকে ঠেলে সরিয়ে দিলো গা থেকে। থাক—এ-সব ভেবে কী হবে, এখন উঠে পড়ি, ঘুরে আসি কোথাও। কিন্তু তার মন তাকে রেহাই দিলো না। কী হয়েছিলো? আমাকে কি ভূতে পেয়েছিলো হঠাৎ? কী ক'রে আমি ভুলতে পেরেছিলাম যে আমি একটা পোকায় কাটা মানুষ, দাগি যক্ষ্মা-রোগী—কী ক'রে পেরেছিলাম ঐ কথাটা পরমেশের কাছে গোপন করতে? কী-সহজ ছিলো আমার পক্ষে বিয়ের ফাঁদ এড়িয়ে যাওয়া—শুধু ঐ একটি কথা বলতাম যদি! আর এই আমি একদিন জাঁক ক'রে মনে-মনে বলেছিলাম—'স্ত্রী, সন্তান, সংসার—ও-সব আমার জন্যে নয়! আমি আলাদা—আমি স্বাধীন!' আর সেই দাপটে পালিয়ে গিয়েছিলাম···তা কে ছেড়ে। দ্যাখো, আমি ছেড়ে দিতেও পারি! কষ্ট দিতে, কষ্ট পেতে আমার ভয় নেই! দ্যাখো, আমার ইচ্ছাশক্তির কী জোর! মিথ্যে—সব মিথ্যে—সবই নিজের সঙ্গে জোচ্চুরি তোমার—কিন্তু এখন আর ছটফট কোরো না; মেনে নাও যে এই চাকরি, এই বাড়ি, এই বিছানা—এ-ই তোমার সত্যিকার স্থান।

শ্রীপতির মনে পড়লো বিয়ের পরে প্রকৃতিঠাকরুন কেমন সাবলীল-ভাবে কোলে টেনে নিয়েছিলেন তাকে, কেমন সহজে শুধু শরীর নিয়ে সে বেঁচে ছিলো কয়েকটা মাস, প্রণয়বন্যায় গা ঢেলে দিয়েছিলো। আর সেই ক-মাসের মধ্যেই বার্তা-সম্পাদকের পদ পেলো সে (স্ত্রী-

ভাগ্যে ধন।), তার আয়ের অঙ্ক ময়নার পিত্রালয়ের উচ্চাশাকেও ছাড়িয়ে গেলো।—এবং আরো একটি ঘটনা ঘটলো, যাতে হঠাৎ যেন চমকে জেগে উঠলো শ্রীপতি।

ধরাধার্য ঘটনা, রোজ ঘটছে, ঘরে-ঘরে ঘটছে, কিন্তু শ্রীপতির গায়ে যেন কাঁটা দিলো এ-কথা ভেবে যে তারই রোগদুষ্ট বিষাক্ত বীজ থেকে জন্ম নিতে চলেছে অন্য একটা মানুষ। মাস দুই পর্যন্ত সে ব্যাকুল-ভাবে আশা করেছিলো যে অনুমানটা মিথ্যা—তিন আলাদা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলো ময়নাকে, তিনজনেই তাকে পিতৃত্বলাভের আশ্বাস দিয়েছিলেন। তারপর ভাবলো হয়তো দৈবাৎ গর্ভপাত হবে, কিন্তু সে-রকম কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। কেমন যেন আতঙ্ক হ'লো শ্রীপতির, যখন সে লক্ষ করলো পঞ্চম মাস থেকে ময়নার উদর ও স্তনমণ্ডলের লক্ষণীয় স্ফীতি, বেড়ে-চলা খিদে, তার মুখে এক নতুন ধরনের জান্তব শ্রী, তার হাসিতে এক নতুন লোলুপতা—আর তারপর শুনলো ময়নার পেটের ওপর কান পেতে অজাত মানুষের নির্ভুল হৃৎস্পন্দন। নিজের ওপর কেমন ঘেন্না হ'লো শ্রীপতির, রাগ হ'লো ময়নার ওপর, মনে-মনে সে দোষী করলো ময়নার উৎসুক, গ্রহণ-তৎপর শরীরটাকে, দোষী করলো পরমেশ, পরমেশের স্ত্রী, আর ময়নার বাপের বাড়ির সব লোকেদের—যেন তাদেরই কোনো চক্রান্তের ফল এটা, যেন তাকে তারা পারিবারিক জালে বেঁধে ফেলতে চাচ্ছে—ঐ শিশুটির জন্ম ঘটিয়ে। এমন কি হ'তে পারে না মৃত শিশুর জন্ম দিলো ময়না, বা আঁতুড়েই তার জীবন শেষ হ'লো? এ-রকম কত হয় শোনা যায়। সে হবে এক সুস্থ, সবল শিশুর পিতা—এ কি সম্ভব? কিন্তু ময়না তার মা-বাবাকে আহ্লাদিত ক'রে যে-শিশুটির জন্ম দিলো তার ওজন সাড়ে-আট পাউণ্ড, কণ্ঠবাদনে ও অঙ্গবিক্ষেপে প্রচুর স্বাস্থ্য প্রকাশ পাচ্ছে, তার মায়ের বুক থেকে দুধ টেনে নেবার প্রবল শব্দে শ্রীপতি কেঁপে উঠলো। অদৃষ্টের বিদ্রূপ—যে-জীবনকে সে এড়াতে চেয়েছিলো তার প্রতিশোধ!

এই সময় থেকে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটলো শ্রীপতির মনে ও জীবনযাত্রার ধরনে। 'সুপ্রভাত' বিষয়ে সব আগ্রহ সে হারিয়ে ফেললো হঠাৎ; নিজেকে আর মিলিয়ে দিতে পারে না তার চাকরির সঙ্গে, শুধু যান্ত্রিক অভ্যাসবশত আগের মতই নিপুণভাবে কাজ ক'রে যায়। এমনকি চাকরি ছেড়ে দেবার কল্পনা নিয়েও খেলা করে মাঝে-মাঝে, দিল্লির নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাগুলির কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে—যেন ইচ্ছে করে সেই তীব্র তেতো দুঃখের স্বাদ আবার ফিরে পেতে। এতদিন পরে তার মনে পড়লো সেই প্রথম দু-খানা বইয়ের পরে সে আর-কিছু লেখেনি—যদিও কলম চালিয়েছে অবিরাম, আর তার সাংবাদিক 'রম্যরচনা'র একটি সংকলন বর্তমানে একটি 'বেস্ট-সেলার' ব'লেও গণ্য (এবং শোভাবাজার, ডায়মণ্ডহার্বার বা বেহালার বিবিধ সাহিত্য-সমিতির কাছে, আর দুর্গাপুর বা ময়ূরভঞ্জ বা এলাহাবাদের বাঙালিদের কাছেও সে 'হালকা হাওয়া'র লেখক ব'লেই খ্যাতিমান); মনে পড়লো তার প্রথম বই দুটি বহুকাল ছাপা নেই, আর দিল্লিতে ব'সে আরো যে দু-একটা লেখা সে ভেবেছিলো সেগুলি তাকে অনেক আগেই পরিত্যাগ করেছে। সম্প্রতি সে মাঝে-মাঝে চেষ্টা করেছে সেগুলোকে ফিরিয়ে আনতে, বা নতুন কোনো লেখা ভাবতে; কিন্তু তার ভেতরটা যেন শূন্য, নিঃসাড়; সেখানে আর ভেসে ওঠে না কোনো অদৃশ্য রূপ, নিঃশব্দ কোনো সংলাপও শোনা যায় না; তরুণতম রাজহাঁসটি আজ খিড়কি পুকুরের মোটাসোটা পাতিহাঁসে পরিণত হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত নিজের স্বাস্থ্যের বিষয়ে মনোযোগী ছিলো সে; কিন্তু এবার তার শরীরটার ওপর কেমন-একটা ঘৃণা জন্মালো তার (জোচ্চোর শরীর, যা তাকে বিয়ের পথে ঠেলে এনেছিলো!)—মনে হ'লো, যে-ফাঁদের মধ্যে সে প'ড়ে গেছে তা থেকে বেরিয়ে আসার একটা সম্ভবপর উপায় হ'তে পারে রোগ—বিশেষত কোনো ছোঁয়াচে রোগ যা মানুষকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়; সে যেন মনে-মনে প্রায় ইচ্ছে করলো

তার ফুশফুশে আবার বাসা বাঁধুক বীজাণু। তার দৈনন্দিন জীবনকে সে ক'রে তুললো স্থচিন্তিতভাবে নিয়মহীন ও উচ্ছৃঙ্খল; সময়মতো খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিলো, আত্মসমর্পণ করলো মদিরা দেবীকে, ক্লান্ত ও প্রেরণাহীন মন নিয়ে যৌবনের উদ্দামতাকে ফিরে পেতে চেষ্টা করলো। তার বাড়ি, ময়নার অতি যত্নে সাজানো পাঁচিল-ঘেরা আস্ত একতলাটি—তা খ'সে পড়লো তার জীবন থেকে, হ'য়ে উঠলো নেহাৎই একটি রাত্রে ঘুমোবার জায়গা, যেখানে কাজে-অকাজে ক্লান্ত হ'য়ে, বা মদে বিহ্বল হ'য়ে—অগত্যা সে ফিরে আসে। তার এই পরিবর্তন ময়নার নজর এড়ায়নি অবশ্য; একটা সময়ে কিছুটা অশান্তি হয়েছিলো তার মদের বাড়াবাড়ি নিয়ে; কিন্তু শ্রীপতি খুব সাবধানে এড়িয়ে গেছে ঝগড়াঝাঁটি; বিছানায় এসে সদ্ভাবস্থাপনের বাঁধা উপায়টি অবলম্বন করেছে মাঝে-মাঝে; কোনো সাংসারিক কর্তব্যে ত্রুটি হ'তে দেয়নি; তার নিজের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হিন্দি ফিল্ম দেখেছে ময়নার পাশে ব'সে; ফেরার পথে হঠাৎ কোনো শো-কেসের সামনে গাড়ি থামিয়ে বলেছে, 'ঐ শাড়ির রংটা বেশ নতুন ধরনের। দেখবে নাকি?' এমনি ক'রে, ছোটো-ছোটো, নির্দোষ কৌশলের সাহায্যে, সে ময়নার মনে এই ধারণা ফিরিয়ে এনেছে যে সে একজন অসাধারণ ভাগ্যবতী স্ত্রী; তাকে সাহায্য করেছে স্বামীর প্রতি ময়নার এক অন্ধ প্রশংসার দৃষ্টি, আর তার নতুন মাতৃত্ব, সন্তানের প্রতি স্নেহের উচ্ছ্বাস, আর তার বাপের বাড়ির লোকেদের কাছে স্বামীকে প্রায় এক 'আদর্শ পুরুষ' হিশেবে উপস্থিত করার চেষ্টা। 'এ-ই আমার জীবন,' মনে-মনে বললো শ্রীপতি, 'বাইরে থেকে দেখতে গেলে চমৎকার, কিন্তু ভেতরে কোনো শাঁস নেই, কেন্দ্র নেই; কাজ করছি, কথা বলছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি নেহাৎই ও-সব করতে হয় ব'লেই; আর চেপে রাখছি, দিনের পর দিন, আমার বিতৃষ্ণা। এ-ই আমার জীবন—আর আমার বয়স মাত্র আটত্রিশ, আরো অনেক লম্বা পাড়ি সামনে প'ড়ে আ[illegible]

দ্রুত একটা ভঙ্গি হ'লো শ্রীপতির শরীরে, বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। তার শব্দ শুনে ছুটে এলো ময়না। 'এখনই উঠে পড়লে? আরো খানিকটা ঘুমিয়ে নাও!' 'নাঃ।' 'চা দেবো?' 'আগে স্নান ক'রে নিই।' দাঁত মাজা, দাড়ি কামানো, স্নান, খাওয়া—ভাগ্যিশ এগুলো আছে জীবনে, দিনের পর দিন একই রকম সহজে ক'রে ওঠা যায়, কোনো নতুন চেষ্টার দরকার করে না। পাট-ভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে বেরিয়ে এসে দেখলো, খাবার টেবিলে তার জন্য অপেক্ষা করছে ময়না আর ময়নার মা। সে যতক্ষণ চা আর অমলেট আর সন্দেশ খাচ্ছে, ততক্ষণ মহিলা দু-জন একটি ছোটোখাটো রাজনৈতিক তর্ক চালালেন; ময়না কংগ্রেসকে দোষ দিচ্ছে মন্ত্রীসভা ভেঙে যাবার জন্য, আর তার মা বলছেন নিজেদের মধ্যে দলাদলির জন্যই হ'লো এটা। তর্কটা যখন কয়েক মিনিটের মধ্যে রাষ্ট্রপতি-শাসন বনাম গণতন্ত্রে পৌঁছলো, তখন শ্রীপতির গলায় বিষম ঠেকলো হঠাৎ; ময়নার মা তার সামনে এক গ্লাশ জল রেখে বললেন, 'তুমি কী বলো, শ্রীপতি?' এক ঢোঁক জল গিলে, অমায়িক-ভাবে হেসে শ্রীপতি জবাব দিলো, 'আমি ও-সব কিছু বুঝি না।' ময়নার মা একটু অন্যভাবে হেসে বললেন, 'তোমার এডিটরিয়েল চমৎকার হয়েছে আজ। চারটে কাগজ পড়লাম সকাল থেকে, তোমারটাই সবচেয়ে ভালো।' কোনো সুস্থ মানুষ (তার মতো দুর্ভাগা কোনো সাংবাদিক নয়) এক সকালের মধ্যে চারটে খবর-কাগজের এডিটরিয়েল পর-পর প'ড়ে উঠতে পারে কেমন ক'রে, শ্রীপতি তা ভেবে পেলো না; খাবার টেবিলের ও-পাশে গুছিয়ে-রাখা কাগজগুলোর প্রকাণ্ড হেডলাইনে চোখ পড়ামাত্র চোখ সরিয়ে নিলো সে, চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ময়না জিগেস করলো, 'আবার বেরুচ্ছো নাকি এখনই?' 'ঘুরে আসি একটু।' ময়না প্রতিবাদ করলো না, শ্রীপতির সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে এলো বাইরের বারান্দায়, তারপর নিচু গলায় কথা বলতে-বলতে

ফটক পর্যন্ত এলো। 'কখন ফিরবে?' 'দেখি।' 'তাড়াতাড়ি ফিরো— খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিয়ো দুপুরবেলায়—কেমন?' 'হ্যাঁ— নিশ্চয়ই।' 'মা আজ তেল-কই রাঁধবেন তোমার জন্য, আর ইলিশের পাতুরি—এসো কিন্তু সময়মতো।' এর উত্তরে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ করলো শ্রীপতি। 'শোনো—মা আজ তিনদিন ধ'রে এসে আছেন, কালই হয়তো ফিরে যাবেন পাতিপুকুরে, তুমি কিন্তু একদিনও একটু ভালো ক'রে কথা বললে না ওঁর সঙ্গে।' 'কী-রকম কাজের চাপ দেখছো তো।' 'কিন্তু আজ আর আপিশে যাচ্ছো না নিশ্চয়ই?' 'দেখি।' শ্রীপতি রাস্তায় এসে গাড়ির দরজা খুললো, ফটকের ওপাশ থেকে ময়না আর-একবার বললো, 'একটার মধ্যে ফিরবে—ঠিক তো?' শ্রীপতি মনে-মনে বললো, 'আমাকে এখন এমন কোথাও যেতে হবে যেখানে রাজনীতি নিয়ে কেউ কথা বলবে না।' হিমেন্দুকে মনে পড়লো তার।

ডান দিকে কফির পেয়ালা, বাঁ দিকে একটি জ্বলন্ত সিগারেট-সমেত ছাইদান, সামনে একটি ইস্পাত-রঙের পোর্টেবল অলিভেটি (ম্যাডিসন, উইস্কনসিনে কিনেছিলো), টেবিলে আর টেবিলের লাগোয়া শেলফে অনেক বই ছড়ানো, ইংরেজি ভাষার দুটো অভিধান (অক্সফোর্ড আর ওয়েবস্টার), কয়েকটা পত্রিকাও—যেমন 'জর্নাল অব কম্প্যারেটিভ এস্থেটিক্স', 'ইয়েল ফ্রেঞ্চ স্টাডিজ়'-এর একটা বিশেষ সংখ্যা (যাতে পেত্রুস বরেলের ওপর নতুন আলোকপাত করা হয়েছে), 'জর্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি'র দুটো ১৯৫৩-র সংখ্যা (যা সে দৈবাৎ ধরমতলার ফুটপাতে পেয়ে গিয়েছিলো), আর কেম্ব্রিজ, ইংলণ্ডে ছাপা অধুনালুপ্ত 'ডেডেলাস' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি (ন্যুয়র্কের গথাম বুক মার্ট জোগাড় ক'রে দিয়েছিলো তাকে)—এই সব সহায়সম্বল নিয়ে হিমেন্দু চেষ্টা করছিলো ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ লিখতে। ডিসেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদে সর্বভারতীয় ইংরেজি-শিক্ষক-সম্মেলন হবে, তাতে পড়ার জন্য বিদ্বজ্জনশোভন প্রবন্ধ। আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদের সঙ্গে প্রথমে সিম্বলিস্ট কাব্যদর্শন, তারপর ইঙ্গ-মার্কিনী নিউ ক্রিটিসিজ়ম-এর (এখন আর তা নতুন নেই অবশ্য) তুলনা ও প্রতিতুলনা তার অভিপ্রায়। বিষয়টা তার নিজের বেশ পছন্দ (অন্তত কয়েকদিন আগে পর্যন্ত তা-ই ছিলো), এ নিয়ে সে কিছুটা ভেবেওছিলো এক সময়ে (অন্তত তা-ই ধারণা ছিলো তার): কিন্তু এখন লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে যে ব্যাপারটা তার নিজের কাছেই ঝাপসা; যা-কিছু লিখতে যায় তারই বিরুদ্ধে কোনো-না-কোনো যুক্তি মনে প'ড়ে যায় ব'লে তার আঙুল শূন্যে উঠেও

টাইপরাইটারের চাবির ওপর নামতে পারে না। সে-মুহূর্তে তার সামনে আয়না থাকলে হিমেন্দু দেখতে পেতো, তার কপালে খুব মোটা হ'য়ে রেখা পড়েছে, চশমার পেছনে ছোটো দেখাচ্ছে চোখ, ঠোঁট বেঁকে আছে ব'লে গালের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে। পোড়া কাগজের গন্ধ এলো তার নাকে, তাকিয়ে দেখলো জ্বলন্ত সিগারেটটা ছোটো হ'তে-হ'তে অ্যাশট্রে থেকে খ'সে পড়েছে, কালো হ'য়ে গেছে টাইপ-করা একটা পাতার কোণের দিকটা। তাড়াতাড়ি দুমড়ে দিলো আধ-ইঞ্চি-পরিমাণ সিগারেটটাকে, পোড়া কাগজটা টেনে নিয়ে দু-এক লাইন প'ড়েই সরিয়ে রাখলো।—বাজে, অখাদ্য। কেন এই চেষ্টা, কেন ছেড়ে দিই না—আমি এটা না-লিখলে, বা হায়দ্রাবাদে না-গেলে, কী-ক্ষতি হবে জগৎসভ্যতার? হায়দ্রাবাদে ঐ সম্মেলন না-হ'লেই বা কী-ক্ষতি হবে? কিছুই না, কোনো কারণ নেই এ-সবের—শুধু সময় কাটানো। কিছু করছি, কিছু হচ্ছে, আমি উপস্থিত আছি, ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়াচ্ছি—শুধু এই অনুভূতিটুকুর জন্য। জানি না অন্যদের কথা, আমার তো তা-ই মনে হয়। কিংবা হয়তো অন্যেরা টের পায় না, আমি পাই। এই যে এক-একটি পঞ্চাশ মিনিটের ক্লাশ নেবার জন্য আমি সারা সকাল বইয়ের ওপর নাক গুঁজে থাকি, সেশন শুরু হবার আগেই ছক কেটে ফেলি কোন ক্লাশে কোন তারিখে কী পড়াবো (যদিও আমাদের দেশের খুচরো ছুটি আর ধর্মঘটের ঝামেলায় নিয়মমাফিক কিছুই হ'য়ে ওঠে না)—সবই সময় কাটাবার জন্য। আসলে আমার কিছু করার নেই, তাই। আমার উইস্কনসিনের মাষ্টারমশাইরা আমার মধ্যে 'স্কলার্লি অ্যাকুমেন' দেখতে পেয়েছিলেন; রোমান্টিক সমালোচনা বিষয়ে আমার থীসিসের (পুরো শিরোনামা: '১৭৯৮ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে সমালোচনার পদ্ধতি বিষয়ক তুলনামূলক সন্দর্ভ') প্রশংসা করেছিলেন ডর্সিনি, ভ্যান ষ্ট্রোম ও লেলিভেল্ডের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপকেরা; তখন প্রায় বিশ্বাস

করেছিলাম তাঁদের কথায়, নিজের বিষয়ে কিছুটা উচ্চতর ধারণা নিয়ে কলকাতায় ফিরেছিলাম। কিন্তু এখন—মাত্র দেড় বছর পরে মনে হচ্ছে আমার ঐ নিবন্ধের পেছনে কোনো আবিষ্কারের উত্তেজনা ছিলো না; ছিলো শুধু তিন-বছরব্যাপী নিয়মিত, নিদ্রাহীন, যান্ত্রিক ও কুৎসিত খাটুনি; শুধু দায়িত্বপালন ক'রে ওঠার নীরস তৃপ্তি; বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি যে-বৃত্তি পাচ্ছি তার বিনিময়ে অন্তত দৃশ্যত কিছু দিতে পারার নিরানন্দ ও স্বল্পায়ু সুখ। আমার পরীক্ষকেরা কি ধরতে পারেননি যে আমি জমকালো গ্রীক-লাতিন শব্দের ধোঁয়া ছেড়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম আমার ধারণার অস্পষ্টতা, দু-শো একান্নটি ফুটনোটের তলায় চাপা দিয়েছিলাম আমার দৃষ্টির অভাব—না কি তাঁরা নিজেরাও তা-ই ক'রে থাকেন, না কি চাকরি বজায় রাখা ও তাতে উন্নতি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যায়ামকেই বলে পাণ্ডিত্য? আমি যা লিখেছিলাম আর এখন যা লিখতে যাচ্ছি, তা তো শুধু সমালোচনার সমালোচনা—ভাষ্যের ওপরে ভাষ্য, কোনো আদি টীকার ওপর ছিয়াত্তর নম্বর উপটীকা হয়তো—কী-মূল্য এ-সবের? আর সমালোচনা—তারই বা মূল্য কতটুকু? যাতে সত্যি এসে যায় তা হ'লো কবিতা—না, কবিতাও নয়, জীবন, বেঁচে থাকা, বেঁচে থাকার সহজ আনন্দ। কিন্তু সেই জীবন—কোথায়?

অন্য কোনো সময় হ'লে হিমেন্দু হয়তো ঠিক উল্টো দিক থেকে দেখতো এই ব্যাপারটাকে; ভাবতো (আর সে তা বিশ্বাস করে না তা নয়, এটা প্রচারও করে বন্ধুমহলে)—ভাবতো যে পণ্ডিতেরাই যুগ-যুগ ধ'রে টিকিয়ে রাখেন সাহিত্যকে; যাকে ঐতিহ্য বলে, তাঁরাই সেটাকে চালিয়ে নিয়ে যান এক যুগ থেকে অন্য যুগে; পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি না-থাকলে (যেহেতু জনসাধারণ সর্বদাই মেতে থাকে শুধু সাম্প্রতিক ও সদ্যতনকে নিয়ে) কেউ হয়তো আর কালিদাস পড়তো না আজকের দিনে, শেক্সপীয়রের কোনো নাটক ছাপা থাকতো না, দান্তের নাম অস্পষ্ট একটা জনশ্রুতি হ'য়ে যেতো।

যে-সব কবি পাণ্ডিত্য নিয়ে মনোরম বিদ্রূপ করেছেন (যেমন ইয়েটস, জীবনানন্দ) তাঁদের লেখা আজ থেকে একশো বছর পরেও যদি পঠিত ও প্রচারিত হয়, তাও হবে ঐ রক্ষণশীল ও আক্ষরিক অধ্যাপকদের জন্যই। কিন্তু সে-মুহূর্তে তার নিজের পেশার সপক্ষে একটি যুক্তিও মনে পড়লো না হিমেন্দুর ; চারদিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলো না, যা তার অস্তিত্বকে সমর্থন করে। অনেক বই আছে তার ঘরে, কিন্তু প্রাণের চঞ্চলতা নেই ; অনেক তথ্য তার মগজে (হয়তো কিঞ্চিৎ চিন্তাশক্তিও), কিন্তু হৃদয় যেন বেকার হ'য়ে প'ড়ে আছে। আসলে হিমেন্দু উন্মন ছিলো তখন, মেজাজটা ঠিক ছিলো না। একটু আগে সুভদ্রা চালিহার চিঠি পেয়েছে ; তার ডিনারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে সে, কাল আটটায় আসবে তার বাড়িতে। এই খবরটি হিমেন্দুকে পুলকিত না-ক'রে বরং দুশ্চিন্তায় ডুবিয়ে দিয়েছে। ডিনার—তার মানে হয়তো ঘণ্টা তিনেক কাটাতে হবে সুভদ্রার সঙ্গে—একা—নানাভাবে আপ্যায়ন করতে হবে তাকে ; কী কথা বলবে ? একবার (বাংলায় এডওঅর্ড অল্‌বীর একটা নাটকের অভিনয় দেখার পর) তাকে বোঝাতে গিয়েছিলো যে এখনকার পশ্চিমী সাহিত্যে যা-কিছু নতুন ও নতুনতর চেষ্টা হচ্ছে, সেই সবেরই মূল হচ্ছে কাফকা ; কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরেই সুভদ্রার মুখে ক্লান্তির ছায়া দেখতে পেয়ে কিছুটা অপ্রস্তুতভাবে থামতে হয়েছিলো তাকে। আর্ট-ফিল্ম, পপ্‌-আর্ট, হিপি-জীবনদর্শন—এই সবই সে চেষ্টা করেছে একে-একে, কিন্তু কোনোটাতেই এগোতে পারেনি। নীরবতার মস্ত-মস্ত খানাখন্দ মাঝে-মাঝে গজিয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে, যদিও তারা চেনাশোনার এমন একটা স্তরে আছে এখন, যাতে পরস্পরকে বলার মতো অনেক কথা তাদের থাকা স্বাভাবিক। অন্যদের মধ্যে দেখা হ'লে বেশ কেটে যায় সময়টা, দু-পক্ষই বেশ সহজ ও হাসিখুশি ; কিন্তু একা হ'লেই বিশ্রী একটা আড়ষ্টতা নামে যেন। কোনো-একটা কথা বোধহয় শুনতে চাচ্ছে সুভদ্রা, হিমেন্দুও বলবে

ব'লে ভাবছে—কিন্তু পারে না—আসলে বোধহয় চায় না বলতে। সে এখন বিয়ে করবে ভাবছে, মনস্থির করেছে বলতে গেলে, তার পুরোনো দলের মধ্যে শুধু সে-ই এখনো অবিবাহিত, তার বয়স পঁয়ত্রিশ হ'লো, এর পরে বড্ড দেরি হ'য়ে যাবে হয়তো; তাছাড়া তার বই-পড়া বিদ্যে আর মগজ-ভর্তি তথ্যের নীরসতার একমাত্র প্রতিষেধক হ'লো—নারীর স্পর্শ, শারীরিক অর্থে, অন্য সব অর্থেও—অন্তত তা-ই মনে হচ্ছে হিমেন্দুর। দাম্পত্যের দিকে লক্ষ রেখেই সুভদ্রা চালিহার সঙ্গে মেলামেশা করছে সে (সুভদ্রার দিক থেকেও তা-ই); এবং আরো দুটি মেয়েকেও সম্ভবপর ব'লে মনে হচ্ছে তার—তার এম. এ. ক্লাশের ছাত্রী চটকদার চন্দ্রিকা (মাঝে-মাঝে আসে তার বাড়িতে পড়া বুঝে নিতে, কিন্তু সেটা যে ছুতো তাও বুঝিয়ে দেয়), আর শ্যামলী সেন (একটা নতুন নাটকের দলে অভিনয় করছে, অভ্যেস আছে কবিতা পড়ার, যা মেয়েদের মধ্যে বড়ো-একটা দেখা যায় না)—এদের মধ্যে যে-কোনো একজন তার স্ত্রী হ'তে পারে—যদি শুধু সে একটু এগিয়ে যায়। মেয়ে তিনটিকে মনে-মনে একবার ভেবে গেলো হিমেন্দু: শ্যামলী বোধহয় সবচেয়ে বুদ্ধিমতী এদের মধ্যে, কিন্তু তার আসল চেহারা তেমন ভালো না (যদিও মঞ্চে চমৎকার মানিয়ে যায়); চন্দ্রিকার চোখ চমৎকার, কিন্তু শরীরের গড়ন একটু মোটার দিকে, আর যা বোঝে না তা নিয়েও হঠাৎ কথা ব'লে ফ্যালে; সুভদ্রাকে প্রথম দেখে মনে হয়েছিলো প্রায় অজন্তার ছবির মতো—এমন লীলায়িত ও পেলবদর্শন তার শরীর, এমন নবনীস্নিগ্ধ গাত্রবর্ণ, কিন্তু এতদিনে তারও কয়েকটা খুঁত ধরা পড়েছে—দাঁত ভালো না, আর কলকাতায় কলেজে পড়া ও বসবাস সত্ত্বেও তার বাংলা উচ্চারণ থেকে অসমিয়া টান একেবারে দূর হয়নি এখনো।—কী আশ্চর্য, এ-সব কী ভাবছি আমি; আমার তো মনে হওয়া উচিত ঐ একটু আবছা সুরে বাংলা বলাটাই সবচেয়ে মিষ্টি, দাঁত একটু আঁকাবাঁকা হবার জন্যই আরো সুন্দর দেখায় সুভদ্রাকে;

চন্দ্রিকার চোখের তরলতা দেখে আমার তো মুগ্ধ হ'য়ে যাওয়া উচিত ছিলো; উচিত ছিলো 'চতুরঙ্গে'র নড়বড়ে নাট্যরূপটায় দামিনীর ভূমিকায় তার অভিনয় দেখার পর শ্যামলীকে আর ভুলতে না-পারা। আমি এত চেষ্টা করছি প্রেমে পড়তে—পারছি না কেন? চেষ্টা ক'রে প্রেম?—হাসি পেলো হিমেন্দুর, ঐ কথা দুটোই তো পরস্পর-বিরোধী। কিন্তু তা-ই বা কেন? যদি স্থির ও অনিবার্য কিছু থাকবেই, তাহ'লে কেন এত ভাঙচুর, এত টালমাটাল? ছাত্রবয়স থেকে কম তো দেখিনি আশে-পাশে—প্রেমে পড়া, প্রেম কেটে যাওয়া, তাক-লাগানো সব অদলবদল, বিয়ে, বিয়ে ভাঙা, এই কলকাতাতেই—অন্য দেশের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। তবু—এমন কোনো মুহূর্ত কি নেই, যখন চোখের তাকানোয়, বুকের শব্দে, গলার আওয়াজে—কী কারণে, কেমন ক'রে তা কেউ জানে না—কিন্তু হঠাৎ একসঙ্গে দু-জনের মধ্যেই কিছু-একটা ঘ'টে যায়, যাকে বলে মোক্ষম ব্যাপার তেমনি কিছু? তা-ই ভাবতে ভালোবাসি আমরা, কিন্তু—আছে কি সত্যি? বোধহয় নেই, বোধহয় সকলেই সেটা মনে-মনে বানিয়ে নেয়, বিশেষ একটা বয়সে, বিশেষ অবস্থায়, শরীর-মনের বিশেষ কতগুলো তাগিদের ফলে। আমাকেও তা-ই করতে হবে। মনস্থির করো, হিমেন্দু—এখনই, এই মুহূর্তে। কিন্তু—? না, এর মধ্যে কোনো 'কিন্তু' আর টেনে এনো না, কালই তুমি বলবে সুভদ্রাকে। কালই। আচ্ছা, আচ্ছা, কালকের কথা কাল ভাবা যাবে (আরো দু-একজনকে খেতে বললে হয় না?—তাহ'লে বেশ কেটে যাবে সময়টা)—এখন দেখা যাক এই লেখাটাকে একটু এগিয়ে নেয়া যায় যদি। আজ আমার ক্লাশ নেই, সারাটা দিন ফাঁকা পাচ্ছি—বরং একেবারে প্রথম থেকে নতুন ক'রে শুরু করা যাক।

নিজের বিয়ের আর কালকের অতিথির ভাবনা আপাতত মন থেকে সরাতে পেরে হিমেন্দু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো; টাইপ-

রাইটারে বসানো কাগজটাতে যে-ক'টা শব্দ আধ ঘণ্টা আগে লিখেছিলো তা পড়তে লাগলো মন দিয়ে—এবারে আর তত খারাপ লাগলো না। একটা বাক্যের মাঝখানে কাজ থামিয়েছিলো, বোধহয় কোনো তারিখ দেখে নেবার জন্য। 'The discordant schools …?' হঠাৎ খটকা লাগলো হিমেন্দুর; 'discordant' কথাটা ঠিক হ'লো কি এখানে? 'Dissident?' 'Contentious'? না কি 'contending'? না কি …? অভিধানের জন্য হাত বাড়িয়েছে সে, এমন সময় ধড়াম ক'রে তার ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেলো, আর বন্দনা ঘরে ঢুকে বললো, 'ছুর্গাদাস কোথায়?'

৫

'বন্দনা! হঠাৎ এ-সময়ে?' চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো হিমেন্দু, তার হাতের ধাক্কায় কফির পেয়ালাটা মেঝেতে প'ড়ে টুং ক'রে ভেঙে গেলো। মুহূর্তের জন্য হিমেন্দু ভেবে পেলো না আগে টুকরোগুলো তুলবে, না বন্দনাকে অভ্যর্থনা জানাবে, কিন্তু বন্দনা ততক্ষণে এগিয়ে এলো ঘরের মধ্যে, কিছু-একটা খোঁজার ধরনে চোখ বুলিয়ে গেলো চারদিকে, তারপর ঠিক একই স্বুরে আবার বললো, 'ত্বর্গাদাস কোথায়?'

হিমেন্দু টুকরোগুলো তুলে ফেলে দিলো বাজে কাগজের ঝুড়িতে, সোজা হ'য়ে হাত ঝেড়ে বললো, 'আমি—আমি তো ঠিক—' কেমন যেন কাঁচুমাচু হ'লো তার ভঙ্গিটা, নিজের ওপর রাগ হ'লো সেজন্য।

'তাহ'লে তুমিও জানো না?' বন্দনার চোখে আর গলার স্বুরে স্পষ্ট অভিযোগ ফুটলো। 'তা-ই তো—তোমাদের কার কী এসে যায়?' যত যাতনা আমার! জানো, কালকের রাত্তিরটা আমার কী-ভাবে কেটেছে? আমি আজ সকাল থেকে কী করেছি তা জানো?'

ফ্ল্যাটের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে হিমেন্দু বললো, 'বোসো, বন্দনা। শান্ত হও।'

'"শান্ত হও!" বললেই হ'লো! আমার একটা মেয়ে আছে না? সংসার আছে না? আমাকে রাঁধতে হয়, বাজারে গিয়ে মাছ-তরকারিও আনতে হয়, আবার আমি একটা চাকরি না-করলেও চলে না! আর এই সব-কিছুর ওপর—উঃ! কাল সারাটা রাত কী যে গেছে আমার ওপর দিয়ে! দশটা—এগারোটা—বারোটা—

একটা—এলো না তো এলোই না! মেয়েকে নিয়ে আমি একা, অগত্যা পার্বতীকে রেখে দিলাম ব'লে-ক'য়ে (আমাদের ঝিয়ের কথা বলছি)—তা ওর থাকা না-থাকা সমান, ছেলেমানুষ—সন্ধে থেকেই ঘুমে কাদা। আমি একবার ভাবছি পুলিশে খবর দিই, একবার ভাবছি হাসপাতাল—কিন্তু এত রাত্রে টেলিফোনের জন্য তেতলার লোকেদের বিরক্ত করা যায় না, আর স্বামী বাড়ি ফেরেনি এটা লোকেদের জানতে দিতেও তো লজ্জা করে—আমি ছটফট করছি, সারা পাড়া নিঝুম, আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে, চোখের দু-পাতা এক করতে পারছি না—কী যে অবস্থা! আমার ইচ্ছে করছিলো ধ'রে একেবারে নির্দম মার দিই দুর্গাদাসকে, ইচ্ছে করছিলো দেয়ালে ঠুকে নিজের মাথাটাই ফাটিয়ে দিই। এদিকে রাত দশটার খবরে বললো মন্ত্রীসভার পতন হয়েছে—কে জানে কোনো গোলমাল হচ্ছে কিনা শহরে, কোনো-একটা ধুয়ো পেলে তো আর কথা নেই আজকাল, অমনি ট্রামে আগুন, বাস্‌-এ আগুন, লাঠি, বোমা, বন্দুক—কী না? তুমি কিছু জানো, হিমেন্দু, শহরের খবর?'

'না তো। মন্ত্রীসভার খবরও এই প্রথম শুনলাম।'

'এই প্রথম শুনলে?' বাঁকা একটু হাসলো বন্দনা। 'ও—তা-ই তো। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে তুমি একজন এমন উঁচু দরের ইণ্টেলেকচুয়েল যে রেডিওতে খবর শোনো না কখনো, সকালে একটা কাগজেও চোখ ফ্যালো না!'

এটা নিঃশব্দে হজম করলো হিমেন্দু, এতে তার অভ্যেস আছে।

'তা জগতের খবর, দেশের খবর কিছু না রাখো, অন্তত বন্ধুবান্ধবের খোঁজ-খবর তো নিতে পারো! চমৎকার বন্ধু তোমরা—যে যার মনে নিশ্চিন্ত সবাই! জানো, আমি সেই সাতটায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আর এখন—' দেয়াল-তাকে রাখা হিমেন্দুর টাইম-পীসটায় চোখ ফেললো বন্দনা, তারপর অভ্যেসবশত নিজের কব্জি-ঘড়িতে—'তোমার ঘড়ি ফাস্ট যাচ্ছে, হিমেন্দু, এখন ঠিক পৌনে-

দশটা—এই তিন ঘণ্টা ধ'রে ঘুরছি। প্রথমে মা-র বাড়িতে, সেখান থেকে আমার গানের স্কুলের প্রিন্সিপালকে চিঠি পাঠিয়ে দিলাম যে আমি আজ স্কুলে যেতে পারছি না; তারপর যোধপুর পার্ক থেকে খানিকটা সাইক্ল-রিকশ আর খানিকটা টানা-রিকশ ক'রে টালিগঞ্জে শঙ্করের বাড়ি, তারপর বাস্-এ ক'রে পদ্মপুকুরে কমলাক্ষর কাছে, আবার সেখান থেকে বাস্ ধ'রে বিপিন পাল রোডে অর্জুনের বাড়ি, তারপর আবার ট্রামে ক'রে গড়িয়াহাটের মোড়, সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে তোমার কাছে বালিগঞ্জ প্লেসে। উঃ, কী বেপাড়াতেই বাড়ি নিয়েছো, হিমেন্দু, পৌঁছতে প্রাণান্ত। তার ওপর আবার তেতলা! আমার এত ক্লান্ত লাগছে না—' হাতের উল্টো পিঠে ছোট্ট একটা হাই চাপলো বন্দনা।

হিমেন্দু আর-একবার কথা বলার সুযোগ পেলো, 'বোসো, বন্দনা। অত ব্যস্ত হোয়ো না।'

'ব্যস্ত হ'য়েই বা কী করবো, বলো,' বন্দনা সোফায় গা এলিয়ে ব'সে পড়লো। 'আমার মাথা ঘুরছে—আর কোথায় ওকে খুঁজে বেড়াবো ভেবে পাচ্ছি না।'

হিমেন্দু তার লেখার টেবিলে ফিরে গেলো, চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বন্দনার মুখোমুখি ব'সে আস্তে বললো, 'অত ভাবছো কেন? দুর্গাদাস যে এই প্রথম বাইরে রাত কাটালো তা তো নয়।'

'আগে অন্তত একটা ফোন করতো আমাদের তেতলার ফ্ল্যাটে, মিথ্যে ক'রেও একটা ওজুহাত দিতো যা হোক, আর তখন আমার শাশুড়িও ছিলেন—এত বেশি ভয় করতো না আমার। আমার শাশুড়ি বলতেন, "তুমি ঘুমোও, বৌমা, মণ্টু ঠিক চ'লে আসবে।" কোনো উদ্বেগ নেই—বহুদিন ধ'রে দেখে আসছেন তো ছেলেকে! জানো, আমার এত রাগ হয় শাশুড়ির ওপর—উনি ছেলেবেলায় শাসন করতে পারেননি ব'লেই তো এত অসভ্য হয়েছে দুর্গাদাস। এই কথাটা একদিন বলেছিলাম আমি—খুব রেগেই বলেছিলাম—

তারপর এক কথা দু-কথায় এমন লেগে গেলো যে শাশুড়ি গোঁসা ক'রে কাশী চ'লে গেলেন — তা আমার কিছুই এসে যায় না তাতে, কিন্তু— জানো, আমাকেই পত্রদ্বারা কুশল-সংবাদ নিতে হয়, মনি-অর্ডারে টাকাও পাঠাতে হয় আমাকেই—দুর্গাদাসকে জিগেস কোরো তো এক ছত্র পোস্টকার্ড লিখেও মা-র খবর নেয় কিনা কখনো! আমি না-হয় বৌ, পরের মেয়ে — কিন্তু বিধবা মা, কত কষ্ট ক'রে মানুষ করেছেন. তাঁর জন্যেও কি দরদ থাকতে নেই? তা কী আর হবে— তোমরা তো আর দশাচল গেরস্ত নও যে মা-কে ভালোবাসবে— তোমরা হ'লে গিয়ে "আউটসাইডার"! আর মা-ও তেমনি — ছেলে যা করে তা-ই ষাট-ষাট, মাতাল হ'য়ে বাড়ি ফিরলেও মুখে টুঁ শব্দটি নেই, না ব'লে-ক'য়ে দমদমে কি নৈহাটিতে বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটালেও পরদিন একবার জিগেস পর্যন্ত করেন না, "কোথায় ছিলি?"' একটু থামলো বন্দনা, হঠাৎ তীব্র বেগে খাড়া হ'য়ে ব'সে আবার বলতে লাগলো, 'আর এই এক পাপ জুটেছে আজকাল: মদ। এই যে বাড়ি ফেরে না, তার অর্থ হ'লো মোদো পার্টি বসেছে কোথাও— এ-ই তো? আমি সাহিত্যিক, তাই মদ খাই। আমি আধুনিক, তাই মদ খাই। আমি আলোকপ্রাপ্ত, তাই মদ খাই। যে মদ খায় না, সে একটা গো-টু-হেল্ বাঙাল। এখন আবার শুনছি মদেও শানাচ্ছে না—গাঁজা চাই, চণ্ডু চাই, এল. এস. ডি. চাই। নতুন এক আপদ —' দম নেবার জন্য আবার একটু থামলো বন্দনা, তার নাকের বাঁশি দুটি ফুলে উঠলো উত্তেজনায়, এলোখোঁপা ভেঙে চুল পিঠে খ'সে পড়লো — 'নতুন এক আপদ জুটেছে ঐ বীটগুষ্টি — দাড়িওলা নোংরা ভূত কতগুলো, গায়ের দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না — তা তোরা নিজেদের দেশে যত ইচ্ছে রাস্তায় গড়া না, আমাদের এই গরিব দেশের ছেলেগুলোকে বখাতে আসিস কেন? পেটে ভাত নেই, তায় আবার এল. এস. ডি.! কিছু বলাও যাবে না — সকলেই পিড়িংপিড়িং পদ্য লেখে, বা কখনো লিখেছিলো, বা পরে লিখবে —

তাই সাত খুন মাপ !' জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়লো বন্দনা, তারপর রাগের বদলে নৈরাশ্যের সুরে বললো, 'আর কাকেই বা কী বলবো, চারদিকেই এই চলছে। তোমারও নাকি জিন না-হ'লে সন্ধে কাটে না, হিমেন্দু ?'

হিমেন্দুর ঠোঁট কুঁচকে গেলো, মুখের ভাবটা হ'লো হাসির মতো, যদিও তার মনের আশে-পাশে আমোদের ছিটেফোঁটাও ছিলো না। এতক্ষণ ধ'রে বন্দনাকে কিছু বলার জন্য তৈরি হচ্ছিলো সে, মনে-মনে যে-যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতাটি সাজিয়েছিলো তা অনেকটা এই রকম :— 'শোনো, বন্দনা, দুর্গাদাস যা-কিছু করে কিংবা করে না তার জন্য দুর্গাদাসের মা-কে, বা তার বন্ধুদের, বা আমেরিকান বীটদের, বা আলবেয়ার কাম্যুকে, বা কলকাতার তরুণ কবি বা অকবিদের দোষী করা তোমার উচিত হচ্ছে না ; দুর্গাদাস একজন প্রাপ্তবয়স্ক সাবালক (নেহাৎ ছেলে-ছোকরাও নয়, পঁয়ত্রিশ-পেরোনো ভদ্রলোক রীতিমতো), তার আচার-আচরণের জন্য শুধু তাকেই দায়ী করতে হবে। তুমিও ছেলেমানুষ নও, বন্দনা ; তোমার বোঝা উচিত কী নির্বোধের মতো তুমি কথা বলো এক-এক সময়, কী নিষ্ঠুরের মতো কথা বলো। তুমি ধ'রে নিয়েছো আমি কিছু মনে করবো না ; কেননা তোমার ওপর আমার দুর্বলতা ছিলো এককালে, এখনো একেবারে নেই তা নয়। আমি তোমাকে বারো বছর ধ'রে চিনি, বন্দনা, যখন তুমি সবেমাত্র কলেজে ঢুকেছো তখন থেকে ; তোমার অনেক সুখদুঃখ হাসিকান্না চোখে দেখেছি আমি, কিছু অংশও তাতে নিয়েছিলাম এক সময়ে ; যখন তুমি গৌতমের জন্য কেঁদে-কেঁদে ফ্যাকাশে হ'য়ে যাচ্ছিলে তখন তোমাকে সান্ত্বনা দেবারও চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে—যদিও তোমার হৃদয় তোমাকে অনেকবার অনেক দিকে ছুটিয়ে নিয়েছে—তুমি আমাকে একজন সম্ভবপর পাণিপ্রার্থী ব'লে কল্পনাও করোনি কখনো। আর তারপর—আমি আমেরিকায় যাবার দু-মাস আগে যেবার আমরা

বর্ষামঙ্গলে শান্তিনিকেতনে গেলাম দল বেঁধে— হঠাৎ, দুর্গাদাসের গান শুনে, তার সঙ্গে একদিন আম্রকুঞ্জে বৃষ্টিতে ভিজে, আর একদিন সূর্যাস্তের সময় সাঁওতাল গ্রামে হেঁটে বেড়িয়ে, তুমি পাগলের মতো তার প্রেমে প'ড়ে গেলে— যে-দুর্গাদাসকে বহুকাল ধ'রে চেনো তুমি, যার গান তুমি আগে অন্তত দু-শো বার শুনেছিলে, যার দোষগুণ কিছুই তোমার অজানা ছিলো না— সুশ্রী, উৎসাহী, সদাপ্রফুল্ল, বন্ধুবৎসল দুর্গাদাস, কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানের নামগন্ধ যার স্বভাবে নেই, যে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কারো বাড়ি আসবে বললে ধ'রে নেয়া যায় যে শুক্কুরবারের আগে আর দেখা দেবে না, যে তোমাকেই একবার তিনটের সময় কফি-হাউসে হাজির থাকতে ব'লে নিজে এসেছিলো পৌনে-পাঁচটায়, তোমাদের বিয়ের মাত্র এগারোদিন আগে— সেই মনোহরণ দুর্গাদাস। আর দুর্গাদাসও মুহূর্তে ভুলে গেলো তার বাল্যসখী অমলাকে, যার সঙ্গে পাঁচ বছর ধ'রে তার বিয়ে ঠিক হ'য়ে ছিলো— সেই অমলা, যে কত সময় ট্যুশনি ক'রে তাকে চালিয়েছে, যার মা-র স্নেহযত্ন ছেলেবেলা থেকে সে ভোগ করেছিলো। একেই বলে চোখে-চোখে বিদ্যুৎ, বিখ্যাত প্রেমান্ধতা, বা নিয়তি— বা যা-ই বলো না। আমি বুঝতে পারছি তুমি কষ্ট পাচ্ছো, তোমার জন্য পূর্ণ সহানুভূতি আছে আমার, কিন্তু তুমিই বলো, আমি কী করতে পারি? ভেবে দ্যাখো, আজ সেই তুমি যদি সেই আমাকে খোঁটা দাও— আমি কাগজ পড়ি না ব'লে বা জিন খাই ব'লে— কি এমনভাবে কথা বলো যেন তোমার প্রতি দুর্গাদাসের দুর্ব্যবহারের জন্য আমি কোনো সূক্ষ্মভাবে দায়ী, কি পরোক্ষভাবে আমারও তাতে কোনো হাত আছে— সেটা কি অন্যায় হয় না? তোমার কি একটু সুবিচারবোধও নেই, বন্দনা? তুমি অমলাকেও চিনতে, জানতে পুরো ব্যাপারটা, কিন্তু—অন্য কারো কথা ভাবার মতো মনের অবস্থা তখন ছিলো না তোমার। তা যাকগে, তোমাদের বিয়ে তোমাদেরই ব্যাপার, তা থেকে কোনো সমস্যা যদি দেখা দিয়ে থাকে তাও তোমাদের, তা

নিয়ে আমার সঙ্গে কথা ব'লে লাভ কী? তুমি তো দেখতে পাচ্ছো আমি ব্যস্ত আছি, আমার টাইপরাইটারে কাগজ চড়ানো, আমি কাজ করছিলাম—এতক্ষণ ধ'রে তোমার বিলাপ শুনেছি তুমি নেহাৎই একজন মহিলা ব'লে, তাছাড়া তোমাকে আঘাত দেয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ব'লেও—কিন্তু আর না, এবার তুমি বাড়ি যাও। তুমি হয়তো ধারণা করতে পারো না যে আমারও দু-একটা ব্যক্তিগত সমস্যা আছে, অন্য কারো জীবনের মধ্যে আমি এখন জড়াতে চাই না, এমনকি, বন্দনা, তোমারও নয়।'—মনে-মনে এমনি ভেবেছিলো হিমেন্দু—ভাঁজে-ভাঁজে অনেক যুক্তি সাজিয়েছিলো—কিন্তু তার মুখ দিয়ে যা বেরোলো তা শুধু এই: 'আমার মনে হয় দুর্গাদাস পাইকপাড়ায় পল্লবের বাড়িতে ছিলো কাল রাত্রে, এতক্ষণে হয়তো এসেও গেছে, তুমি বাড়ি গেলেই তাকে দেখতে পাবে।'

কথাটা শুনে মুহূর্তের জন্য একটু চঞ্চল হ'লো বন্দনা, ওঠার মতো একটা ভঙ্গি হ'লো তার শরীরে, কিন্তু তক্ষুনি সোফার পিঠে হেলান দিয়ে বললো, 'আসুক, এসে ঘুরে বেড়াক রাস্তায়-রাস্তায়। বাড়ি ছেড়ে থাকতে অতই যদি সুখ তাহ'লে আর ফেরা কেন? আমি করেছি কী জানো না, ফ্ল্যাটের দরজায় ডবল-তালা লাগিয়ে বেরিয়ে এসেছি। কোয়েলিয়াকে রেখে এসেছি মা-র কাছে—'

হিমেন্দু জিগেস না-ক'রে পারলো না, 'মেয়ের নাম না মিতা রেখেছিলে, আবার কোয়েলিয়া হ'লো কবে থেকে?'

'ও, তা বুঝি জানো না? দুর্গাদাস কোথায় একদিন শুনে এলো গৌতম তার মেয়ের নাম মিতা রেখেছে—তক্ষুনি ভেবে-ভেবে কোয়েলিয়া নাম বের করলো। মেয়ে গাইয়ে হবে, এই আশা।'

'তা তো হ'তেই পারে—মা-বাবা দু-জনেই গাইয়ে যখন।'

'আর গাইয়ে! গান দিয়ে এখন রুটি পাকাচ্ছি—এ-ই তো তার পরিণাম। ভালো কি লাগে, বলো, সপ্তাহে পাঁচদিন তিন ঘণ্টা ধ'রে এক দঙ্গল বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে কোরাস গাইতে—রবীন্দ্র-

সংগীত নিম-তেতো হ'য়ে গেলো! কিন্তু উপায় কী—সংসার যে চলে না তা না-হ'লে। জিনিশপত্রের কী দাম রে, বাবা—দিনে-দিনে বেড়ে চলেছে তো বেড়েই চলেছে। তুমি বেশ আছো, হিমেন্দু, বিয়ে করোনি, নয়া পয়সা গুনতে হয় না—দিব্যি ঝাড়া-ঝাপটা!'

এ-কথার উত্তরে হিমেন্দু খুব মৃদুভাবে একবার কাশলো।

'না, আমি চাই না আমার মেয়ে গাইয়ে হোক। আমি ভেবেছি কী, জানো—মেয়েকে প্রেম-রোগে ধরার আগেই সাত পাকে বেঁধে ফেলবো। কোনোমতে স্কুল পেরোতে-না-পেরোতেই ঘর-বর দেখে বিয়ে। নিজে ঢের ঢের জ্বালায় জ্বলেছি—কোয়েলিয়ার জন্য আমি চাই সুখের জীবন, সুস্থির জীবন।—তা কোয়েলিয়া নামটা বেশ ভেবেছে দুর্গাদাস—কী বলো? আর কারো ও-নাম শুনিনি।'

হিমেন্দু চুল টেনে বললো, 'সুন্দর নাম। কিন্তু দুর্গাদাস যদি গাইয়ে অর্থে ভেবে থাকে তাহ'লে ভুল করেছে—মেয়ে-কোকিল গান গায় না।'

'উঃ—সবটা নিয়ে গুরুগিরি কোরো না তো—তুমি একটা কী!' কথাটা ব'লেই আশ্চর্য দ্রুত বেগে ভাবান্তর হ'লো বন্দনার, আগের কথার জের টেনে তক্ষুনি আবার বলতে লাগলো, 'তা বাপের সোহাগের দৌড় কত তা তো দেখাই যাচ্ছে—বাঁচলো না মরলো তারই হুঁশ নেই! ছী-ছি, কী লজ্জা, সকাল থেকে লোকেদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়ানো—"দুর্গাদাস কোথায় জানো তোমরা? তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো দুর্গাদাসের?" লোকেরা ভাবেই বা কী, আর আমারই বা কেমন লাগে! কিন্তু কী করবো—যত দায় তো আমারই—আর তো কারো কিছু নয়। সত্যি—সত্যি আর সহ্য হচ্ছে না আমার, আমি প্রতিশোধ নেবো, ওকে শাস্তি না-দিয়ে ছাড়বো না! কিন্তু—এই যে ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে এলাম, তাতে আর কী শাস্তি হবে ওর? কোথায় স্ত্রী, কোথায় মেয়ে, তা কি ভাববে একবারও? দিব্যি চ'লে যাবে আবার কোনো বন্ধুর বাড়িতে, আর

নয়তো—খুব ক্লান্ত থাকে যদি, তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে ধড়াম ক'রে বিছানায় পড়বে। সর্বনাশ—' হঠাৎ চমকে উঠলো বন্দনা, আবার খাড়া হ'য়ে বসলো, 'বিলেতি তালা, মা দিয়েছিলেন আমাকে, ও-রকম আর পাওয়া যায় না আজকাল—ভেঙে ফেললে তো মুশকিল!'

এই সুযোগে হিমেন্দু আর-একবার বললো, 'তুমি বরং বাড়ি যাও, বন্দনা।' তারপর একটা বেফাঁস কথা বেরিয়ে গেলো তার মুখ দিয়ে—'দরজায় তালা দেখে দুর্গাদাস আবার রাগারাগি না করে।'

'করুক! করুক!' মেঝেতে স্যাণ্ডেল ঠুকে দাঁতের ফাঁকে ফোঁশ ক'রে উঠলো বন্দনা, 'আমার কী এসে যায়? "দুর্গাদাস রাগারাগি করবে!" তুমি, হিমেন্দু—তোমার লজ্জা করলো না কোনো বুড়ি শাশুড়ির মতো আমাকে ও-কথা বলতে? আমি কেউ নই, আমি কিছু নই—আমাকে মুখ বুজে সব মেনে নিতে হবে! কিন্তু না হাজার বার না! দুর্গাদাসের অমলাকেই বিয়ে করা উচিত ছিলো—কাদার তালের মতো মানুষ, মাড়িয়ে গেলেও টুঁ শব্দটি করতো না!'

বন্দনার শেষ কথাটা শুনে হিমেন্দুর শরীর যেন মুচড়ে উঠলো। একটু পরে ঠাণ্ডা গলায় জিগেস করলো, 'অমলার সঙ্গে তোমার দেখা-টেখা হয় নাকি?'

'ওর স্কুল আর আমার গানের স্কুল একই পাড়ায় তো—হঠাৎ মাঝ-মাঝে বাস্-এ দেখা হ'য়ে যায়। কী চেহারা হয়েছে! চুল পাৎলা, গাল ভাঙা, মুখে যেটুকু লাবণ্য ছিলো তা যেন ডাইনিতে শুষে নিয়েছে। একেবারে সাত বুড়ির এক বুড়ি—টিপিক্যাল্ আদ্যিকালের হেডমাষ্টারনি! তা কী আর হবে—ওর নিজেরই বোকামি, মা মারা গেলেন, সময় থাকতে বিয়েও করলো না—কোন একটা অনাথ মেয়েকে পুষ্যি নিয়েছে বোধহয়—হারানো প্রেমের স্মৃতিপূজার এ-ই তো পুরস্কার!'

হিমেন্দু চোখ নামিয়ে নিলো, মুহূর্তের জন্য বন্দনার মুখের দিকে যেন তাকাতে পারলো না। মেঝের দিকে তাকিয়েই আস্তে-আস্তে

বলতে লাগলো, 'আমিও একদিন দেখেছিলাম অমলাকে, অমলা ব'লে চিনতে দেরি হয়েছিলো যদিও। গড়িয়াহাট বাজার থেকে বেরিয়ে ফুটপাত ধ'রে হাঁটছিলো—হাতের ব্যাগ থেকে ফুলকপির ডাঁটা বেরিয়ে আছে, আর-এক হাতে কয়েকটা স্কুলের খাতা, একটু বেঁকে গিয়েছে ভারে, আস্তে-আস্তে রাস্তার ভিড় আর কুয়াশার মধ্যে ছায়ার মতো মিলিয়ে গেলো। আমার ইচ্ছে হচ্ছিলো একটু কথা বলি—কিন্তু আমার সঙ্গে তেমন আলাপ তো ছিলো না কখনো—আর তাছাড়া, কী বা বলবো!'

'তা তুমি যত ইচ্ছে দরদ দেখাতে পারো অমলার জন্য, কিন্তু আমি নিজের ভাবনা ভেবেই কূল পাই না। ঐ মেয়েটা—শুধু আমার মেয়েটার জন্যই আটকে আছি আমি, নয়তো কি আর একদিনও থাকতাম দুর্গাদাসের সঙ্গে! ও আমাকে বলে কী, জানো—"আমি তো চাইনি, তুমিই তো যেচে আমাকে বিয়ে করেছিলে!" আর—সেটাই সত্যি! সেটাই সত্যি! আমিই চেয়েছিলাম! হঠাৎ যেন বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছিলো আমার—মনে হয়েছিলো দুর্গাদাসকে পেলেই হাতে স্বর্গ পাবো। কিন্তু হিমেন্দু—তুমি তো ঠাণ্ডা মাথার স্থির বুদ্ধির মানুষ—তুমি তো আমার কাছে ছিলে সারাক্ষণ—কেন তুমি বারণ করোনি আমাকে, কেন ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাওনি—' বলতে-বলতে বন্দনার চোখ ছাপিয়ে জল এলো, একেবারে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে ভাঙা গলায় ব'লে উঠলো, 'কেন তুমি আমাকে বিয়ে করোনি, হিমেন্দু?'

হিমেন্দুর সারা মুখে একটি গভীর লাল রং ছড়িয়ে পড়লো, মাথা নিচু করলো সে, একগোছা চুল আস্তে-আস্তে জড়াতে লাগলো আঙুলে। পর-পর কয়েকটা ভাবনার ঢেউ তার মনের মধ্যে উথলে উঠলো। 'বন্দনা, তুমি এত হৃদয়হীন, ও-রকম ক'রে কথা বলতে পারো অমলার বিষয়ে—আর আমারও সঙ্গে!' এই অনুচ্চারিত প্রতিবাদের ওপর বেদনার ছায়া নেমে এলো তক্ষুনি: 'ছি, বন্দনা,

ও-রকম কথা বলতে হয় না তাও কি জানো না তুমি? মনে-মনে ভাবলেও মুখে আনতে হয় না কখনো। তুমি নিজেকে অত ছোটো করছো কেন, তুমি কি সব ভুলে গিয়েছো?' অনেক পুরোনো সেই দিনগুলি ফিরে এলো হিমেন্দুর মনে—টাটকা এম. এ. পাশ ক'রে বালিগঞ্জে একটা ছোটো, নতুন মেয়ে-কলেজে পড়াচ্ছে তখন—বন্দনার এক পিসতুতো দিদি সেখানে প্রিন্সিপাল—সেই সূত্রেই আলাপ হ'লো প্রথম।—ছিপছিপে ছিলো তখন বন্দনা, কিছুটা এলোমেলো, অসহায়মতো—আস্তে-আস্তে কোনো-কোনো ব্যাপারে তারই ওপর নির্ভর করছে বন্দনা, সে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে বাংলায় এম. এ. দেবার জন্য, ঘুরে-ঘুরে বই জোগাড় ক'রে দিচ্ছে তাকে; তাকে পড়াবার জন্য নিজে প'ড়ে ফেলছে দীনেশ সেন, সুকুমার সেন, কবিকঙ্কণ, রবীন্দ্রসংগীত বিষয়েও অনেকগুলো বই প'ড়ে ফেলেছিলো—তারই জন্য। একটা ছোট্ট ঘটনা হিমেন্দুর মনে প'ড়ে গেলো—শ্রীপতির ঘরে হঠাৎ একদিন আরতির সঙ্গে গৌতমকে দেখতে পেয়ে বন্দনা কেমন আকুল হ'য়ে কেঁদেছিলো। হিমেন্দু তখন কিছুটা জড়িয়ে পড়েছিলো এদের ভালোবাসাবাসির ব্যাপারে—সাহায্যকারী বা সান্ত্বনাদাতার ভূমিকায়। তা-ই নিয়ে তৃপ্ত ছিলো সে; মনে-মনে যদি অন্য আশা থেকেও থাকে তা ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয়নি। কিন্তু—সে যতই লুকিয়ে রেখে থাক, বন্দনা বোঝেনি তা কি সম্ভব? তাহ'লে কী ক'রে—কী ক'রে সে বলতে পারলো, 'তুমি আমাকে বিয়ে করোনি কেন?' হিমেন্দু মনে-মনে বললো, 'বন্দনা, তুমি সংযত হ'তে শেখো; আগে যা ছিলো তোমার মধ্যে মধুর সরলতা, এখন তা-ই বোকামির স্তরে নেমে আসছে: আগে তোমার যে-পরনির্ভরতা তোমাকে আরো প্রিয় ক'রে তুলেছিলো আমার কাছে, এখন সেটা অন্যের প্রতি নিষ্ঠুরতায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।'—একবার তাকালো সে বন্দনার দিকে; সোফার পিঠে এক হাত রেখে মুখ গুঁজে আছে বন্দনা, কান্নার বেগে একটু-একটু কেঁপে উঠছে। কষ্ট পাচ্ছে—ও কষ্ট পাচ্ছে, আমি

পাচ্ছি না। একবার একজনকে না-পেয়ে কেঁদেছিলো ; যাকে পেলো তাকে নিয়েও এখন কান্নাকাটি—দুর্ভাগ্য, তা ছাড়া আর কী বলা যায় ? এদিকে দুর্গাদাস যাকে বিয়ে করলো না সেও দুঃখী, যাকে করলো সেও সুখী নয়—দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী বলা যায় ? কিন্তু কেন—যে-আমি ওদের সব তোলপাড়ের বাইরে, সেই আমার ওপর কেন এই করুণার চাপ, কেন আমার হৃদয়বৃত্তির ওপর এই অত্যাচার? বন্দনার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে ; না, ঠিক করুণাও নয়, স্নেহের কাছাকাছি একটা আবেগে দুলে উঠলো তার বুকের ভেতরটা। আমি কি উঠে যাবো, ওর পাশে বসবো, ওর কাঁধে হাত রাখবো, হাতে হাত রাখবো, আমি কি ওর চুলে হাত বুলিয়ে বলবো : 'কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।' কিন্তু যদি তার কয়েক ধাপ পরেই অন্য এক কথা বলতে হয় : 'তুমি ছেড়ে দাও দুর্গাদাসকে, আমি তোমাকে বিয়ে করবো, কোয়েলিয়া আমার মেয়ে হবে—' ? হিমেন্দুর মনে হ'লো, পরবর্তী কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা জরুরি সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাকে, যা বদলে দেবে তার সমস্ত জীবন। হিমেন্দু চেয়ার ছেড়ে উঠলো, দু-পা এগিয়ে গেলো বন্দনার দিকে, কিন্তু হঠাৎ অন্য একটা চিন্তা থামিয়ে দিলো তার চলার বেগ, অন্য সব-কিছু ছাপিয়ে উঠলো তার সহজাত কাণ্ডজ্ঞান, তার যুক্তিনিষ্ঠা। না—বন্দনা কখনো অত দূর এগোবে না, ও দুর্বল, যুদ্ধ করার মতো সাহস ওর নেই। আর তাছাড়া দুর্গাদাস ওকে নিরাশ করেছে ব'লেই আমার দিকে ওর মন টলেছে বা কখনো টলবে, এমন কোনো কথা তো নেই। বারো বছরের মধ্যে যা কখনো হয়নি, হঠাৎ আজ ভোজবাজির মতো তা হ'তে যাবে কেন ? যদি বন্দনা কখনো দুর্গাদাসকে ছেড়ে চ'লে যায়, তা যাবে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে, আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই নয়। আর আমি—আমিই কি সত্যি ভালোবাসি বন্দনাকে, এখনকার বন্দনাকে, না কি কখনোই বেসেছিলাম ? তেমন যদি জোয়ার আসতো আমার মধ্যে, তাহ'লে আমি কি ওকে ভাসিয়ে নিতে পারতাম না ?··· নিজের

যুক্তির কাছে সম্পূর্ণ পরাস্ত হ'য়ে মাথা নিচু করলো হিমেন্দু, চেষ্টা করলো সুভদ্রা চালিহার মূর্তিটিকে মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে, তা দিয়ে চাপা দিতে এ-মুহূর্তে আবেদনময়ী বন্দনাকে। এই আমি মনস্থির করলাম, আমি সুভদ্রাকে ভালোবাসি, আমি সুভদ্রাকে বিয়ে করবো। 'বন্দনা!···বন্দনা!' গম্ভীর গলায় দু-বার ডাকলো হিমেন্দু, বন্দনার দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শুনলো। 'বন্দনা, বাড়ি যাবে না? চলো আমি তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।' 'তোমাকে আসতে হবে না।' আস্তে-আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকালো বন্দনা, ব্যাগের মুখ খুলে রুমাল বের করলো। 'আমি এখন মা-র বাড়ি যাচ্ছি। দুর্গাদাসের সঙ্গে দেখা হ'লে বোলো—' কথা শেষ না-ক'রে হঠাৎ উৎকর্ণ হ'লো সে, সিড়িতে শোনা গেলো কয়েকটা পায়ের শব্দ, আর দুর্গাদাসের দরাজ গলায় গানের কলি—'শীতের হাওয়ায় —লাগলো নাচন—লাগলো নাচন—' আর সঙ্গে-সঙ্গে চকিত হ'য়ে চোখ-মুখ মুছে বন্দনা গুছিয়ে বসলো, সামনের টেবিলের ওপর প'ড়ে-থাকা বইটা তুলে নিয়ে খুলে ধরলো চোখের সামনে।

৬

'লাগলো নাচন—আমলকির ঐ—ডালে—'

'লজ্জা করে না?' হঠাৎ তালভঙ্গ হ'লো; দুর্গাদাসের দরাজ গলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বন্দনার ছুঁচোলো চীৎকার—'লজ্জা করে না তোমার—' কিন্তু তক্ষুনি দুর্গাদাসের পেছনে ঝাপসাভাবে অন্যদের দেখতে পেয়ে বাকি কথাগুলো গিলে ফেললো বন্দনা, ক্ষিপ্র হাতে তার হাত-ব্যাগটি তুলে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো ঘর ছেড়ে। আর হিমেন্দু সেই অস্বস্তিকর মুহূর্তটাকে চাপা দেবার জন্য দরজার ধারে ছুটে গেলো: অপ্রতিভ মুখে যথাসাধ্য হাসি টেনে অভ্যর্থনা করলো অন্য দু-জনকে, যাদের মুখ দেখে সে স্থির করতে পারলো না বন্দনার চীৎকারটা তারা শুনেছে কি শোনেনি, বুঝেছে কি বোঝেনি। অগত্যা তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ছেড়ে দিয়ে বললো, 'শ্রীপতি! আসুন।' পরমুহূর্তে অপ্রত্যাশিত গৌতমকে চিনতে পেরে একটু দেরি ক'রে, অন্য রকম গলায় বললো, 'আপনি হঠাৎ? আসুন—ভেতরে আসুন।'

গৌতম, সরু টাইসমেত ঝকঝকে স্যুট পরনে, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি, দু-পা এগিয়ে এসে গম্ভীর গলায় আরম্ভ করলো, 'আমি এখানে আসছিলাম না, দুর্গাদাস আমাকে জোর ক'রে—'

'চ'লে আয় না ভেতরে,' গৌতমের কথায় বাধা দিলো নির্বিকার, নিরুদ্বেগ দুর্গাদাস, এক মুহূর্ত ফাঁক না-দিয়ে তক্ষুনি আবার বলতে লাগলো, 'গৌতমকে চিনতে পেরেছো তো, হিমেন্দু?—আমার সঙ্গে হঠাৎ ওর দেখা হ'য়ে গেলো রাস্তায়, এদিকেই আসছিলো গৌতম, ভাবলাম এই ফাঁকে তোমাকে একবার দেখে যাই। হ'লো কী জানো—আমি একটা টু-বি বাস্-এ ক'রে আসছি, হঠাৎ

থিয়েটার রোডের কাছাকাছি এসে আগুন ধ'রে গেলো বাস্‌টায়—কী অবস্থা হয়েছে স্টেট-বাস্‌গুলোর, জঘন্য!—তারপর বুঝতেই পারো—চ্যাঁচামেচি, ঠেলাঠেলি, হুড়মুড় ক'রে নেমে পড়লো সবাই, একটি মহিলার হাত থেকে বটুয়া প'ড়ে গেলো ফুটপাতে, তিনি আর খুঁজে পেলেন না সেটা—"চোর! চোর!" ব'লে রব উঠলো, আমি একটা বাচ্চা ছেলেকে সন্দেহ ক'রে ছুটলাম তার পেছনে, কিন্তু ছোকরাটা বিলকুল হাওয়া হ'য়ে মিলিয়ে গেলো—এই সব গোলমালের মধ্যে—যখন পেছনে আর-একটা বাস্ এসে দাঁড়িয়েছে আর লোকেরা ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে উঠে পড়ছে সেটাতে, হঠাৎ দেখি গৌতম আসছে গাড়ি চালিয়ে। আর কথা কী! চেঁচিয়ে গাড়ি থামিয়ে ঝুপ ক'রে ওর পাশে উঠে পড়লাম—আর ঠিক তোমার বাড়ির সামনে এসে—আমরাও নেমেছি, আর পেছনে শ্রীপতির গাড়িও থামলো। গ্র্যাণ্ড হ'লো—না? তোফা আড্ডা জমানো যাবে। গৌতম দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বোস না।'

'আচ্ছা, ব'সে যাই দু-মিনিট,' দু-হাতের আঙুলে প্যান্টের ভাঁজ উঁচু ক'রে ধ'রে একটু সাবধানে বসলো গৌতম। 'অনেক পুরোনো লোককে দেখতে পাচ্ছি এখানে। তা খবর-টবর সব ভালো তোমাদের?' ঘরের চারদিকে অস্পষ্টভাবে চোখ চালিয়ে গেলো সে, তারপর শ্রীপতির দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমার অ্যাম্বাসেডরটা নতুন মনে হ'লো, শ্রীপতি। ভালো চলছে?'

এর উত্তরে শ্রীপতি কী বললো তা কেউ শুনতে পেলো না।

'আমি একটা নতুন অ্যাম্বাসেডর পেয়েছিলাম, জানো, কিন্তু হঠাৎ একজন একটা মার্সেডিজ়-এর খবর আনলে, সিক্সটি-ফোর মডেল, গলা-কাটা দাম অবশ্য, কিন্তু দেখে লোভ সামলানো গেলো না।' আলগোছে, নিচু গলায় শেষ কথাটা ছেড়ে দিয়ে গৌতম গৃহস্বামীর দিকে চোখ ফেরালো। 'হিমেন্দু ভালো তো? দুর্গাদাস বলছিলো আপনি রীডার হয়েছেন সম্প্রতি? বেশ, বেশ। তুমি ভালো

আছো, বন্দনা?' বন্ধুভাবে, কিন্তু কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে, কিছুটা পিঠ-চাপড়ানো ধরনে কথাগুলো ব'লে গেলো গৌতম ; তার চেহারা, পোশাক, চুলের ছাঁট, বসার ভঙ্গি, দামি জুতোয় আয়নার মতো পালিশ—সব-কিছু ঘোষণা করলো তার বিত্তশালিতা, আত্মবিশ্বাস, আর জগৎসংসারে নিজের প্রাধান্যবোধ।

বাথরুমে চোখ-মুখ ধুয়ে, চুল আঁচড়ে, খোঁপা মেরামত ক'রে, ঠোঁটে ঈষৎ লিপস্টিক ছুঁইয়ে (ভাগ্যিশ ছিলো তার ব্যাগে), একটু আগে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলো বন্দনা ; মুখে একটি মনোহর হাসি ফুটিয়ে হালকা গলায় বললো, 'গৌতম যে। বেশ মোটা হ'য়ে গেছো, মনে হচ্ছে?'

'তোমাকেও তেমন তন্বঙ্গী আর দেখছি না,' গলার আওয়াজে হাসি মেশালো গৌতম। 'তা এমনি হয়, এমনি হয়—এ নিয়ে আর কথা ব'লে কী হবে। আমার গিন্নিটি তো তটস্থ হ'য়ে আছেন সারাক্ষণ—এই বুঝি ওজন বাড়লো, এই বুঝি চর্বি জমলো—কখনো ভাত ছেড়ে দিচ্ছেন, কখনো ডাক্তারের পরামর্শমতো ওষুধ, ব্যায়াম, কত কী—সাড়ে-পাঁচ ফুট উচ্চতা নিয়ে একশো-দশ পাউণ্ড ওজন বজায় রাখবেন, এই এক অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা তাঁর।'

'গৌতম, তুই একটা কী!' ফশ ক'রে ব'লে উঠলো দুর্গাদাস। স্ত্রীকে গিন্নি বলিস? ছি!'

গৌতমের চোখ মুহূর্তের জন্য স্থির হ'লো দুর্গাদাসের ওপর।

'তুই দেখছি জীবন ভ'রে ছেলেমানুষ থেকে যাবি, দুর্গাদাস। তা শোন, ও-সব ভাব-ভাব-কদমের-ফুল ধোপে টেকে না জানিস তো। স্ত্রী—সংসার চালাবে, ছেলেপুলে মানুষ করবে, পার্টিতে দেখনশোভা হ'লে আরো ভালো—ব্যাপারটা তো এ ছাড়া আর কিছু নয়। তার পক্ষে "গিন্নি" কথাটাই তো ঠিক—চমৎকার। "গৃহিণী," "ঘরনী," "গিন্নি"—কোমরের মাপ বাইশ হ'লেও তা-ই, বত্রিশ হ'লেও তাই, ইয়া মোটা অনন্ত পরলেও তা-ই আর হলিউড-কায়দায় হেয়ার-ডু করলেও তা-ই। কোনো ন্যাকামি নেই ওর মধ্যে, সাফ সত্যি

কথাটাই বলা হচ্ছে। তুমি কী বলো, শ্রীপতি? আমি ঠিক বলছি না?'

এবারেও শ্রীপতির গলা দিয়ে অস্পষ্ট কী আওয়াজ বেরোলো কেউ বুঝতে পারলো না।

বন্দনা ব'লে উঠলো, 'বিশ্রী! খুব বিশ্রী কথা বলেছো, গৌতম।'

'তা-ই নাকি?' গৌতম দাঁত দেখিয়ে হাসলো, কোনো শিশু হঠাৎ পাকা কথা ব'লে ফেললে বয়স্করা যে-ভাবে হাসেন, তেমনি উদারভাবে। বন্দনা স'রে এসে দুর্গাদাসের পাশে দাঁড়ালো; অন্তরঙ্গ সুরে, কিন্তু সকলকে শুনিয়ে টেনে-টেনে বলতে লাগলো, 'শোনো—তুমি কেমন মানুষ বলো তো? আমি সে—ই ন-টা থেকে এখানে এসে ব'সে আছি, আর তোমার দেখাই নেই!' দুর্গাদাসের মুখে একটা ভঙ্গি হ'লো (শুধু হিমেন্দু লক্ষ করলো সেটা), আর বন্দনা তার চোখ দুটিকে ভাসিয়ে দিলো শ্রীপতির দিকে—'শ্রীপতি, আপনার বন্ধুকে একটু শাসন করবেন তো। ও আজ করেছে কী জানেন? সকালে ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে গেলো, আমাকে বললো ন-টার মধ্যে হিমেন্দুর বাড়ি চ'লে যেতে—নতুন পত্রিকার মীটিং বসবে সেখানে—ও মা, ও আপনাকে বলেনি বুঝি? বেশ লোক! নতুন পত্রিকা বের করছো, আর শ্রীপতিকেই বলোনি এখনো?' দুর্গাদাসের কাঁধে মাথা হেলিয়ে তার চুলের ঝুঁটি ধ'রে নেড়ে দিলো বন্দনা, হিমেন্দুর দিকে আধখানা কটাক্ষ ছুঁড়ে দিলো।

একসঙ্গে দুটো শব্দ শুনতে পেলো হিমেন্দু; দুর্গাদাসের গলায় 'হুঁঃ!' বা 'ধ্যেৎ!' বা ঐ রকম কিছু—খুব অস্পষ্ট, আর তার চেয়েও অস্পষ্ট, খুব নরম, খুব চাপা, শ্রীপতির গলার একটুখানি হাসি। হিমেন্দুর মাথা নিচু হ'লো; নিজেরই জন্য লজ্জা করলো তার। এই ভান, অভিনয় (বোঝাই যায় শুধু হঠাৎ গৌতম এসে পড়ছে ব'লে)—তারই ঘরে, তারই সময় নষ্ট ক'রে, যখন চারদিকে বইখাতা ছড়িয়ে সে টাইপরাইটারে কাগজ চড়িয়েছে, ঠিক তখনই! আর

আমারই বা এত মাথাব্যথা কেন বন্দনাকে নিয়ে! তার বিয়ে টিকে থাক বা ভেঙে যাক, জীবন তাকে সুখ দিক বা যন্ত্রণা দিক—আমার কী এসে যায়? হিমেন্দু আর-একবার চেষ্টা করলো মনের তলায় সুভদ্রা চালিহার মুখটি ফুটিয়ে তুলতে; কাল সুভদ্রা আসবে ভেবে—এতক্ষণ পরে—একটুখানি আনন্দ হ'লো তার।

'আমি কেটে পড়ছি তাহ'লে,' গৌতমকে বলতে শুনলো হিমেন্দু, 'তোমাদের সাহিত্যসভায় আমি আর কী করবো।'

'আরে না, না, সাহিত্যসভা-টভা কিছু না, বোস।' দুর্গাদাস সহৃদয়ভাবে হাত রাখলো গৌতমের কাঁধে, গৌতম একটু কুঁকড়ে স'রে গেলো। 'তার চেয়ে বরং মন্ত্রীসভা নিয়ে তর্ক হোক। কাল আপিশে খবরটা শোনামাত্র আমি বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়, এসপ্লানেডে এসেই পল্লব আর বরুণের সঙ্গে দেখা, তারপর ওদের নিয়ে চ'লে গেলাম—' ঠিক সেই মুহূর্তে বন্দনার চোখে চোখ পড়লো তার, একটু থেমে বললো, 'ওঃ, বড্ড খিদে পেয়ে গেছে।' দুর্গাদাস বন্দনার পাশ থেকে স'রে এলো ঘরের অন্য দিকে; এক কোণে একটা বইয়ের শেলফের ওপরে রাখা এক ছড়া মর্তমান কলা থেকে একটি তুলে নিয়ে খেতে-খেতে বলতে লাগলো, 'শোনো, শ্রীপতি—কাল একটা বিরাট তর্ক হ'য়ে গেলো আমার সঙ্গে পল্লবের। পল্লব বলছিলো আমাদের পক্ষে মিলিটারি ডিক্টেটরশিপই ভালো, আমরা এখনো গণতন্ত্রের যোগ্য হইনি, আর আমি বলছিলাম—'

'শুনছো?' পাখির মতো গলায় বন্দনা ব'লে উঠলো, 'তোমাদের পত্রিকার মীটিং যদি না-ই হয় তাহ'লে বাড়ি চলো না এখন? তখন কত ক'রে বললাম খেয়ে বেরোও—শুনলে না তো! আমি আবার কোয়েলাকে মা-র কাছে রেখে এসেছি। চলো যাই।'

'হুঁ, যাচ্ছি। গৌতম, তোর মতটা কী, বল। কোন পার্টিকে ভোট দিয়েছিলি এবার?'

'আর পার্টি!' হাত ঘুরিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলো

গৌতম। ‘ঢাক ঢোল দামামা তো অনেক শোনা গেলো—ও-সব নিয়ে মাতামাতি করার কোনো মানেই হয় না। কে মন্ত্রী হ'লো বা না হ'লো তাতে কী এসে যায়? রাইটার্স বিল্ডিং চালাচ্ছে তো সেক্রেটারিরাই—সত্যিকার খাটিয়ে লোক শুধু তারাই, যদিও মাইনে বড্ড কম বেচারিদের। এখন দেখছি আই. এ. এস. ছেড়ে দিয়ে ভালোই করেছিলাম; আমাদের স্টীল কর্পোরেশনের সীনিয়র এক্সিক্যুটিভদের গ্রেইড যেখানে আরম্ভ, আই. এ. এস.-এ প্রায় সেখানেই শেষ। আর তাছাড়া—’ গৌতম তার লম্বা পা ছুটি বাড়িয়ে দিলো মেঝেতে, তৃপ্ত মুখে তাকালো তার জুতোর অতি উজ্জ্বল অগ্রভাগের দিকে—‘তাছাড়া তোরা যাকে দেশের কাজ বলিস তাও তো আসলে ও-সব জায়গাতেই হচ্ছে কিছু—ময়দানের আগুন-খেকো বক্তৃতা দিয়ে তো আর কয়লা ইস্পাত পেট্রল কেরোসিন রেলের এঞ্জিন তৈরি হয় না, বরং তাতে দেশের আরো ক্ষতি করা হয়, ধর্মঘট আর লক্-আউটের চাপে দুর্দশা আরো বেড়ে যায় লোকেদের।’

‘গৌতম, তুমি ক-বার ঘেরাও হয়েছিলে বলো না?’

বন্দনার এই প্রশ্নের উত্তরে গৌতমের ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটি হাসি ফুটলো।

‘তথ্য হিশেবে জানাচ্ছি, ও-সব উৎপাত একবারও ভুগতে হয়নি আমাদের—না নন্দীনগরে, না কলকাতার আপিশে।’

‘অমন একটা পেল্লায় চাকরি করিস, আর একবারও ঘেরাও হোসনি? খুব লজ্জার কথা! স্ত্রীর কাছে মুখ দেখাস কী ক'রে?’

দুর্গাদাসের এই কথাটা শুনে বন্দনা খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো, আর গৌতম দাঁত দেখিয়ে বললো, ‘এই রসিকতাটা বড্ড প'চে গেছে, দুর্গা—নতুন কিছু ভাবতে পারলি না?’

হঠাৎ বন্দনা যেন চমকে ব'লে উঠলো, ‘ও কী, দুর্গাদাস, তোমার পায়ে কী হয়েছে?’

দুর্গাদাস, কলা খেতে-খেতে, কথা বলতে-বলতে, কিছুক্ষণ ধ'রেই

পাইচারি করছিলো ঘরের মধ্যে ; অন্য কেউ তার হাঁটায় কোনো ত্রুটি দেখতে পায়নি, কিন্তু বন্দনার সূক্ষ্ম চোখে ধরা পড়লো সে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে। 'চোট পেয়েছো নাকি ?'

'ও কিছু না—' দুর্গাদাস হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলো বন্দনার কথাটা—'ঠিক হ'য়ে যাবে এক্ষুনি। শোনো, শ্রীপতি—'

'বলো না ! কোথায় চোট পেয়েছিলে ? কেমন ক'রে ?'

একটু বেশি ব্যাকুল শোনালো বন্দনার গলা, তার ঠোঁট বেঁকলো, ভুরু কুঁচকে গেলো। হিমেন্দু বুঝে নিলো ব্যাপারটা : বন্দনা সন্দেহ করছে দুর্গাদাস কাল রাত্রে মাতাল হ'য়ে প'ড়ে গিয়েছিলো কোথাও, ভেতরে-ভেতরে রাগে ফেটে পড়ছে সে, কিন্তু না—গৌতমকে সে কিছুই টের পেতে দেবে না, গৌতমের সামনে তার দাম্পত্য জীবনের একটা রঙিন ছবি তাকে ফোটাতেই হবে, যে ক'রে হোক। ঐ তো সে ছুটে গেলো দুর্গাদাসের কাছে : 'দেখি, দেখি' ব'লে নিচু হ'য়ে তার পায়ের পাতা টিপে-টিপে দেখতে লাগলো—'আঃ, কী হচ্ছে !' ব'লে স'রে গিয়ে গৌতমের পাশে ব'সে পড়লো দুর্গাদাস, সঙ্গে-সঙ্গে বন্দনাও ব'সে পড়লো একেবারে দুর্গাদাসের গা ঘেঁষে, (সোফাটায় ঠিক তিনজনের মতো জায়গা নেই), আধখানা আঁচল তার কোলে এলিয়ে দিয়ে মুখ তুলে তরল চোখে তাকিয়ে বললো, 'ওগো, চলো না এবার বাড়ি যাই।'—মনোমুগ্ধকর ভান, অমানুষিক শাঠ্য। বন্দনা—যার সরলতাকে সে কিছুক্ষণ আগেই বোকামি ব'লে ভাবছিলো—সেও তাহ'লে এত চালাক, এত ধূর্ত ? আর-একবার মাথা নিচু হ'লো হিমেন্দুর ; মাথার চুল টানতে-টানতে ভাবলো : 'একদিকে বন্দনা আর দুর্গাদাস, আর-একদিকে তার "গিন্নি"কে নিয়ে গৌতম—বিয়ে মানে কি এই ?'

'আমাকে এবার উঠতে হচ্ছে,' কোটের হাতা অল্প একটু সরিয়ে তার রোলেক্স ঘড়িতে চোখ ফেললো গৌতম। 'আমি কি তোমাদের কোথাও নামিয়ে দিতে পারি, বন্দনা ?'

'আমি একটু পরে যাবো,' এই সুযোগে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো দুর্গাদাস, জানলার তাকে কনুই রেখে দাঁড়ালো। 'তুইই বা এক্ষুনি উঠছিস কেন, গৌতম? আর-একটু বোস, তোদের স্টীল-কর্পোরেশনের গল্প আরো শুনি। এমন সুন্দর দিনটা হয়েছে আজ—একটু বিয়ার-টিয়ার হ'লে দিব্যি অড্ডা জমানো যেতো,' ব'লে শ্রীপতির দিকে আড়চোখে তাকালো দুর্গাদাস।

শ্রীপতি চোখ সরিয়ে নিলো। হিমেন্দুর মতো, সেও ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারছিলো, সেও লজ্জিত হচ্ছিলো মনে-মনে-দুর্গাদাসের জন্য, তার নিজের জন্যেও। লজ্জা করছিলো ভাবতে যে দুর্গাদাস—এককালে তার সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু—সে এখন তারই 'অধীনে' চাকরি করে, সে-ই তাকে 'সুপ্রভাত'-এ ঢুকিয়েছিলো, আর তারই জন্য—অনেক অনিয়ম, কামাই, গাফিলি সত্ত্বেও—চাকরি বজায় আছে তার, যদিও তাকে নিচু পদ থেকে উঁচুতে তুলতে শ্রীপতিও পারেনি—সেজন্য চেষ্টাও করেনি, সত্যি বলতে, তার কোনো উপায় রাখেনি দুর্গাদাস। আর যেহেতু দু-পক্ষই এ-বিষয়ে সচেতন, তাই তাদের মধ্যে পুরোনো বন্ধুতা ঝাপসা হ'য়ে গেছে। পরস্পরকে এখন আর তারা 'তুই' বলে না, অমন ভোলানাথ দুর্গাদাসও আগের মতো খোলামেলা ব্যবহার করতে পারে না তার সঙ্গে। আগে হ'লে বলতো, 'কিছু টাকা ছাড়, শ্রীপতি, বিয়ার খাওয়া যাক!' এখন শুধু আড়চোখে তাকায়।—টাকা জিনিশটা কী নোংরা—চাকরি, সাংসারিক মর্যাদা, অন্য কারো 'অধীন' কি 'উপরিওলা' হওয়া—কী কুৎসিত নোংরা এই ব্যাপারগুলো!

হিমেন্দু লক্ষ করলো 'বিয়ার' কথাটা শোনামাত্র বন্দনার চোখ দুটি ছোটো হ'লো, ঠোঁটের কোণ কামড়ে ধরলো সে।

'আমাকে মাপ করতে হবে, আমার একটা মীটিং আছে গ্র্যাণ্ড হোটেলে। তারপর লাঞ্চ।'

'তা বেশ তো। তার আগে একটু খিদে ক'রে নে।'

'খিদে জাগাবার উপকরণ ওখানে একটু বেশিই থাকবে— আমাদের ম্যানেজেরিয়েল বোর্ডের লাঞ্চ তো। তা সুখের বিষয় আমার স্বাভাবিক খিদে বলবৎ আছে এখনো, ওটার জন্য সাহায্যের দরকার হয় না।'

'সে কী রে? অমন একটা বিরাট চাকরি করিস, আর মদ খাস না!'

'মদ খেতে হবে এমন কোনো শর্ত আছে নাকি কোনো চাকরিতে?' (বন্দনার চোখ গৌতমের এই কথাটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করলো, হিমেন্দুর তা নজর এড়ালো না।) 'তবে হ্যাঁ—পার্টির ধুমধাড়াক্কা তো লেগেই আছে, যেতেই হয়, আর একটু কিছু না-নিলেও ভালো দেখায় না। আমি করি কী জানিস—গিয়েই এক গ্লাশ বিয়ার হাতে নিই, সেটাতেই অল্প-অল্প চুমুক দিয়ে কাটিয়ে দিই সারাটা সময়। ভদ্রতাও বজায় থাকে, স্বাস্থ্যেরও কোনো ক্ষতি হয় না।'

'ধুশ্! ওর চেয়ে একদম না-খাওয়া ভালো,' ব'লে শ্রীপতির দিকে এক পলক তাকালো দুর্গাদাস। 'তা নিজে না খাস বন্ধুদের তো খাওয়াতে পারিস মাঝে-মাঝে। একবার নন্দীনগরে একটা হৈ-হৈ উইক-এণ্ড ক'রে এলে হয় সবাই মিলে—কী বলো, শ্রীপতি?' শ্রীপতি ক্ষীণস্বরে বললো, 'তা গেলে হয়।' 'হিমেন্দু রাজি আছো? জানো, বন্দনা, গৌতমের বাংলোয় চোদ্দখানা ঘর আর আধবিঘে জোড়া কম্পাউণ্ড। পেল্লায় ব্যাপার!'

'ও মা, তা-ই নাকি!' মিহি গলায় বন্দনা ব'লে উঠলো, 'কী করো, গৌতম, অতগুলো ঘর দিয়ে?'

বন্দনার কথার সোজাসুজি কোনো জবাব দিলো না গৌতম, তার মুখের হাসি আর-একটু ব্যাপক হ'লো। 'হ্যাঁ, ব্যবস্থা-ট্যবস্থা ভালোই করেছে ওখানে,' টেনে-টেনে বলতে লাগলো সে, 'নিম্নতম মজুরের জন্যও দু-খানা ঘর আর বারান্দাওলা পাকা বাড়ি, একটু

উঠোন, বিনামূল্যে জল আর ইলেকট্রিসিটি, ভাড়া মাত্র সাড়ে-দশটাকা—মানে, কিছুই না। এখন বোধহয় বুঝতে পারছো কেন ওখানে ধর্মঘট হয়নি কখনো? শ্রীপতি একজন রিপোর্টার পাঠিয়ে দিয়ো না কোনো সময়ে—তোমাদের একপাতা-জোড়া ফীচার হ'তে পারে। কিন্তু আমার আর সময় নেই—'

ওঠার ভঙ্গি করলো গৌতম, পরমুহূর্তে আলগোছে বললো, 'হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে গেলো, তোমরা হয়তো ইন্ট্রেস্টেড হবে। তোমরা কি কেউ জানো যে আরতি মৈত্র কলকাতায় ফিরে এসেছে?'

একসঙ্গে বন্দনা আর দুর্গাদাসের গলা বেজে উঠলো—'ও মা! তা-ই নাকি? কী মজা!' আর: 'আরতি! ফিরে এসেছে? কই, আমরা তো কিছু শুনিনি।' হিমেন্দু আড়চোখে তাকালো শ্রীপতির ঈষৎ ফ্যাকাশে-হ'য়ে-যাওয়া মুখের দিকে; তার মনে প'ড়ে গেলো আরতিদের তেতলার ছাতে সেই চৈত্রমাসের সন্ধ্যাগুলি, সেই একটা সময়, যখন সকলেরই মনে হয়েছিলো যে সুখ সম্ভব—তখন দুর্গাদাসও কোনো-কোনোদিন তার অমলাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে, আর এমনকি আমিও যেন বন্দনার মন ছুঁতে পেরেছিলাম। আমাদের সকলের মধ্যে শ্রীপতি যেন একটি নতুন ও আশাপ্রদ যোগসূত্র—তার আরোগ্যলাভ, আরতির সঙ্গে তার বিয়ে হবার নিশ্চয়তা—এতে একটি সুন্দর আদর্শের সফলতা যেন দেখতে পেয়েছিলাম আমরা—আর নিজেদের জন্যও মস্ত এক আশ্বাস। কিন্তু হঠাৎ কেমন সব ওলোটপালোট হ'য়ে গেলো।

"শ্রীপতিও জানো না কিছু?' ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি নিয়ে শ্রীপতির চোখে চোখ ফেললো গৌতম। 'আমাকে খবরটা দিলে একটি আমেরিকান এঞ্জিনিয়ার—আমাদের নন্দীনগরে নতুন এসেছে দু-বছরের চুক্তিতে, ফ্র্যাঙ্ক মর্গ্যান নাম। আমাকে একদিন কথায়-কথায় বললে, "তোমাদের কলকাতার একটি মেয়েকে আমি অ্যান আর্বরে চিনতাম—আরতি রডম্যান—অসাধারণ মেয়ে!" ব'লে

একটু অদ্ভুতভাবে হাসলো ফ্র্যাঙ্ক। আমি জিগেস করলাম, "তার কুমারী-নাম কী ছিলো, জানো?" "দাঁড়াও, মনে করছি। অবশ্য তার "রডম্যান" পদবি অচিরেই চুকে গিয়েছিলো—কেউ তো সত্যি ও-ধরনের স্ত্রী চায় না; ঠকিয়ে টাকাও নেবে, আর তার ওপর আবার—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কুমারী নাম ছিলো "মাইট্র"—Oh, she was great fun!" আমি জিগেস করলাম কেমন দেখতে মেয়েটি; ফ্র্যাঙ্ক যা বর্ণনা দিলে তা থেকে মিলিয়ে নিতে কোনো অসুবিধে হ'লো না। "আমি দেশ ছাড়ার আগে দৈবাৎ শুনলাম আরতি কলকাতায় চ'লে গেছে ফেমাস ফ্র্যাব্রিক্স-এ চাকরি নিয়ে, আর বিয়েও করেনি, আমি ভাবছি কলকাতায় গিয়ে পুরোনো বন্ধুতা ঝালিয়ে নেবো তার সঙ্গে—আশা করি আমাকে তার মনে আছে এখনো," এই ব'লে ফ্র্যাঙ্ক চোখ টিপে হাসলো। আমার খারাপ লাগলো কথাগুলো শুনে; যে-সব ছাত্রছাত্রী বাইরে যায় তাদের ওপর আমাদের দেশের সুনাম তো নির্ভর করে অনেকটা, তবে আরতি তো বরাবরই একটু—'

'কী যা-তা বলছিস!' প্রচণ্ড আওয়াজে ব'লে উঠলো দুর্গাদাস। 'এ-সব সত্যি নয়—হ'তেই পারে না! আমি থাকলে তোর আমেরিকান এঞ্জিনিয়ারটাকে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিতাম! আর তুই, গৌতম—তোর লজ্জা করলো না আবার আমাদের কাছে এ-সব খবর উগরোতে? তোর মনে নেই—তোর মনে নেই—' উত্তেজনায় কথা শেষ করতে না-পেরে দুর্গাদাস হাঁপাতে লাগলো।

গৌতমের ফর্শা মুখটি একটু লাল হ'লো, লম্বা শরীরে ঝকঝকে পোশাকে উঠে দাঁড়ালো সে। ঈষৎ কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'ওয়েল, সত্যি না-হ'লে আমিও সুখী হবো কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক মর্গ্যান আমাকে আরো যা বলেছিলো তা শুনিয়ে তোদের সুকুমার চিত্তে আঘাত দিতে চাই না। তোরা ইচ্ছে করলে খোঁজ নিতে পারিস কথাগুলো মিথ্যে না সত্যি।'

দুর্গাদাস জিগেস করলো, 'ও কোথায় চাকরি করে বললি ?'

'কে, আরতি ? ঐ যে ফেমাস ফ্র্যাব্রিক্স—কাগজে যার বড়ো-বড়ো বিজ্ঞাপন দেখিস।—চলি, আমার মীটিঙের প্রায় সময় হ'লো,' বলতে-বলতে যেন বিজয়গর্বে স্ফীত হ'য়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলো গৌতম।

কয়েক মুহূর্ত সকলেই চুপ, তারপর শ্রীপতি আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমাকেও যেতে হচ্ছে এবার। আপিশে কাজ আছে।'

ঠাণ্ডা ঘর, কার্পেটে মোড়া মেঝে, দেয়াল-জোড়া কাচের চৌবাচ্চার সবুজ জলে নানা রঙের মাছের খেলা, সিঁদুর-রঙের সীলিং, দরজায় চিকরি-কাটা পাৎলা বাঁশের পর্দা, এ-মুহূর্তে সে ছাড়া আর খদ্দের নেই ;—শ্রীপতি ব'সে আছে, গদি-আঁটা আসনে পিঠ এলিয়ে, লাল নীল হলদে সোনালি মাছগুলোর চঞ্চলতার দিকে তাকিয়ে—এক কৃত্রিম, পলাতক, নিঃশব্দ নিরাপত্তায়, ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট, সামনে এক পাত্র নির্জলা হুইস্কি। আপিশে গিয়েছিলো একবার (সেখানে কেউ তাকে আজ আশা করেনি যদিও), এ-পর্যন্ত যা নতুন খবর এসেছে তাতে চোখ বুলিয়েছে, কালকের কাগজের জন্য লিখে দিয়ে এসেছে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বিষয়ে এডিটরিয়েল (সে 'কাজের লোক'! সে 'এফিশেণ্ট'!)—লেখার মাঝখানে টেলিফোন বেজেছিলো একবার—ময়না—('আমি আপিশে এসে আটকে গিয়েছি··· সন্ধেবেলা ··· হ্যাঁ, নিশ্চয়ই !), তারপর হঠাৎ যেন অসহ্য হ'য়ে উঠলো আপিশ, মনে হ'লো বড্ড খিদে পেয়েছে। এড়িয়ে গেলো তার অভ্যস্ত জায়গাগুলো—সাহিত্যিক-অধ্যুষিত নিউ ব্রিস্টল, সাংবাদিক-পোষিত পাম বীচ—এলো এই চড়া দামের রেড লোটাস-এ, যেখানে দিনের বেলা কখনোই ভিড় থাকে না। সে চায় না এখন

কোনো চেনা মানুষ, কোনো কথাবার্তা—হিমেন্দুর ওখানে যথেষ্ট হ'য়ে গেছে ও-সব। এসে প্রথমেই ঠাণ্ডা বিয়ার (প্রথম গ্লাশটা এক চুমুকে—ওঃ, কী তেষ্টাই পেয়েছিলো!), সঙ্গে কিছু চীনে খাবার—একটা হুইস্কি—এই দ্বিতীয়টা নিয়েছে শুধু ব'সে থাকার জন্য, শুধু সময় কাটাবার জন্য। না—আর অ্যাল্কহল চাই না আমি—আমি ভাবতে চাই, ভেবে দেখতে চাই।

কী-রকম একটা কৌতুকনাট্যের দর্শক আজ হ'তে হ'লো আমাকে। বন্দনা, দুর্গাদাস—বড্ড পুরোনো হ'য়ে যাচ্ছে ওদের ব্যাপারটা, রঙিন পুতুলের ভেতরকার সব ছেঁড়া ন্যাতা বেরিয়ে পড়ছে—ওদের এবার কিছু ব্যবস্থা করা উচিত, আমার বোধহয় কিছু বলা উচিত দুর্গাদাসকে। কিন্তু আমি কোন মুখে কী বলতে যাবো—আমাকেও তো ঠিক 'আদর্শ স্বামী' বলা যায় না। আর তাছাড়া, এই যে আমরা কাউকে বলি 'ভালো', কাউকে বলি 'খারাপ'—তারই বা অর্থ কী? আসলে সব মানুষই সুখ চায়, খুজে পায় না, নানারকম চেষ্টা করে সেজন্য—আসলে অধিকাংশ মানুষই অসুখী—কোনো-না-কোনোভাবে, কোনো-না-কোনো কারণে—এমনকি (শ্রীপতির ঠোঁট বেঁকে গেলো হাসিতে)—এমনকি গৌতমও, তার মার্সেডিজ়, তার হলিউডের মাপজোকওলা স্ত্রী, তার চোদ্দখানা ঘর আর আধবিঘে জমির কম্পাউণ্ডওলা বাংলো—সব সত্ত্বেও সেও হয়তো ঈষৎ অসুখী ছিলো এতদিন, হয়তো ভুলতে পারেনি আরতির কাছে তার প্রত্যাখ্যানের অপমান, এমনকি হয়তো এমনও একটা সন্দেহ মাঝে-মাঝে তার মনে উঁকি দিয়েছে যে তার ভাগ্য তাকে আসল একটা জায়গায় ঠকিয়েছে। কিন্তু তার সেটুকু কাঁটাও উপড়ে নিয়েছে ঐ আমেরিকান এঞ্জিনিয়ার—কী অসাধারণ তৃপ্তির সঙ্গে গৌতম আজ মনে-মনে বলতে পারছে (মনে-মনে কেন, প্রায় সকলকে শুনিয়ে, আহত নীতিবোধের কপট দাম্ভিক ভঙ্গি ধারণ ক'রে: 'আ—আরতির এই পরিণাম হয়েছে তাহ'লে!

তাহ'লে এখানেও আমারই জিৎ হ'লো!'

ভাবতে গেলে একটা অসাধারণ ঘটনা—এই যে কয়েকজন পুরোনো দিনের চেনা মানুষ হঠাৎ আজ একত্র হয়েছিলো ঘণ্টাখানেকের জন্য। ইন্দুর ফ্ল্যাটে। আমি ব'সে আছি চুপচাপ, ওদের দেখছি, ওদের কথা শুনছি—আমার মনে হচ্ছে যেন একটা হ'য়ে-যাওয়া ঘটনাই আবার ঘটছে এখানে, শুধু সাজগোজ আর দৃশ্যপট আলাদা, আর তাছাড়া একটু এলোমেলো হচ্ছে ব্যাপারটা, অনেকেই যেন পার্ট ভুলে গেছে, বা নেমেছে কোনো ভুল ভূমিকায়, তাই ছেঁড়া কথায় ঠিক জোড়া দিতে পারছে না। তবু শেষ পর্যন্ত কোনো-এক ক্রান্তি, কোনো-এক তীব্র মুহূর্ত—যেমন সেদিনকার ককটেল-পার্টিতে, যখন দূর থেকে হঠাৎ আমার চোখে পড়লো—তাকে, যখন গোলগাল মুখের ছোকরা ইংরেজটির মুখে বিকৃত উচ্চারণে তার নাম শুনলাম। সেই নাম আবার—গৌতমের নোংরা মুখে তোমার নাম, আরতি! একটা চাবুক পড়লো আমার মনের ওপর, কিন্তু আমি কষ্ট পাইনি, বা সেই কষ্টও যেন সুখের, কেননা সে-মুহূর্তে আমি জেনেছিলাম আমি নিঃসাড় নই, আমি ম'রে যাইনি।··· সব আমাকে ভাবতে হবে আবার—নতুন ক'রে—প্রথম থেকে নতুন ক'রে। আমি মানি, সবই চঞ্চল, সবই আকস্মিক—আর তার একটি মস্ত উদাহরণ হ'লো—তথাকথিত প্রেম, যা নিয়ে যুগে-যুগে তরুণ-তরুণীরা তোলপাড় ক'রে থাকে। সত্যি কি আমরা বেছে নিতে পারি কাউকে? না কি ব্যাপারটা একটা এলোমেলো খেলা শুধু—যার কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম পর্যন্ত নেই? আসলে এই প্রেম কি শুধু বিশেষ কয়েকটি মুহূর্তের ব্যাপার নয়—কয়েক মুহূর্তের বুকের দুরুদুরু, কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা, কয়েক মুহূর্তের স্মৃতি—শেষ পর্যন্ত শুধু এ-ই? কে পারে জীবন ভ'রে প্রেমে প'ড়ে থাকতে, কে পারে জীবন ভ'রে ভালোবাসতে? কিন্তু কেন—জগৎসংসারে সবই যখন দ্যাখ-না-দ্যাখ বদলে যায়, ভেঙে পড়ে সাম্রাজ্য, নষ্ট হয় আন্তর্জাতিক

মৈত্রী ; কোনো জাতির সত্তা, কোনো দেশের সীমান্তরেখা, এমনকি কোনো দেশের নাম—তাও যখন হ'তে পারে দাবাখেলার গুটি, দড়ি-টানা পুতুল ; আর ভগবান হ'তে পারেন মানুষের প্রয়োজন-মতো বুদ্ধ, যীশু, কূর্ম, কালী, গণিত অথবা ইতিহাস—তখন মানুষের জীবনের মধ্যে প্রেমকেই কেন স্থায়ী হ'তে হবে ? সেটা আশা করাই অন্যায়, কল্পনা করাও ভুল। যখনকার যা, সেটাই ঠিক, যা হবার তা এই মুহূর্তেই হ'য়ে গেলো—এমনি ক'রেই তৈরি হ'য়ে ওঠে সেই জোড়াতালি-দেয়া অর্থহীন ব্যাপারটা, আমরা যাকে সাধারণত জীবন ব'লে থাকি।

কিন্তু—অন্য কোনো সম্ভাবনা নেই কি ? কে বলবে এটাই শেষ কথা ? এমনও কি হ'তে পারে না যে আমাদের অবিশ্বাসও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয় ? মাঝে-মাঝে আমাদের সংশয় বিষয়েই একটু সংশয় পোষণ করা উচিত নয় কি আমাদের ? স্থিরতা নেই, কিন্তু হয়তো কিছু আছে যা ফিরে আসে, অন্তত ফিরে আসতে পারে—এই যেমন কিছুক্ষণ আগে, হঠাৎ আশাতীতভাবে হিমেন্দুর ওখানে, আমার হারিয়ে-যাওয়া বছরগুলি যেন উঠে দাঁড়ালো আমার সামনে, আমাকে চমকে দিয়ে, আমাকে আমার নিজের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে। তাহ'লে কেন, কেন আমি চুপ ক'রে থাকবো, কেন আমার এই রক্তমাংসের দেয়াল ফাটিয়ে চীৎকার বেরোবে না—'আরতি! আমি তোমাকে ভুলিনি।'

কত না উত্তেজিত হয়েছিলো দুর্গাদাস, কী-রকম গর্জন ক'রে বলেছিলো, 'না, সত্যি নয়, হ'তে পারে না!' সে লোক ভালো—নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য সকলেরই প্রতি তার মমত্ববোধ, সহৃদয়তা। কিন্তু ও-সব কথা নিয়ে বিচলিত হবার কী আছে ? যদি সব সত্য হয়—কী এসে যায় ? নির্ভর করে, মানুষটা কে, তার ওপর। সে দস্তা দিয়ে না সোনা দিয়ে তৈরি, তার ওপর। তার হৃদয় বেঁচে আছে না ম'রে গেছে, তার ওপর। 'পতন' হ'তে পারে শুধু তারই,

যে স্বভাবতই উঁচু মহলের অধিবাসী। সে-ই নামতে পারে অন্ধকারে, যে আলোর দিকে ওঠার জন্য ব্যাকুল। আমার সেই আলোর স্বপ্ন, পঁচাত্তর তলার ঘরের স্বপ্ন—তা আজ বেরিয়ে এসেছে বাইরে ; এখন আমি একে নিয়ে কী করি—কী করি—কী করি ?

দেয়ালের কোণে মাথা রেখে এলিয়ে বসলো শ্রীপতি, তার চোখ বুজে এলো। আমার ক্লান্তি লাগছে, আমার ঘুম পাচ্ছে। শুনতে পেলো তার মাথার মধ্যে একটা মৃদু, নিয়মিত শব্দ—যেন কোনো পোকার ডাক, কোনো হাত-ঘড়ির টিকটিক।···'হঠাৎ অনেকদিন পরে জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো সুব্রতর।' না—ও-রকম না। ফোঁটা-ফোঁটা জল, বাথরুমের কল থেকে পড়ছে, কেউ শুনছে ভোরবেলা শুয়ে-শুয়ে—ঘুম ভেঙে গেছে, জেগেও ওঠেনি। শুনছে, ভাবছে। ভাবছে, শুনছে। কাউকে কোনো কথা দিয়েছিলো—রাখা হয়নি। কোনো জরুরি কাজ ফেলে রেখেছে বহুদিন। কী-কথা, কী-কাজ—মনে করতে পারছে না। ফোঁটা-ফোঁটা জলের শব্দ—'মনে আছে? মনে নেই?' লোকটা হয়তো লেখক—এখন আর লিখতে পারছে না, তবু চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে। এ কি তবে নতুন আরম্ভ—এ কি তারই পাথর ফেটে ঝ'রে পড়ছে ফোঁটা-ফোঁটা জল, সরু স্রোতে, কাগজের ওপর ছোটো-ছোটো অক্ষরের রেখার মতো? আমাকে শুনতে দাও—শুনতে দাও এই জলের শব্দ, আমাকে এখন জানিয়ো না।···

কিন্তু ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তেও শ্রীপতি বুঝলো সে ঘুমিয়ে পড়ছে, চোখ রগড়ে জেগে উঠলো। একটা সিগারেট ধরালো, রেস্তোরাঁর ঘড়িতে চোখ ফেললো একবার। টেলিফোনের কাছে গিয়ে ফেমাস ফ্যাব্রিক্স-এর নম্বর ঘোরালো।

৭

ছোটো-ছোটো কামড়ে, অন্যমনস্কভাবে, ঝকঝকে শার্সি-আঁটা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে, আরতি একটা হ্যাম স্যাণ্ডুইচ খাচ্ছিলো। বাইরে ময়দান, ঘাসের ওপর হলুদ রোদ ছড়ানো, আকাশ হালকা-নীল, দূরে দেখা যাচ্ছে হাওড়া-পুলের মস্ত উঁচু জোরালো ভঙ্গি। কেমন শান্ত মনে হয় শহরটাকে এই দশতলার জানলা থেকে—ট্রাম-বাস্ এর শব্দ পর্যন্ত পৌঁছয় না। মনেই হয় না এই শহর এত বিক্ষুব্ধ, এত উত্তাল। অবাস্তব—বাইরের ঐ দৃশ্য, এই এয়ার-কণ্ডিশণ্ড দশতলার আপিশ, আর এই ঝকঝকে পরিপাটি ঘরটি, যেখানে সপ্তাহে পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টা ধ'রে সে ফেমাস ফ্যাব্রিক্স-এর কাটতি বাড়াবার জন্য 'গবেষণা' করে। কিন্তু আমার জীবনটাও তো তা-ই—অবাস্তব। কোত্থেকে কোথায় ঘুরেছি এই এতগুলো বছর ধ'রে, কোথাও বাসা বাঁধিনি, আর এখন আমি যেখানে আমি সেখান-কারও নই। বেশ লাগে জেট-প্লেনে লম্বা পাড়ি দিতে, বাইরে অন্ধকার রাত, চলেছি তেত্রিশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে—যেন জগতের বাইরে চ'লে এসেছি, ডুবে আছি একটা না-ঘুম না-জাগরণের আবছায়ায়। কিন্তু মাঝে-মাঝে নামতেই হয় মাটিতে—ভূমণ্ডলের কোনো-এক বিন্দুতে, যেমন একদিন এখানেও নেমেছিলাম, এক শেষ-বর্ষার গুমোট রাত্তিরে। ব্যাঙ্কক থেকে ছাড়বার পরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জেগে উঠলাম হস্টেসের ডাকে—একটা নতুন জিনিশ দিয়েছে এবার—মিষ্টি মেশানো পাতিলেবুর রস, গন্ধটা টাটকা, চমৎকার স্বাদ। কলকাতার একটা সাংকেতিক ঘোষণা বোধহয়? আরতি পিঠ খাড়া ক'রে বসলো; প্লেন নামতে শুরু করেছে—গতি ক্রমশ মৃদু, গর্জন

বদলে গিয়ে গুঞ্জন হ'লো ; কিন্তু এমন-কিছুই সে দেখতে পেলো না যাতে মনে হয় একটা মহানগর কাছে আসছে, যাতে প্রায়-পৌঁছনো যাত্রীর মনে জাগতে পারে কোনো উৎসাহ বা কৌতূহল। অন্ধকার— শুধু থিকথিকে অন্ধকার বাইরে। আর বেরিয়ে আসামাত্র—গরম : ভারি, অনড়, কুটকুটে একটা ব্যাপার—আশাতীত। স্যাঁৎসেঁতে মাটি, মিটমিটে আলো, ঝিঁঝিঁর শব্দ, ব্যাঙের ডাক—এক মলিন, বিষণ্ণতাময়, নিদ্রালু মফস্বল। কিন্তু : ওটুকুই যা তফাৎ, তাছাড়া সবই এক—এখানে, না ওখানে, না সেখানে, কী এসে যায়? তার অবাক লাগলো না যে কেউ তার জন্য অপেক্ষা ক'রে নেই এয়ারপোর্টে (যা হনলুলুতে ছিলো, এমনকি টোকিওতেও) ; অবাক লাগলো না যে তার নিজের মনেও কোনো সাড়া জাগালো না কলকাতা। এলো প্যান-অ্যাম-এর গাড়িতে শহরে, সেখান থেকে ফেমাস ফ্যাব্রিক্স-এর উর্দি-আঁটা একটি বেয়ারা তাকে ট্যাক্সিতে ক'রে নিয়ে এলো তার জন্য ঠিক-ক'রে-রাখা বোর্ডিংহাউসে। কয়েকটা মিনিট কাটালো তার এই নতুনতম বাসস্থলটি পরীক্ষা ক'রে—তা মন্দ না, ভালোই ; অর্থাৎ, যে-কোনো জায়গায় যেমন হ'য়ে থাকে, তেমনি—শুধু জৌলুশ কম, আর বাথরুমে একটা নোটিশ টাঙানো যে কলের জল খাওয়ার পক্ষে নিরাপদ নয়—এটা অন্য কোথাও দ্যাখেনি। স্যুটকেস খুলে রাত-পোশাক পরলো, প্লেনে কেনা কন্যাক চাখলো একটু, তারপর ঘুম—পরের দিনটা বাদ দিয়ে আপিশে যোগ দিলো। আর তারপর থেকে—আপিশ আর বোর্ডিংহাউস, আর মাঝে-মাঝে পার্টি, সিনেমা, হিন্দি হাই স্কুলে কোনো ইংরিজি নাটক হয়তো—সবই নিয়মমাফিক। কলকাতার বিদেশী আর অবাঙালি মহলে কিছু চেনাশোনা হয়েছে তার ; তাদের মধ্যে দু-জন কিছুটা ঘনিষ্ঠ হবারও চেষ্টা করছে (অর্থাৎ, রুটিনে কোথাও ফাঁক নেই) ; তার চলাফেরার বৃত্ত চৌরঙ্গি-পার্কস্ট্রিট পাড়ায় আবদ্ধ, তার আলাপের ভাষা ইংরিজি ;—এইভাবে, অস্তিত্বের সনাতন ও আরামদায়ক একঘেয়েমির মধ্যে ধরা প'ড়ে গিয়ে, প্রায়

তিন মাস কাটিয়ে দিয়েছে আরতি। কিন্তু এরই মধ্যে হঠাৎ সেদিন

জানলা থেকে স'রে এলো সে; চা অপেক্ষা করছে, পট থেকে ঢেলে নিয়ে চুমুক দিলো। চায়ের গন্ধ যেন সূক্ষ্ম একটা বার্তা পৌঁছিয়ে দিলো তার মগজে, কেমন একটা বাংলাদেশের, বাঙালি বাড়ির গন্ধ—মনে-মনে বললো: এটা কলকাতা, আমি কলকাতায় ফিরেছি। এখানেই আমার জন্ম, এখানেই আমি ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছিলাম, লম্বা হয়েছিলাম, পৌঁচেছিলাম চোদ্দ, ষোলো, উনিশ, একুশ—এই সব বয়সগুলিতে। আমার মুখের ভাষা, আমার চুল আর চামড়ার রং, সব আদিম ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সব আদিম ভালোমন্দ-বোধ, রক্তের মধ্যে মিশে-থাকা আর ব'য়ে-চলা সব ধারণা, আমার মনের সবচেয়ে তলাকার মাটি—এখানেই তৈরি হয়েছিলো। জ্যান্ত ছিলো এই শহর একদিন আমার পক্ষে—ভরপুর, উচ্ছল; জীবন যেন হাজার হাত বাড়িয়ে আমাকে তার স্রোতের মধ্যে টেনে নিয়েছিলো। আমি ছড়িয়ে যাচ্ছি—দূরে, আরো দূরে, আমারই মধ্যে আমার যেন অন্ত নেই: এমনি মনে হ'তো তখন। আর আজ—আরতির ঠোঁট হাসিতে বেঁকে গেলো—আজ আমি ফিরে এসেছি বিদেশীর মতো (যেন ভিতু, যেন লজ্জিত, যেন লুকিয়ে আছি—কিন্তু লজ্জা তো আমার নয়! আমার নয়!), এসে উঠেছি প্রেটরিয়া স্ট্রীটে মিসেস রবিন্সের বোর্ডিংহাউসে, যেটার অস্তিত্বও হয়তো জানে না সেই লোকেরা, যারা ট্রামে-বাস্-এ ঘুরে বেড়ায়, থাকে হেদোর পেছনে, বা হাজরা রোড থেকে বেরোনো কোনো সরু গলির দোতলায়।—কিন্তু ভালো তো, এই জীবনই তো ভালো। দ্রুত বদলে যাচ্ছে জগৎটা; যে-দেশে জন্মেছিলাম সেখানেই জীবন কাটাতে হবে, এ-কথা এখন অর্থহীন হ'য়ে গেছে, এমনকি মানুষের কোনো সুনির্দিষ্ট দেশ থাকা চাই, তাও অনেকে মানছে না আজকাল। দেখেছি গতির আশ্চর্য লীলা—যে-সব দেশে কাটিয়ে এলাম এতদিন, হাত-পা গজানোমাত্র কে কোথায় ছিটকে পড়ে ঠিক নেই, বছর-বছর

নতুন গাড়ি, সপ্তাহে-সপ্তাহে মেয়েদের চুলের নতুন রং, আর স্বামী-স্ত্রীর অদলবদল এমন একটা সাধারণ ব্যাপার যে তা নিয়ে কেউ কথাও বলে না। দৈবে আমিও প'ড়ে গিয়েছিলাম সেই স্রোতের মধ্যে, এখন সেটাই অভ্যেস হ'য়ে গেছে, ছেড়ে যেতে কোনো পিছু-টান নেই, পৌঁছতে কোনো উৎসাহ নেই—হালকা ঝরঝরে জীবন।

কিন্তু সেই রাত্রে—প্রথমে ককটেল-পার্টি, তারপর সঞ্জয় মেননের আলিপুরের ফ্ল্যাটে ডিনার—ফিরতে বেশ রাত হ'লো, কিন্তু আমি তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়তে পারলাম না। বারান্দায় এসে বসলাম, একটা অন্ধকার বাগান আমার সামনে, বোর্ডিংহাউসে আমি ছাড়া কেউ জেগে নেই। প্রথমে আমার মনে হ'লো এক নিথর স্তব্ধতা ঘিরে আছে আমাকে, অন্ধকারে বড্ড অচেনা লাগলো চারদিক। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ছোটো-ছোটো সব শব্দ আমার কানে এসে পৌঁছতে লাগলো—কখনো পাখির ডানা-ঝাপটানি, কখনো গাছের পাতার শিরশির, ক্লান্ত কোনো রিকশার টুংটাং। তারপর শুনলাম শিশির ঝ'রে পড়ছে—টপ্, টপ্, টপ্, অন্ধকারেও দেখলাম কুয়াশা নেমে আসছে মাটিতে, বাতাসে যেন ভেজা ঘাসের গন্ধ। আর তারপরেই যেন অন্য দু-একটা গন্ধ পেলাম—বোশেখ মাসে গ'লে-যাওয়া অ্যাস্ফল্টের, প্রথম কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির পরে ভেজা ধুলোর, আমাদের স্কুলের সরস্বতীপুজোয় অঞ্জলির পরে জ'মে-ওঠা গাঁদাফুলের খুব ফিকে, পচা-পচা গন্ধ। রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম আমাদের মানিকতলার বাড়িতে ফিরে এসেছি, কিন্তু বাড়িটা অন্যরকম হ'য়ে গেছে, আর আমিও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যেন সাহস পাচ্ছি না, মনে-মনে ভাবছি—এতদিন হ'য়ে গেলো—ন-বছর—কেউ কি চিনতে পারবে আমাকে?

ঠিক ন-বছর নয়, মাঝে একবার এসেছিলাম—বাবাকে শেষ দেখা দেখতে। যে-ভাবে এসেছিলাম তা ভীষণ, ফিরে গিয়ে যা করেছিলাম তা অকথ্য। মিশিগানে পড়ছি আমি তখন, লণ্ডন থেকে

একটা এম. এ. ক'রে সন্থ এসেছি আমেরিকায়। অ্যান আর্বরে পৌঁছবার পরের দিন—মস্ত ছড়ানো ক্যাম্পাসের মধ্যে হেঁটে-হেঁটে এ-বাড়ি ও-বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি, মার্কিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন তখনও ঝাপসা আমার কাছে—হঠাৎ ফুটপাত ঘেঁষে একটা গাড়ি থামলো, একটি যুবক নেমে এসে বললো, 'মাপ করবেন, আপনি কি ভারতীয়?' আমি জিগেস করলাম, 'বলতে পারেন কার্কউড হল্‌টা কোনদিকে?' 'কার্কউড হল্‌? আমি সেদিকেই যাচ্ছি—আপনার আপত্তি না-থাকলে নিয়ে যেতে পারি।' আমি ক্লান্ত ছিলাম, নতুন জায়গায় ভালো ঘুমোতে পারিনি রাত্রে, তার আগের রাতটা গ্রেহাউণ্ড বাস্‌-এ কেটেছিলো—অচেনা যুবকটির সাহায্য পেয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। যেতে-যেতে সে জিগেস করলে আমার নাম কী, ভারতের কোন শহর থেকে আসছি—ইত্যাদি, তারপর নিজের পরিচয় দিলে—দেখা গেলো সে-ও সাইকলজি বিভাগেরই ছাত্র। আমাকে নিয়ে গেলো বিভাগের চেয়ারম্যানের কাছে, তারপর অন্য কয়েকটা আপিশে, সারাক্ষণ থাকলো আমার সঙ্গে-সঙ্গে—একা-একা যা ক'রে উঠতে আমার হয়তো সারাদিন কেটে যেতো, তার সাহায্যে তিন ঘণ্টায় তা হ'য়ে গেলো। আমি তাকে প্রচুর ধন্যবাদ জানালাম, সে বললে এটা তারই সৌভাগ্য, কেননা সে যেটুকু ভারতীয় দর্শন পড়েছে তা খুব নাড়া দিয়েছে তার মনকে, ভারতবর্ষ বিষয়ে সে আরো জানতে চায়।

এমনি ক'রে শুরু হ'লো সেই সম্পর্ক—যা ছিঁড়তে গিয়ে আমি টুকরো হ'য়ে ভেঙে গিয়েছিলাম। আমারই দোষ—বা বোকামি—বা দুর্ভাগ্য। ডন রডম্যান, হার্ভার্ড-গ্র্যাজুয়েট, আমাদের বিভাগের সেরা ছাত্র, চেহারাটিও চোখে পড়ার মতো, কিন্তু ধরন-ধারন একটু গম্ভীর ব'লে অনেকে তাকে ঠাট্টা ক'রে বলে 'বস্টন ব্রাহ্মিন'। সে মেলামেশা করে সকলের সঙ্গেই সহজভাবে, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের নাচের আসরে হৈ-হল্লায় বড়ো-একটা যোগ দেয় না; তার চুল কপাল

ছাপিয়ে উপচে পড়ে, যদিও তখন জোর চলছে কদম-ছাটের ফ্যাশন; সে কবে কোন মেয়েকে 'ডেইট' করেছিলো—বা করেছিলো কিনা—সেটা ছাত্রীদের মধ্যে একটা গবেষণার বিষয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটে—প্রায়ই দেখা হয় ডনের সঙ্গে আমার, প্রতি মঙ্গলবার বিকেলে সেমিনার-ক্লাশে মুখোমুখি ব'সে দু-ঘণ্টা কাটাই আমরা—আমার মনে হয় আমি মুখ ফেরালেই তার চোখ ছুটে আসে আমার দিকে। আমি বুঝতে পারি সে একটু বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে আমার প্রতি—কাফেটেরিয়ায় সুযোগ পেলেই এক টেবিলে বসে আমার সঙ্গে, লাইব্রেরির স্ট্যাক থেকে বই খুঁজে দেয়, মঙ্গলবারে ক্লাশের পরে আমাকে পৌঁছিয়ে দেয় ডর্মে—কিন্তু সর্বদাই এমন একটি দূরত্ব বজায় রেখে চলে, আর আমি কখনো আপত্তি করলে এমন সহজভাবে বলে 'বাঃ, তাতে কী হয়েছে?'—যে আস্তে-আস্তে তার সঙ্গে আমার এক ধরনের বন্ধুতা গ'ড়ে উঠলো। সময়ে-অসময়ে তার সঙ্গে গল্প করতে আমার ভালো লাগে, পড়াশুনোর ব্যাপারে তার সাহায্য নেয়া আমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেলো; আমি যাই তার সঙ্গে কখনো কোনো আর্ট-ফিল্ম দেখতে, বা জিম্‌স ট্যাভার্নে পিলাউ আর শিশ-কেবাবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করি, একদিন সে তার নিজের অ্যাপার্টমেন্টেও খাওয়ালো আমাকে—অবশ্য শুধু আমাকেই নয়—সে যে কখনো আমাকে একা বলে না, যে-কোনো ব্যাপারে সঙ্গে আরো কেউ-না-কেউ থাকেই—আমারই জাপানি সহ-পাঠিনী হয়তো, বা সস্ত্রীক তার কোনো বন্ধু, সেজন্য আমি মনে-মনে প্রশংসা করি তাকে, আর তার সঙ্গে মেলামেশায় বেশ আরাম পাই।

তখন নবেম্বর মাস চলছে; একদিন ছাত্রছাত্রীদের চড়ুইভাতি হ'লো শহর থেকে পঁচিশ মাইল দূরে ব্রাউন ফরেস্টে। সেদিন মেঘ রোদ্দুর বাতাসের খেলা চলছিলো সকাল থেকে—গরম রোদ, ঠাণ্ডা হাওয়া, ছাই রঙের মেঘ—আর পথে-পথে হলুদ সিঁদুর লাল রঙের ঝরা পাতা। প্রথমে শক্ত কাঠের বেঞ্চিতে ব'সে ঠাণ্ডা লাঞ্চ—

তারপর সবাই এদিক-ওদিক ছিটকে পড়লো, অনেকে জোড়ে-জোড়ে হাতে হাত ধ'রে নির্জনতার খোঁজে, কেউ-কেউ কৃত্রিম হ্রদে নৌকো বাইতে, কেউ-কেউ ব্লু রিজ্-এর চুড়োয় উঠে আশে-পাশের দৃশ্য দেখার জন্য। আমি ঘাসের ওপর একা ব'সে-ব'সে দেখছিলাম টুকটুকে লাল পাতাগুলো কেমন খ'সে পড়ছে ডাল থেকে, উড়ে-উড়ে যাচ্ছে হাওয়ার ধাক্কায়, জমা হচ্ছে কোনো স্তূপের ওপর বা নতুন স্তূপ তৈরি ক'রে তুলছে—হঠাৎ দেখি, কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে ডন এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমি ব'লে উঠলাম, 'আরে, তুমি!' 'কেন, আমি আসতে পারি না?' 'ওরা কে যেন বলছিলো তুমি রাজি হওনি পিকনিকে আসতে।' 'হঠাৎ ইচ্ছে হ'লো—চ'লে এলাম। তুমি বোধহয় এই প্রথম এলে ব্রাউন ফরেস্টে? একটু ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করো কি?' 'আমার এখানেই বেশ লাগছে। তোমাদের হেমন্ত ঋতু বড়ো সুন্দর।' আধো ঠাট্টার ধরনে বললো, 'তুমি কি রাগ করবে যদি বলি তুমিও খুব সুন্দর?' আমি হালকা হেসে বললাম, 'তা-ই নাকি?' 'যদি অনুমতি দাও তোমার একটা ছবি তুলি।—তোমাকে কিছু করতে হবে না, যেমন আছো তেমনি ব'সে থাকো।' ডনের ক্যামেরায় টুক-টুক শব্দ হ'লো অনেকবার, তারপর সে আমার পাশে ব'সে প'ড়ে বললো, 'কী, জানো—একটু আগে তোমার মুখের ভাবটি খুব সুন্দর হয়েছিলো, জানি না সেটা ধরতে পেরেছি কিনা। তা যা-ই হোক, এই রঙিন বনের সঙ্গে তোমার শাড়ির পীকক্-ব্লু চমৎকার ম্যাচ করেছে—ছবি বোধহয় খারাপ হবে না।' একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আর দু-সপ্তাহ পরেই তো থ্যাঙ্কসগিভিং-এর ছুটি—তুমি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছো না?' 'আমি আর কোথায় যাবো?' 'আমার খুব ইচ্ছে করে তোমাকে একবার বস্টনে নিয়ে যাই।' 'বস্টনে? আমাকে?' সে ঝুঁকে প'ড়ে বললো, 'আমার মা-বাবা আছেন সেখানে, আর বোন, তোমারই বয়সী, র‍্যাডক্লিফে

পড়ে—তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। সবাই মিলে একদিন বেড়াতে যাওয়া যাবে ভের্মন্টে—কি নিউ হ্যাম্পশায়ারে—হেমন্ত ঋতু সবচেয়ে সুন্দর ও-দুটো জায়গায়। যাবে?' আমি আবছা গলায় জবাব দিলাম, 'আমি কী ক'রে যাই।' 'কী ক'রে? আমার গাড়িতে যাবে—ফিরে আসবে—স্টীভ আর লিণ্ডাও যাচ্ছে আমার গাড়িতে—তোমার খারাপ লাগবে না।' 'আচ্ছা, ভেবে দেখি।' 'তার মানে—তুমি রাজি নও? কেন তোমরা ভারতীয় মেয়েরা অত গুটিয়ে থাকো, বলো তো?' আমি এক ঝলক তাকালাম তার দিকে, আমার চোখে চোখ পড়ামাত্র সে অন্য রকম সুরে বললো, 'কিন্তু না—এই রকমই ভালো।' তারপর সে ভারতবর্ষ বিষয়ে কথা তুললো—সাধারণ মানুষের জীবনে কি গীতার কোনো প্রভাব আছে এখনো? মনুসংহিতার? আমি বললাম, 'একই সঙ্গে গীতা আর মনুসংহিতার নাম কোরো না—মনুসংহিতা জঘন্য বই। "নারী নরকের দ্বার" সেখানেই আছে না?' একটু হেসে ডন উত্তর দিলো, 'না, না, জঘন্য বলা ঠিক হ'লো না তোমার—ওতে অনেক গভীর জ্ঞানের কথাও আছে।'

'এত ক'রে বললাম, তবু এলে না—' 'বস্টন থেকে ডন চিঠি লিখলো আমাকে, আমার ভাবতে খারাপ লাগছে যে এ-দেশের এই উৎসবের সময়ে তুমি একা আছো।'—ছুটির মধ্যে এই চিঠি একদিন পৌঁছলো আমার হাতে, মুহূর্তের জন্য একটু খারাপ লাগলো আমার, মনে হ'লো গেলেই পারতাম, সত্যি বোধহয় বড্ড বেশি গুটিয়ে আছি নিজের মধ্যে—এতে কার কী লাভ হচ্ছে? তারপরেই মনে হ'লো—না, এ-ই তো ঠিক, এই যে আমি একা আছি, এটাই আমার সত্যিকার জীবন, কোনো-এক রহস্যময় কারণে আমার এই একাকিত্ব যেন খুব একটা দামি আর উঁচু দরের জিনিশ। ক্রিসমাসের লম্বা ছুটিতেও (ডনের অনেক পিড়াপিড়ি সত্ত্বেও) এই একাকিত্ব আমি বজায় রাখলাম—সারা ক্যাম্পাস শুনশান, বরফের জন্য রাস্তায়

বেরোনো শক্ত, ডর্মে আছে আমি ছাড়া আর আর দুটিমাত্র থাই মেয়ে—লম্বা চিঠি লিখি বাবাকে, মোটা-মোটা উপন্যাস পড়ি, রাত্রে শুয়ে-শুয়ে উত্তুরে হাওয়ার চীৎকার শুনি—এমনি ক'রে দিন কাটছে আমার, নিঃসঙ্গতার তেতো-মিষ্টি আস্বাদে ভরা দিনগুলি। একদিন হঠাৎ একটি লোক এসে আমার হাতে দিয়ে গেলো টকটকে লাল গোলাপের এক প্রকাণ্ড তোড়া—সঙ্গের কার্ডটিতে এই শহরেরই এক দোকানের নাম দেখলাম, প্রেরকের নাম ডন রডম্যান। দু-ঘণ্টা পরে এক্সপ্রেস ডাকে ডনের চিঠি এলো। ছ-পাতা জোড়া চিঠি—তার সারমর্ম হ'লো : সে আমাকে ভালোবাসে, আমাকে বিয়ে করতে চায়।

চিঠিখানা আগাগোড়া আমি একবার পড়লাম, দু-বার পড়লাম—একবার তাকালাম জানলা দিয়ে শাদা, ধূসর পৃথিবীর দিকে, আর-একবার তাকালাম আমার ঘরের কোণে ফুলদানিতে রাখা টকটকে লাল গোলাপগুলোর দিকে। আমার অবাক লাগলো যে মাত্র চারমাসের চেনাশোনায় একেবারে বিয়ে পর্যন্ত ভেবে ফেলেছে ডন—আর কতদূর পর্যন্ত ভেবেছে, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় লেখা নয় চিঠিটা, শুধু প্রেমের উচ্ছ্বাসে ভরা নয়, যাকে বলে সুচিন্তিত, তা-ই। এই বিয়ের ফলে যা-কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে তার প্রত্যেকটাই আলোচনা করেছে : আমাকে পুরো দেশত্যাগী হ'তে হবে না, আত্মীয়স্বজনকে ছাড়তে হবে না, দুই দেশের মধ্যে ভাগাভাগি ক'রে সে থাকতে চায়,—সে বাংলা শিখবে, তার ডক্টরেট হ'য়ে গেলে কোনো ফাউণ্ডেশনকে রাজি করাবে তাকে গবেষণার জন্য বাংলাদেশে পাঠাতে, পরে এমন কোনো কাজ নেবে যাতে মাঝে-মাঝে ভারতবর্ষে যেতে হয়, আসামের আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করার একটা প্ল্যান সে করেছে মনে-মনে (আর আমিও যদি সেই কাজে যুক্ত হ'তে চাই সে তো আরো সুখের কথা)—এমনকি—যদিও বাহুল্য ছিলো—এ-কথাও উল্লেখ করতে ভোলেনি যে সে গির্জে-পোষিত খৃষ্টান ধর্মে

বিশ্বাসী নয়, তার ধর্ম মানবতা। আমি বুঝলাম সে যা লিখেছে তা তার দিক থেকে খুবই খাঁটি, আমি নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারলাম না যে চিঠিখানায় সে নিজেকে একজন উচ্চশিক্ষিত, গভীর স্বভাবের মানুষ ব'লে প্রমাণ করেছে।

ভাবলাম সেদিন সারাদিন ব'সে—না-ঘুমিয়ে অনেক রাত্তির পর্যন্ত। তুমি আমার প্রেমে পড়েছো, ডন? আমাকে বিয়ে করতে চাও? কিন্তু আমি তো তোমার প্রেমে পড়িনি। সত্যি—কেনই বা পড়িনি? তিন মাস কম সময় নয় আসলে, আর এত ঘন-ঘন দেখাশোনা—আর তুমি এত ভালো, দেখতে এত সুশ্রী, আমিই অন্তত দশটি মেয়েকে চিনি তোমার নাম শুনলে যাদের চোখের তারা নেচে ওঠে। আমারও ভালো লাগে তোমাকে—যেমন কুমিতাকে ভালো লাগে, কি লিণ্ডাকে, কি আলেসান্দ্রোকে—না, আরো বেশি, কিন্তু ঐ ভালো লাগা পর্যন্তই, তার বেশি আর-কিছু নয়। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে নিজেকে জিগেস করলাম, 'তুমি কি পারবে না ডনকে ভালোবাসতে—এখন না হোক, পরে? সে তো অযোগ্য নয়।' কিন্তু আমার এই প্রশ্ন যেন একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে বার-বার। আমার মনের গোপনতম স্তর পর্যন্ত খুঁজে-খুঁজে দেখলাম আমি—নেই, কোথাও কিছু নেই, কেউ জবাব দিচ্ছে না, টুঁ শব্দটি নেই কোথাও। যেন ধ্ব'সে গেছে আমার মনের সেই তলাকার জমি, যেখানে ভালোবাসার অঙ্কুর ধরে, ফুল ফোটে—একটা বিরাট গর্ত হাঁ ক'রে আছে সেখানে। আমি উঠে বসলাম, বিছানা থেকে নেমে পাইচারি করতে লাগলাম আলো জ্বেলে, যেন অচেতনভাবে খুঁজতে লাগলাম ডনের বিরুদ্ধে কোনো জোরালো যুক্তি, এই চিঠির পেছনে কোনো অসাধু উদ্দেশ্য টেনে বের করার চেষ্টা করলাম—আর হঠাৎ একটা কথা মনে ক'রে থমকে দাঁড়ালাম মেঝেতে। বুঝেছি, ব্যাপারটা তাহ'লে এ-ই! ডন রডম্যান, তুমি আমার শরীরটাকে চাও—এ-ই তো? জানো, ভারতীয় মেয়েরা সাধারণত অন্য রকম হয়,

তোমাদের অবাধ মেলামেশার প্রথায় তারা ধরা দিতে চাইবে না— তাই তুমি কখনো 'ডেইট' চাওনি আমার কাছে, আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার কোনো চেষ্টা করোনি, এমন কোনো ভাব দেখাওনি যে আমার সঙ্গে একা হওয়া তোমার ইচ্ছে— আর এমনি ক'রে আমার মনে বিশ্বাস জাগিয়ে এখন বিয়ের প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছো— বিয়ে, কেননা তুমি বুঝেছো যে আমার শরীরটাকে মুঠোর মধ্যে পেতে হ'লে সেটাই একমাত্র উপায়। চতুর তুমি, ডন রডম্যান, কিন্তু এবার তোমার আসল চেহারাটি আমি দেখতে পেয়েছি, তুমি আর আমাকে ভোলাতে পারবে না। ভাবতে-ভাবতে আমার মাথায় যেন আগুন জ্ব'লে উঠলো, ডনের প্রতি যেটুকু বন্ধুতার ভাব আমার মনে জ'মে উঠেছিলো সব যেন এক দমকে মুছে গেলো, আমার বিতৃষ্ণা জন্মালো তার ওপর, কেমন নোংরা আর কুৎসিত মনে হ'তে লাগলো তাকে— যে-সব কারণে এতদিন তাকে মনে-মনে প্রশংসা করেছি সেগুলি মরা পাতার মতো খ'সে গেলো, তার নামের সঙ্গে, চেহারার সঙ্গে জড়িয়ে গেলো লোলুপ একটা কামনার ছবি শুধু, যা আমাকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে পিষে মারার জন্য রুখে উঠেছে। একটা মিষ্টি গন্ধ পেলাম হঠাৎ— চোখে পড়লো সেই গোলাপের গুচ্ছ। আমাকে দেখে হাসলো যেন ফুলগুলি। বড্ড কড়া এই গন্ধ— বিশ্রী— এই গন্ধ আমাকে ঘুমোতে দেবে না রাত্রে, এখনই আমার দম আটকে আসছে। আমি তুলে নিলাম সেই টশটশে তাজা ফুলগুলিকে— করিডরে বেরিয়ে গিয়ে জঞ্জালের ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে এলাম। চিঠিটা ফেললাম না— ওকে ফেরৎ দেবো ব'লে।

ছুটির শেষ দিন সেদিন, ক্যাম্পাস ভ'রে উঠেছে, ডন আমার সঙ্গে ডর্মে দেখা করতে এলো— তখন রাত প্রায় এগারোটা, বাইরে তুমুল বেগে বরফ পড়ছে। কিছুমাত্র ভূমিকা না-ক'রে বললো, 'আমার চিঠি পেয়েছিলে?' 'পেয়েছিলাম।' 'রতি, তোমার আর-কিছু বলার নেই?' এই প্রথম সে 'রতি' ব'লে ডাকলো আমাকে— আমি

বুঝলাম সংস্কৃত কথাটার অর্থ সে ভালোই জানে—আমার গা শিউরে উঠলো, তার ঠোঁটের রেখায় যেন উগ্র লোভ দেখতে পেলাম। 'শোনো, ডন, আমি বুঝতে পারছি তোমার বিয়ে করা দরকার, কিন্তু এই বিশাল ক্যাম্পাসে আর কি মেয়ে নেই? এই বৃহৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর কি মেয়ে নেই?' ক্ষীণ হেসে বললো, 'আছে অনেক, কিন্তু আমার কাছে অস্তিত্ব আছে শুধু একজনের।' ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আবার বললো, 'আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না, রতি। আমার কোর্স-ওঅর্ক শেষ হ'য়ে এলো, এখন শুধু ডিসার্টেশনটা লেখা বাকি, আমার মাল-মশলা সব তৈরি হ'য়ে আছে, শিগগিরই শুরু ক'রে দেয়া উচিত, কিন্তু আমি মন দিতে পারছি না অন্য কিছুতে, তুমি আমার সব চিন্তা কেড়ে নিয়েছো।' 'তা-ই নাকি?' আমার মনে প'ড়ে গেলো ঠিক এইরকম কথা গৌতম আমাকে বলেছিলো একবার, ডনের মুখের দিকে তাকাতেও যেন ঘেন্না করলো। 'একটু বোসো, এক্ষুনি আসছি,' ব'লে আমি আমার ঘর থেকে তার চিঠিটা নিয়ে এলাম, সেটাকে খামসুদ্ধু দু-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে তার হাতে দিয়ে বললাম, 'এ-ই আমার উত্তর।' ডনের মুখ আগুনের মতো লাল হ'য়ে উঠলো, মাথা নিচু ক'রে বেরিয়ে গেলো সে। আর তারপর—এর অল্প কয়েকদিন পরেই—পিসিমার চিঠি।

'কেশবের শরীরটা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না, তুই কি একবার আসতে পারবি কোনোমতে?' একটা হিম হাওয়া—এ-দেশের বরফ-ঝড়ের চেয়েও নিষ্ঠুর—ব'য়ে গেলো আমার বুকের মধ্যে সেই মুহূর্তে। চিঠিটা পড়লাম কয়েকবার: সব পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। লিখেছেন পিসিমা: বোঝাই যায় বাবাকে লুকিয়ে। ছোটো চিঠি, আর বেশি কিছু খবর নেই, টেলিগ্রামের বদলে নিরীহ চেহারার সাধারণ এয়ার-লেটার: তার মানে, আমাকে উতলা করতে চাননি, অনেক কমিয়ে বলা হয়েছে। '…শরীর ভালো যাচ্ছে না': অর্থাৎ, অনেকদিন ধ'রে অসুখ। 'একেবারেই…' মানে, খুব খারাপ। 'তুই কি

একবার আসতে পারবি?' বলতে চাচ্ছেন—এক্ষুনি চ'লে আয়। 'কোনোমতে…': এর দুটো অর্থ হ'তে পারে;—এক, পড়াশুনো ফেলে আসা সম্ভব কিনা—দুই, টাকার জোগাড় কী ক'রে হবে? শেষেরটাই ঠিক—পারলে কি বাবা আমাকে প্লেনের টিকিট পাঠিয়ে না দিতেন? কিন্তু আমারই জন্য তাঁর হাতে টাকা আজ নেই; ইনশুরেন্স ভাঙিয়ে আমাকে পাঠিয়েছিলেন লণ্ডনে, দু-বছর সেখানকার পড়া-খরচ চালিয়েছিলেন। আর এখন নিশ্চয়ই রোজগারও বন্ধ অসুখের জন্য? তাছাড়া, কী ক'রে আমি আর টাকা নিতে পারি বাবার কাছে; আমার মুখ চেয়ে, শুধু আমার মুখ চেয়ে যা-কিছু তিনি করেছিলেন, তারপর—আবার? অসম্ভব। আমি আছি এখানে স্কলার্শিপ নিয়ে, আমার ব্যাঙ্কে এখন কুড়ি ডলারও নেই; তিন বছর ধ'রে তিলে-তিলে ফেরার টাকা জমিয়ে ফেলবো—এই আমার আশা। অথচ—আমাকে যেতেই হবে। আমার মনে পড়লো বেশ কিছুদিন বাবার চিঠি পাইনি—অথচ সপ্তাহে অন্তত একটা তিনি লেখেনই, আর কী-রকম মন-ভরানো লম্বা চিঠি সব! দেরাজ খুলে বের করলাম বাবার চিঠিগুলো: শেষটাতে চব্বিশ দিন আগেকার একটা তারিখ বসানো। এতদিন—এতদিন হ'য়ে গেছে! প্রায় তিন মাস আগেকার একটা চিঠিতে হঠাৎ চোখ পড়লো: 'মাঝে-মাঝে আমার পিঠে একটা ব্যথা হয় আজকাল, ভাবছি গাড়ি চালানো ছেড়ে দেবো।' কিন্তু তারপর আর পিঠের ব্যথার কোনো উল্লেখ নেই। মানে: অসুখটা বেড়ে যাচ্ছে, আমার কাছে লুকোচ্ছেন, ভাবছেন কিছু না, সেরে যাবে; এখন শয্যা নিয়েছেন, নিজের হাতে চিঠি লেখারও বোধহয় সাধ্য নেই। আর আমি… আমি এখানে কী করছি?

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরালো আরতি, চেয়ারে হেলান দিলো, নীলচে ধোঁয়া পোঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠলো তার চুলের ওপর দিয়ে। মনস্থির করতে দেরি হয়নি আমার। টেলিফোনে

বলেছিলাম, 'ডন, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে? একবার দেখা করবে আমার সঙ্গে?' তারপর, শহরের বাইরে হাইওয়ের ওপর একটা নিরিবিলি রেস্তোরাঁয় ব'সে বাকি কথা হ'লো। 'আমি ভুল করেছিলাম, ডন। যা ভাবছিলাম, তুমি ভুল করছো—একটি কালো চামড়ার বিদেশী মেয়েকে বিয়ে করা তোমার ঠিক হবে না। কিন্তু—তুমি যদি সত্যি চাও, তাহ'লে—তা-ই হোক।' 'সত্যি বলছো?' ডন জড়িয়ে ধরলো আমাকে, আমি তার প্রথম চুম্বন উপহার পেলাম। 'কিন্তু বিয়ের আগে একবার কলকাতায় যেতে চাই, ডন। আমার মা নেই, বাবার একমাত্র সন্তান আমি। বাবার সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। না—সম্মতি নেবার জন্য নয়; আমি জানি, তিনি খুব খুশি হ'য়েই মত দেবেন এতে; তবু—এত বড়ো একটা ঘটনা আমি তাঁকে চিঠিতে জানাতে চাই না (আমাদের দেশের ধরন-ধারন অন্য রকম জানো তো), মুখোমুখি কথা বলতে চাই। তুমি কি এতে রাজি হবে?' ডন একটু ভেবে বললো, 'কবে যেতে চাও? ক-দিনের জন্য?' 'সম্ভব হ'লে কালকেই। যত শিগগির যেতে পারবো, তত শিগগিরই তুমি যা চাও তা হ'তে পারবে।' 'বেশ—ঘুরে এসো।' 'আমি কিস্তিতে টিকিট কিনবো ভাবছি, তুমি কি আমার গ্যারেণ্টার হবে?' বেদনার ছায়া পড়লো ডনের মুখে, আমার হাত জড়িয়ে ধ'রে বললো, 'রতি, এখনো তোমার এত সংকোচ? আর দু-দিন পরে সব দায়িত্ব তো আমারই হবে।' 'কিন্তু—অনেক টাকার ব্যাপার যে।' 'ভেবো না। আমার একুশ বছর বয়স হবার পর বাবা তাঁর কিছু শেয়ার আমার নামে রেখেছিলেন, আমি সহজেই ব্যাঙ্ক থেকে ধার পেতে পারবো।'... দু-ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক হ'য়ে গেলো। ব্যাঙ্ক, গয়নার দোকান, গাড়িতে ব'সে আংটি-বদল, ট্র্যাভল-এজেন্ট। এক্ষুনি পাকা বুকিং পাবার জন্য ন্যুয়র্কে ফোন করলে ওরা; আমার হাতে এলো ডেট্রয়ট-ন্যুয়র্ক-কলকাতার রাউণ্ড-ট্রিপ প্লেনের টিকিট, আর পথ-খরচা বাবদ দু-শো

ডলার (আমি নিলাম টাকাটা, বাবার কথা ভেবে); ডেট্রয়ট থেকে প্লেন ধরার আগে তিন রাত কাটালাম ডনের সঙ্গে, ওর অ্যাপার্টমেন্টে, আমি যে ওকে সত্য বলেছি, শরীর দিয়ে তার প্রমাণ দিলাম। ওস্তাদ মেয়ে—ডনকে বুঝতেই দিইনি কী চলছে আমার মনের মধ্যে। কিন্তু—সেই প্রথম রাতটায়—আমি কান্না সামলাতে পারিনি। ডন টের পায়নি অবশ্য, আমি উঠে বাথরুমে গিয়েছিলাম। না—বাবার জন্য নয়, আমি আমার শরীর বিক্রি করেছি ব'লেও নয়; ঠিক জানি না কেন। আজ ভাবতে হাসি পায়—আমি আমার হারানো কুমারীত্বের জন্যে কেঁদেছিলাম। অতটা স্পষ্ট ক'রে বোধহয় ভাবতে পারিনি তখন, কিন্তু ব্যাপারটা তা-ই। চাইনি—এটা আমি চাইনি—এ-রকম কথা ছিলো না কখনো। আমি নোংরা হ'য়ে গিয়েছি, ক্লেদাক্ত। এমন একটা ঘটনা, যার কোনো প্রতিকার নেই; যা একবার হ'য়ে গেলে আর 'না' হয় না কখনো! আমার যেন ভয় হচ্ছিলো যে এর ফলে কোনো কুৎসিত পরিবর্তন হবে আমার—চুল উঠে যাবে হয়তো, বা মুখ ভ'রে গোল-গোল পিণ্ডের মতো ব্রণ বেরোবে—বা অমনি কিছু। তখনও তুমি ছেলেমানুষ ছিলে, আরতি, তখনও অনেক-কিছু বাকি ছিলো।

বাবার মৃত্যু, দু-সপ্তাহের জায়গায় দেড় মাস পরে আমার ফিরে আসা; আবার অনিবারণীয় ডন; তার সমবেদনা, সচুম্বন সান্ত্বনা; আমরা আইনসম্মতভাবে স্বামী-স্ত্রী হলাম। তার প্রণয়ের উচ্ছ্বাস কিছু বেশি; এক-এক রাত্রে তিনবারেও সে তৃপ্ত হয় না; আমার মনে হয় সে যেন তার পশুত্বকে আমার মধ্যে নিষ্কাশিত ক'রে দিচ্ছে (যেমন নর্দমা দিয়ে ময়লা বেরিয়ে যায়, তেমনি); তার ডিসার্টেশন লেখার জন্য, বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার জন্য প্রস্তুতির এটাই শেষ ধাপ; আমাকে সর্বাঙ্গে কলুষিত ক'রে সে চাচ্ছে নিজের উন্নতি। সে যখন আমার জন্য কোনো উপহার নিয়ে আসে, আমার মনে হয় কোনো লম্পট তার রক্ষিতাকে খুশি করছে। সে যখন আমার ছেলেবেলার কথা,

কলকাতায় আমার জীবনের কথা জানতে চায়, আমার ভয় হয় সে বুঝি আমার অতীতটাকেও গ্রাস করবে এবার। সে যখন আমার 'ব্রাউন বিউটি'র প্রশস্তি করে, আমি মনে-মনে বলি—'আমি মিথ্যে ভয় পেয়েছিলাম, এতে কেউ কুচ্ছিৎ হ'য়ে যায় না, হ'লে বাঁচা যেতো।' বেমানান—ডন আর আমি, আমি আর বিয়ে : আমার অসহ্য হ'য়ে উঠছে, আমাকে কেটে পড়তে হবে। কিন্তু—যে-ভাবে আমি ওকে বিয়ে করেছি, তারপরে আমার নিষ্কৃতি কোথায়? আমাকে রাগিয়ে দিতে হবে ওকে, আমাকেও অসহ্য হ'য়ে উঠতে হবে ওর কাছে—ওর কাছে যে-দীক্ষা পেয়েছি সেই পথেরই চরমে যেতে হবে। আমার ধরনধারন বদলে গেলো; আমি ভেবে-চিন্তে তা-ই করতে লাগলাম, যা ডন একেবারেই পছন্দ করে না। আমি ঘন-ঘন পার্টি দিচ্ছি বাড়িতে—মদের পার্টি, নাচের পার্টি, শিখে নিচ্ছি টুইস্টের কাৎরানো, ডনকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি ফ্র্যাটার্নিটির হৈ-হল্লার আসরে; সে ডিনারের পরে বই খুলে বসলে বায়না তুলছি আমাকে নিয়ে সিনেমায় যাবার জন্য—আর এই সবই সে মেনে নিচ্ছে হাসিমুখে, হয়তো ভাবছে এগুলো আমার ক্ষণিকের খেয়াল—দু-দিন পরেই কেটে যাবে। অবশেষে এক শনিবারের পার্টিতে, রাত যখন দেড়টা, আর অনেকের চোখেই মদের ঘোর লেগেছে, আমি বাজি রেখে ফ্র্যাঙ্ক মর্গ্যানকে জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেলাম, তারপর ফ্র্যাঙ্ক যখন আমাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি তোমাকে খেয়ে ফেলতে পারি, জানো?' তখন খিলখিল ক'রে হেসে উঠে গা এলিয়ে দিলাম। পরদিন ডন আমাকে বললে, 'তোমার হয়েছে কী, রতি?' 'কী আবার হবে।' 'তুমি ভারতের মেয়ে; তুমি যা, তা-ই তো খুব ভালো। তোমার অন্য রকম হবার দরকার কী?' আমি হালকা সুরে বললাম, 'আমি কী, তুমি তার কিছুই জানো না।' এর পর আমাকে অবশ্য আরো কয়েকটা ধাপ এগিয়ে যেতে হ'লো; রূঢ় হাতেই ভেঙে দিতে হ'লো আমার বিষয়ে ডনের

'ভারতবর্ষীয়' স্বপ্ন; আমার স্বেচ্ছাচারিতা এতদূর গড়ালো যে আমাকে না-তাড়ালে—ডিসার্টেশন লেখা দূরে থাক, ডনের আত্ম-সম্মান পর্যন্ত বজায় থাকে না। যুদ্ধে জয় হ'লো আমার; গ্রীষ্মের ছুটির আগেই ডিভোর্স হ'য়ে গেলো। আর তারপর—বছরের পর বছর—শুধু ভেসে বেড়ানো, ভেসে থাকা, ডুবে না-যাওয়া। অ্যান আর্বরে আমার পড়াশুনো বেশি এগোয়নি; আমার স্কলার্শিপ কাটা গেছে; নতুন ক'রে শুরু করলাম ক্যানসাসে; খুব অল্প-অল্প কোর্স নিয়ে কোনোমতে ছাত্রীত্বের মেয়াদ বাড়িয়ে চলা (যাতে ভিসা নিয়ে গোলমাল না বাধে); ছোটোখাটো কোনো অ্যাসিস্ট্যাণ্টশিপ; লাইব্রেরিতে, বুক-স্টোরে কাজ; একবার গ্রীষ্মে ন্যুয়র্কের এক বীট-কাফেতে ওয়েইট্রেস হ'য়ে বখশিশে বেশ কিছু রোজগার হ'য়ে গেলো (চোখে ঘন শুর্মা টেনে, কুচকুচে কালো আঁটো পাৎলুন আর বডিস প'রে কাজ করতে হ'তো সেখানে); আর্বানায় এসে এক বৃদ্ধদের হোমে চাকরি; হঠাৎ সামার-স্কুলে পড়ানোর কাজ জুটে গেলো;—এমনি ক'রে টাকা জমিয়ে-জমিয়ে আমার পি.-এইচ. ডি.; তারপর ফেমাস ফ্যাব্রিক্স (ভাগ্যে মার্কেটিং রিসার্চে কোর্স নিয়েছিলাম একবার)··· প্রথমে ওদের মন্ট্রিয়াল আপিশে, তারপর··· কলকাতা।

সেই কয়েকটা মাস—ডনের সঙ্গে বিয়ে, তোমার টেনে-হিঁচড়ে আদায়-করা ডিভোর্স: আরতি, তুমি কোথায় নেমে এসেছিলে? পর-পর আরো কয়েকটা খুচরো ব্যাপার—একমাস মেয়াদ, এক সপ্তাহ, কোনোটা শুধু এক রাতেরই জন্য: তোমার কি মাথার ঠিক ছিলো না? কেন, দোষ কী? কে চায় আবদ্ধ থাকতে, একমেবা-দ্বিতীয়মের ভজনা করতে, যদি না অবস্থার চাপে, সমাজের চাপে বাধ্য হয়? সন্তান হবার ভয় তো নেই আর—কী এসে যায়? ভালো বরং;—আমি আন্তিকালের সব কুসংস্কার কাটিয়ে উঠছি; হ'য়ে উঠছি সেই নতুন পৃথিবীর মানুষ, যেখানে অনেক দীর্ঘ শতাব্দীর পর এতদিনে

খ'সে পড়ছে শূদ্রের ও স্ত্রীলোকের শৃঙ্খল, দাসত্ব আর মেনে নিচ্ছে না কেউ, সব মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। ভালো, খুব ভালো; আমি শিক্ষা দিলাম নিজেকে; বুঝে নিলাম ব্যাপারটা কী; আমার মধ্যে যেটুকু পুরোনো বাষ্প জ'মে ছিলো, সব বেরিয়ে গেলো। আমার কাছে কেউ যেন আর প্রেমের কথা বলতে না আসে। আমার বাবা যখন কলকাতায় মারা যাচ্ছেন, আমি তখন অ্যান আর্বরে আলিঙ্গনাবদ্ধ; আমার বাবা যখন শুয়ে-শুয়ে ভাবছেন, কার কাছে ধার ক'রে আমার ফেরার টাকা পাঠানো যায়, আমি তখন নগ্নীকৃত··· বিমর্দিত··· বিপুষ্পিত হচ্ছি। প্রেম—আরতি ঠোঁট কুঁকড়ে ঐ ছোট্ট কথাটা উচ্চারণ করলো :—ঘেন্না!

টেবিলের ঠাণ্ডা, মসৃণ কাঠের ওপর হাত রেখে চোখ বুজলো সে। কেউ জানে না, আমি ছাড়া কেউ জানে না আমার কষ্ট। আমার শরীরের যন্ত্রণা, আমার মনের জ্বালা, আমার আত্মার গ্লানি। আমার হতাশা, আমার বিতৃষ্ণা (জগতের ওপর, নিজের ওপর), কতবার আমার আত্মহত্যার সংকল্প। আর সেই নিঃসঙ্গতা, যা নিয়ে গর্ব করা চলে না পর্যন্ত, যা আর মিষ্টি নেই, তেতো কড়া ঝাঁঝালো কিছুই নেই, যা গজিয়ে উঠেছে আমার চামড়ার ওপর আর-এক পল্লা চামড়ার মতো, আমার অস্তিত্বের ওপর অদৃশ্য একটা আবরণ—আমি আর টের পর্যন্ত পাচ্ছি না! শেষ পর্যন্ত যে-একমাত্র অবশিষ্ট মানুষটিকে আমি 'আমার' বলতে পারতাম, সেই বাবাও আর নেই—যা-কিছু আমার ছিলো এককালে (যার জন্য আমি নিজের কাছেই মূল্যবান ছিলাম), সেই সবই এক ঝাপটে হারিয়ে গেলো: আমার যৌবন, আমার স্বাতন্ত্র্য, আমার কলকাতা। আমি উন্মূল, আমি উচ্ছিন্ন, আমি উৎপাটিত; কেন বেঁচে আছি তাহ'লে? আর সেই শুধু বেঁচে থাকাটুকুর জন্য—কী কষ্ট, কী অপমান! কত ঠাণ্ডা ঘরে শীতে কেঁপেছি আমি, বরফের মধ্যে কত মাইলের পর মাইল হেঁটেছি পনেরো সেণ্ট বাস্-ভাড়া বাঁচাবার জন্য, ক্লান্ত পায়ে কত চারতলার সিঁড়ি

ভেঙে শস্তা ঘরে উঠে এসে তক্ষুনি কালো কফি গিলে পাঠ্যবই খুলে বসেছি—আমি ছাড়া কেউ তা জানে না, আজকের আমাকে দেখে তা কল্পনাও করতে পারবে না কেউ। জয়ী—আমি সব দিক থেকেই জয়ী হয়েছি; তোমরা আমাকে কিছু বলতে এলে আমার তৈরি আছে ছোরার মতো উত্তর।

কিন্তু, আরতি, তুমি কি কখনো ডনের কথা ভাবো? ডন রডম্যান—আদর্শবাদী, হৃদয়বান, বিশ্বাসপরায়ণ, ভারত-ভক্ত বিদেশী যুবক—কী করেছিলে তুমি তার সঙ্গে? আমার তখন মাথার ঠিক ছিলো না, বাবার কথা ভেবে দিশেহারা হ'য়ে পড়েছিলাম। তাহ'লে কেন সরলভাবে বলতে পারোনি, 'আমার বাবা মৃত্যুশয্যায়, আমাকে যেতেই হবে।' চেয়েছিলাম বলতে—কিন্তু কেমন ক'রে সব অন্য রকম হ'য়ে গেলো, কখন কলকাতার প্লেনে উঠবো, এ ছাড়া আর-কিছু ভাবতে পারেনি। কিন্তু তারপর—ডনকে ছেড়ে আসা: তা কি আরো ভদ্রভাবে, শান্তভাবে করা যেতো না? তারই চোখের ওপর, তারই বন্ধুদের সঙ্গে—তোমাকে যে ভালোবেসেছিলো, বিশ্বাস করেছিলো, সেই মানুষকে অমন একটা কুৎসিত আঘাত কি দিতেই হ'লো? আর সেই আবর্তের মধ্যে, তোমার শরীরটাকে লেলিয়ে দিয়ে, অন্য যে-সব পুরুষকে তুমি টেনেছিলে, তারাই বা কী পেয়েছিলো তোমার কাছে? শুধু তাচ্ছিল্য, শুধু বিদ্রূপ, শুধু ঘৃণা। যন্ত্র তারা তোমার হাতে—তোমার বিয়ে ভেঙে দেবার যন্ত্র, নিজেকে নির্যাতন করার যন্ত্র। অবশ্য তাদের কাছেও তা-ই পেয়েছিলে তুমি; তাদের খেলাতে গিয়ে তুমিই হ'য়ে উঠেছিলে এক হাসিঠাট্টার ব্যাপার, যার সঙ্গে, আরো ভালো কিছু করার না-থাকলে, দু-এক ঘণ্টা আমোদপ্রমোদে মন্দ কাটে না। তাদের মধ্যে কেউ ছিলো না যার কাছে অজানা ছিলো তোমার প্রতারণার, তোমার বিশ্বাসভঙ্গের সম্পূর্ণ না হোক আংশিক ইতিহাস।

—প্রতারণা! বিশ্বাসভঙ্গ!—টেবিলের ওপর আরতির আঙুল-গুলো বেঁকে গেলো, এক ঝলক রক্ত উঠে এলো তার মুখে—কে করেছিলো? আমি? না কি···হঠাৎ একটা নিষিদ্ধ কুঠুরির দরজা যেন খুলে গেলো, ভেঙে গেলো অনেক যত্নে তৈরি-করা ও টিকিয়ে-রাখা নদীর বাঁধ;—হাওয়ার ঝাপট, ঢেউয়ের ঝাপট, অনুচ্চারণীয় স্মৃতি ও বেদনার আঘাত যেন মুহূর্তের জন্য অবশ ক'রে দিলো আরতিকে। আমার পৃথিবী চুরমার হ'য়ে গিয়েছিলো, আমি ম'রে গিয়েছিলাম। 'আরতি, আমি চ'লে যাচ্ছি। পারো তো আমাকে ক্ষমা কোরো।' আমি ঐ টুকরো কাগজটা হাতে নিয়ে মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম, বিশ্বাস করতে পারিনি। ভাবলাম, খেয়ালি মানুষ—বোধহয় দেরাদূনে যেতে চায় না, এ-বাড়িতেও আর থাকতে চায় না, হয়তো আলাদা বাসা নিয়েছে, বা আপাতত উঠেছে কোনো বন্ধুর কাছে। বাবা অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকান, পিসিমা বলেন, 'কী হ'লো রে? মানুষটা কি হাওয়া হ'য়ে গেলো হঠাৎ?' আমি তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বলি, 'বোধহয় হঠাৎ কলকাতার বাইরে চ'লে গেছে কোথাও, অনেকদিন আটক ছিলো তো—যে কোনোদিন চ'লে আসবে।' বাবা খোঁজ নিতে চাইলেন পুলিশে হাসপাতালে—আমি বারণ করলাম, আমার মন বললো ওর কোনো শারীরিক দুর্ঘটনা হয়নি। ঐ চিঠি—ঐ হাস্যকর কথা, 'চ'লে যাচ্ছি'—হঠাৎ কোনো ঝোঁকের মাথায় লিখেছিলো—ঠিক ফিরে আসবে—কোথায় যাবে সে আমাকে ছেড়ে? এমনি ভাবছিলাম আমি, কিন্তু দুর্গাদাস কিছু জানে না, হিমেন্দু কিছু জানে না, অন্য কেউ কিছু জানে না। অনেক ঘোরাঘুরির পর দশ দিন বাদে দুর্গাদাস খবর আনলো—দিল্লি চ'লে গেছে কী-একটা চাকরি নিয়ে। কফি-হাউসের খবর—দিল্লি থেকে কে যেন কাকে চিঠি লিখেছে কলকাতায়, তাইতে জানা গেছে: কতটা বিশ্বাসযোগ্য কে জানে। আমি কাঁদছি না, ব্যস্ত হচ্ছি না, মনে-মনে বলছি—'এ-সব কিছু না, ওকে আসতেই

হবে।' কিন্তু এক মাস, দেড় মাস কেটে গেলো—কোনো খবর নেই। আমাকে দিল্লির একটা আপিশের ঠিকানা এনে দিলো দুর্গাদাস—আমি চিঠি লিখলাম, টেলিগ্রাম করলাম: উত্তর নেই। অবশেষে অবিশ্বাস্যকে সত্য ব'লে মেনে নিতে হ'লো। আর তখন—তখন আমার কান্না, আমার নির্বোধ, নির্লজ্জ চোখের জল, আমার শব্দহীন বুক-ভেঙে-দেয়া চীৎকার—'ফিরে এসো! তুমি না-এলে আমি বাঁচবো না!' আমার বাবা অনেক চেষ্টায় সব ব্যবস্থা করলেন; পাঠিয়ে দিলেন ছ-হাজার মাইল দূরে তাঁর মেয়েকে, যাকে তিনি চোখে হারান, যে তাঁর একমাত্র ভালোবাসার জন, যার জন্য, এই সেদিন, তাঁর পক্ষে অল্প-চেনা এক যক্ষ্মারোগীর সমস্ত ভার নিয়েছিলেন তিনি, আর যে-মেয়েকে শরীর বিক্রি করতে হয়েছিলো, সেই বাবাকে শেষবার চোখে দেখার জন্য। ক্ষমা? এর কি কোনো ক্ষমা আছে? কেউ যেন না ভাবে আমি ক্ষমা করেছিলাম, কেউ যেন না ভাবে আমি ভুলে গিয়েছি। তোমরা কি বোঝো না আমি এরই প্রতিশোধ নিয়েছিলাম; থেঁৎলে দিয়েছিলাম তাকে—আমার জীবনের জ'মে-ওঠা কাদার মধ্যে? আজ আমি প্রতারণায় তার সমকক্ষ, আজ আমার কোনো অভিযোগ নেই—আজ, এমনকি, ককটেল-পার্টিতে দৈবাৎ দেখা হ'য়ে গেলে ভদ্রভাবে কথাও বলি তার সঙ্গে।

কিন্তু তার পর থেকেই আরতির মনের মধ্যে আস্তে-আস্তে যেন জেগে উঠছে কলকাতা—এই ঝকঝকে ঠাণ্ডা ঘরের বানানো কলকাতা নয়—তার ধুলোর গন্ধ, ফুটপাতের ভিড়, বাস্-এর ঝাঁকুনি, তার বৃষ্টি রোদ চাঞ্চল্য কোলাহল কুশ্রীতা, সব-কিছু নিয়ে প্রাণবন্ত। লক্ষ-লক্ষ জীবন—আমারও জীবন, তা কি টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে নেই কলকাতার পথে-পথে, ফুটপাতে? হেদোর পেছনে সেই বাড়িটা—আছে এখনো? যেখান থেকে আমি কলেজের ট্রাম ধরতাম, সেখানকার ছোট্ট মনোহারি দোকানটা? কারা পড়ে এখন

প্রেসিডেন্সি কলেজে, কারা কফি-হাউসে আড্ডা দেয়? যদি হঠাৎ একদিন সেই গলির মধ্যে দোতলার ঘরটায় গিয়ে উঠি?—না, কেউ তো থাকে না সেখানে। আশ্চর্য—দুর্গাদাস একবার খোঁজ করলো না আমার?—কী মুশকিল, সে তো জানেই না আমি এসেছি। কেমন একটা ঝিমুনি নামলো আরতির মনে, তার সব জ্বালা, সব ঝাঁঝ যেন উবে গেলো, ফিরে এলো অনেক মুহূর্ত, অনেক রাস্তা, অনেক বিকেল সন্ধ্যা মেঘলা দুপুর শীতের সকাল;—যেন অনেক পথ ঘুরে-ঘুরে সে অবশেষে ক্লান্ত হ'য়ে বাড়ি ফিরেছে। কলকাতা, আমাকে চিনতে পেরেছো তাহ'লে? আমাকে ফিরিয়ে নেবে না?—না, বড্ড বেশি ভার, এই স্মৃতি—আমি আর ভাববো না, আমি ধরা দেবো না। এই কলকাতা—তার রাস্তা ভিড় সকাল বিকেল রোদ বৃষ্টি—এই সব-কিছুর ফাঁকে-ফাঁকে, জলের স্রোতের তলায় ভাঙা-ভাঙা ছায়ার মতো, ভেসে উঠছে, ভেঙে যাচ্ছে, আবার গ'ড়ে উঠছে একজন মানুষ—স্পষ্ট নয়, ঝাপসা; কোনো উপস্থিতি নয়, অনুভূতি; খুব সূক্ষ্ম, অসুখের মধ্যে কোনো শিরা যেন থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে। কিন্তু একজন নয়, দু-জন—অন্য এক আমি ছিলো একদিন—আমাকে আজ দাবি করছে সে—আর আশ্চর্য—আমি যেন নিজেরই অজান্তে তাকে মেনেও নিচ্ছি।

—কী-সব আবোলতাবোল ভাবছি! বাজে। আরতি চোখ ফেললো ঘড়িতে, আড়াইটে বাজতে দু-মিনিট মাত্র বাকি, লাঞ্চের ছুটি এখনই শেষ হবে—নিশ্চিন্ত। কাজের জন্য তৈরি হ'য়ে বসলো সে; মনে পড়লো তিনটের সময় ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে কনফারেন্স আছে, কিন্তু তাকে কেন যেতে হবে সেখানে, তা যেন হঠাৎ মনে করতে পারলো না। —সত্যি, এই 'ছিলো'র চাপ অসহ্য। আমি চ'লে যাবো এখান থেকে, এ-সব অবাস্তর বোঝা আমি চাই না, আমি স্বাধীন থাকতে চাই। শুনছি তেহেরানে এদের একটা

আপিশ খুলছে, আমি চেষ্টা করলে কি সেখানে বদলি হ'তে পারি না? চ'লে যাবো—ফিরে এসেও চ'লে যাবো আবার? আশ্চর্য—স্মৃতি কি শুধু সুখ আর সুখের কল্পনা দিয়ে তৈরি, আমাদের সব দুঃখকে তা কি শেষ পর্যন্ত গালিয়ে দেয়? না কি যাকে স্মৃতি বলি সেটাও ভুল, আসলে অতীত ব'লে কিছু নেই; প্রতি মুহূর্তই পরের মুহূর্তে অতীত; আজকের দিনটা যা হ'য়ে উঠছে তারই নাম হ'লো গতকাল—আমরা সব সময় বেঁচে থাকি শুধু বর্তমানে। কিন্তু—একটা উল্টো টানও কি আসে না এক-এক সময়—যাকে মৃত ব'লে জানি তা যেন প্রাণ ফিরে পায়, জুলুম করে আমাদের ওপর—না কি তা কখনো মরে না, ছেড়ে যায় না আমাদের, সঙ্গে থাকে, লুকিয়ে থাকে—তারপর হঠাৎ একদিন বেরিয়ে এসে আমাদের আত্মস্থতা নষ্ট ক'রে দেয়।···ঠিক, ঠিক, কলকাতায় আর নয়, আমাকে কেটে পড়তে হবে।

টাইপিস্ট একতাড়া চিঠি রেখে গেলো তার টেবিলে, প্রচার-বিভাগ থেকে একটা মোটা ফাইল পৌঁছলো। নিজেকে নিরাপদ লাগলো আরতির; মনে প'ড়ে গেলো আজ বিকেলে কনফারেন্সে আলোচ্য বিষয় কী; সেখানে কী বলবে তা একটা কাগজে নোট ক'রে নিচ্ছে, এমন সময় টেলিফোন বাজলো। 'হ্যালো।' এক মুহূর্ত নীরবতার পর ওপার থেকে আওয়াজ পৌঁছলো—'আরতি, তুমি?' আরতি বললো, 'শ্রীপতি?'

৮

দু-ঘণ্টা আগে আমি তোমাকে পাশে নিয়ে দমদমের দিকে যাচ্ছিলাম, এক ঘণ্টা আগে ফিরে আসছিলাম একই গাড়িতে একই রাস্তা দিয়ে—কিন্তু তুমি পাশে ছিলে না—আর এখন এই ঘর, আমার তথাকথিত বাড়ি, পাশের ঘরে মাতা-পুত্র ঘুমন্ত, সারা পাড়া নিঝুম, টেবল-ল্যাম্পের আলো আমার সামনে, আর সারা ঘরে ছায়া, শুধু আলো পড়েছে এই শাদা কাগজটার ওপর, আমার চোখের সামনে তুমি নেই, রাত্রিও নেই—আছে শুধু টেবিলের কাঠ, দেয়ালের শাদা, কাগজের শাদা, কিন্তু তবু তুমি আছো আমার সঙ্গে, কুয়াশায় আর জ্যোছনায় মাখা এই মস্ত বড়ো ঠাণ্ডা উষ্ণ রাত্রির মধ্যে এখনো আছি তুমি আর আমি। কী আশ্চর্য এই রাত্রি, আরতি, কী আশ্চর্য আজকের এই রাত্রি — বলছি 'আজকের', কিন্তু এখনই হয়তো 'আজ' আর নেই, তবু রাত্রি আছে এখনো — বাইরে, আমার ঘরের বাইরে, তোমার এরোপ্লেনের জানলার বাইরে আকাশে, আকাশ জুড়ে, জগৎ জুড়ে—বিশাল। মনে আছে কেমন বেরিয়ে এলো আস্তে-আস্তে, শহর ছাড়িয়ে যেই আমরা হাইওয়েতে পৌঁছলাম? নতুন-ওঠা বড়ো-বড়ো ফ্ল্যাটবাড়িগুলো ঝাপসা; মাঠ, বন, গাছপালা, লবণ-হ্রদের খাল-কাটা জল, পথের ধারে-ধারে বিজ্ঞাপনের প্ল্যাকার্ডগুলো — সব ঝাপসা; জ্যোছনা-মাখা কুয়াশায় যেন তলিয়ে গেছে সব — শুধু ভেসে আছে একটি চলন্ত গাড়ি, আর সেই গাড়ির মধ্যে দুটি জ্যান্ত প্রাণ, দুটি অনুভূতির পিণ্ড—যেন ঐ দুটি মানুষকে লুকিয়ে রাখার জন্যই এই রাত্রি এত বড়ো, এত ঠাণ্ডা, এত উষ্ণ, এত নিবিড়। শীতের ঠাণ্ডা, কলকাতার জানুয়ারি-হিম, কিন্তু এ যদি হ'তো সাইবেরিয়া,

হ'তো উত্তর মেরু, হ'তো শূন্যের নিচে চুয়ান্ন ডিগ্রি, তবু আমরা থাকতাম উষ্ণ হ'য়ে, পরস্পরের রক্তের তাপে, হৃদয়ের তাপে — তুমি আর আমি, আরতি।...না, আমি কেটে দেবো না ঐ কথাটাকে, থাক ঐ অসম্ভব অতিকথন — আজ পারবো না আমি সম্ভবপরতার মাপজোকের মধ্যে আটকে থাকতে, যখন প্রতিটি মিনিট খেয়ে নিচ্ছে রাস্তাটাকে, আর চাঁদ স'রে-স'রে যাচ্ছে ডাইনে থেকে বাঁয়ে থেকে সামনে — ঠাণ্ডা হলুদ চ্যাপ্টা চাঁদ — আর কুয়াশা কখনো হালকা-নীল জমাট, আর কখনো গাড়ির হেডলাইটের আলোয় গুঁড়ো-গুঁড়ো ধোঁয়া-রঙের — আর কখনো কোনো প্লেনের শব্দে, বা এয়ারপোর্টের উঁচু মিনারে লাল আর সবুজ আলোর বিন্দু দেখতে পেয়ে, যখন আমাদের মনে প'ড়ে যাচ্ছে যে সময় নেই, আর সময় নেই।

'এসো তাহ'লে — আর-একবার — শেষবারের মতো —' আমি ব'লে উঠেছিলাম, 'না, না, শেষবার নয় — "শেষ" বোলো না!' তোমার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটলো আমার কথায়। 'এখনো তো আছি আমরা একসঙ্গে — আরো চার ঘণ্টা, দু-শো চল্লিশ মিনিট — অনেক সময়, অনেক সময় —' এই ব'লে তুমি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে, আমরা অন্ধকারে ডুবে গেলাম। স্পর্শে আর স্বাদে ভরা অন্ধকার, চুম্বনে আর চোখের জলে গ'লে যাচ্ছি আমরা, টের পাচ্ছি নোনতা স্বাদ আমাদের জিহ্বায়, জীবনের নোনতা স্বাদ শরীরে — কখনো আমরা আঁকড়ে আছি পরস্পরকে যেন বন্যার মুখে ভেসে-যাওয়া দুটো প্রাণী ; কখনো আমি স'রে এসে দেখছি তোমাকে, তোমার শরীর যেন অন্ধকারে এক ঝলক জল ; কখনো শুনি নিশ্বাস যেন জলের ওপর দিয়ে বাতাস ব'য়ে যায় ; কখনো চোখে চোখ রেখে অন্ধকারে তারা ফোটাই আমরা ; আর কখনো দুটি দেবশিশুর মতো শান্ত শুয়ে থাকি পাশাপাশি, না-ছুঁয়ে, কিন্তু পরস্পরের অস্তিত্বে ভরপুর ; আবার কয়েক মুহূর্ত পরেই ঢেউয়ের মধ্যে ঢেউয়ের মতো মিশে যাই — এমনি বার-বার, বার-বার — তারপর তুমি নিশ্বাসের স্বরে

উচ্চারণ করলে, 'সময় হ'লো বোধহয়।'—সময়, সময়! আছে, নেই, আসে, চ'লে যায়—দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, বোঝা যায় না, কিন্তু তা-ই সব। আমরা মেনে নিয়েছি সময়কে, আমরা তৈরি; বোর্ডিংহাউসে তোমার ঘরটিও তৈরি কাল থেকে অন্য বাসিন্দা নেবার জন্য; আমার হাতে তোমার স্যুটকেস, হাতের ভাঁজে তোমার ওভারকোট, তুমি হাতব্যাগে ছুটো বই ভ'রে নিলে। দরজায় আমাদের বিদায় দিলো সেই ঘণ্টাগুলি, যা একসঙ্গে এই ঘরে আমরা কাটিয়েছিলাম; সিঁড়িতে আমাদের বিদায় দিলো আমাদের পায়ের শব্দ, যা এখানে আর শোনা যাবে না কোনোদিন; আর রাস্তায় আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে রইলো নিশুতি-রাত, শান্ত শহর, আর ছু-মাস ধ'রে যত স্মৃতি আমরা ছিটিয়েছিলাম এই কলকাতার পথে-পথে। এয়ারপোর্টের ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতেই শুনলাম তোমার প্লেনের যাত্রীদের কাস্টম্‌স্‌-এ ডাকা হচ্ছে—হঠাৎ একেবারে অন্য এক জগৎ, কড়কড়ে আলো, অনেক লোক, ব্যস্ততা—আমি চ'লে এলাম তোমার সঙ্গে শেষ রেলিং পর্যন্ত, দিগন্ত-ছোঁয়া বিমানপ্রান্তরের সামনে। আবার এক অন্য জগৎ—বিদায়ে ভরা, শূন্যতায় ভরা, বিষণ্ণ। দূরে তোমার আলো-জ্বলা প্লেন, প্রকাণ্ড মাঠ চাঁদের আলোয় ফ্যাকাশে, আকাশ কুয়াশায় ম্লান, ঠিক মাথার ওপর ঠাণ্ডা শাদা একলা চাঁদ—চেয়ে-চেয়ে এই সব দেখছি আমরা, কিন্তু কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছি না, ছু-জনেই নির্বাক। যখন প্লেনে নিয়ে যাবার জন্য বাস্‌ এসে দাঁড়ালো তখনও তুমি নড়লে না, অন্য যাত্রীরা উঠে যাবার পর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালে, আমার কাঁধে হাত রেখে, খুব হালকা ক'রে গালে একবার গাল ছুঁইয়ে বললে, 'ভালো থেকো—চলি।' আমার হাতে তখনও ঝুলছিলো তোমার ওভারকোট, একবার সেই নরম পশমে গভীর নিশ্বাস নিয়ে তোমার হাতে দিলাম। আর সঙ্গে-সঙ্গে যেন ভোজবাজির মতো হারিয়ে গেলে তুমি, আমার চোখের খিদে ছুটলো তোমার পেছনে, আমি দেখলাম কয়েকটি ছায়ামূর্তি প্লেনের

সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, কিন্তু এত দূর, এত ঝাপসা, তোমাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। আর তখন আমার চোখের লক্ষ্য হ'লো মস্ত বড়ো এরোপ্লেনটা, এখনো মাটির ওপর দিয়ে চলছে, খুব আস্তে, যেন চ'লে যাবার ইচ্ছে নেই, তারপর কয়েকবার এঁকে-বেঁকে মোড় ফিরে একেবারে যেন দিগন্ত ঘেঁষে—থেমে গেলো, না আমার চোখের সীমা ছাড়িয়ে গেলো ঠিক বুঝলাম না। তবু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম একইভাবে, সেই অনির্ণেয় দূরের দিকে তাকিয়ে—তারপর হঠাৎ শুনলাম বিরাট এক শব্দ আকাশে, চাঁদের তলায় মুহূর্তের জন্য ঝলক দিয়ে মিলিয়ে গেলো তোমার প্লেন—গর্জনে আমার বুকের দেয়াল ফাটিয়ে দিয়ে।

'বুকের দেয়াল ফাটিয়ে দিয়ে!'—কথার কথা, উপমামাত্র, শব্দালংকার—কিন্তু ও ছাড়া আর ভাষাও নেই। আমার এই মুহূর্তের মনের অবস্থা—তা বলার ভাষা আমি জানি না, তবু আমাকে বলতেই হবে, আরতি, আমার পক্ষে চুপ ক'রে থাকা অসম্ভব।—তুমি চ'লে গেছো, তুমি চ'লে গেছো। কিন্তু কই, আমি তো স্থির আছি, ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাইনি, গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছি মসৃণভাবে—কুয়াশা-মাখা রাত্রির মধ্য দিয়ে। কষ্ট, এই কষ্ট পাবার আনন্দ; অভাব, এই অভাববোধের তীব্রতা; —এ-ই তো আমি চেয়েছিলাম, আরতি—বেদনা, আঘাত, জাগরণ—কখনো আবার পাবো তা ভাবিনি। মনে হচ্ছে আমি আগে কখনো এত বেশি জীবিত ছিলাম না, এমন তীক্ষ্ণ অনুভূতি নিয়ে কখনো বাঁচিনি এই পৃথিবীতে। আমি যেন এই রাত্রির খুব ঘনিষ্ঠ কেউ, আকাশ যেন নুয়ে আছে তোমার আর আমার মধ্যে সাঁকোর মতো—গাড়ির কাচ নামিয়ে ফুশফুশ ভ'রে নিশ্বাস নিচ্ছি, আবছা একটা গন্ধ পাচ্ছি বাতাসে—তা কি কুয়াশার, না শিশিরে ভেজা ঘাসের, না কি তোমার চুলের গন্ধ, আরতি, না কি তোমার ওভারকোটের পশমি নরম তোমাতে মাখা গন্ধ? আর এখন দ্যাখো—এই ঘরে ব'সে আছি আমি, রাত্রি প'ড়ে আছে বাইরে,

আমার চোখের সামনে আলো-জ্বলা একটি কাগজ শুধু—তবু আমি দেখছি তোমাকে, শুনছি তোমাকে, ছুঁয়ে আছি তোমাকে—তোমার গালের সব কোমলতা, বুকের সব উষ্ণতা, আর তোমার চোখের হাসি, ঠোঁটের খুলে যাওয়া, দাঁতের ঝলক—এখনো, এখনো আমাকে ঘিরে আছে। আমার প্রতিটি স্নায়ু টান হ'য়ে আছে, আরতি, আমার আঙুলের ডগাগুলো জ্বলছে, আমার নিশ্বাস অনবরত বলছে তোমার নাম, আমি কিছু ভাবতে পারছি না যা তুমি নও। আমার ফিরে-পাওয়া যৌবন, আমার আনন্দ, আমার নতুন জীবন : তুমি।

নতুন জীবন—কেমন ক'রে তা আরম্ভ হ'লো, কবে থেকে? একটু দাঁড়াও, ভেবে দেখি, আমাকে মনে করার জন্য কয়েক মুহূর্ত সময় দাও। সেই সব দিন, যখন পর্যন্ত দেখা হয়নি তোমার সঙ্গে, তোমাকে আবার দেখবো ব'লেও ভাবিনি—তা যেন বড্ড দূর ব'লে মনে হচ্ছে আমার—দূর, আর কিছুটা অবাস্তব। আর দেখা হবার পরেও প্রথম কয়েকদিন—মনে আছে?—আমরা আড়াল ভেঙে বেরোতে পারিনি, কথা বলেছি নেহাৎই দু-জন 'ভদ্রলোক' আর 'ভদ্রমহিলা'র মতো। সেই যেদিন প্রথম তোমাকে টেলিফোন করলাম তোমার ফেমাস ফ্যাব্রিক্স-এর আপিশে—আমি কেঁপে উঠেছিলাম তোমার গলায় আমার নাম শুনে, শোনামাত্র আমার গলার আওয়াজ চিনতে পারবে আশা করিনি। কিন্তু পর মুহূর্তেই কেজো শোনালো তোমার গলা; আমি যখন জিগেস করলাম আপিশের পরে আমার সঙ্গে চা খাবার সময় তোমার হবে কিনা, তখন আমার উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে অত্যন্ত বেশি সামাজিক সুরে রাজি হ'লে, 'থ্যাঙ্কিউ'টাও আওড়াতে ভুললে না। আর ট্রিঙ্কাতে ব'সে চা খেতে-খেতেও আমার মনে হ'লো যেন সেই ককটেল-পার্টির সদ্যপরিচিতার সঙ্গেই কথা বলছি। কত ভান আমরা ক'রে থাকি, আরতি, কত ছেলে-মানুষি কপটতা—আর কত সময় নষ্ট করি এমনি ক'রে। মাঝে দু-দিন দেখা হ'লো না তোমার সঙ্গে, আমি কয়েকবার টেলিফোন

তুলেও নামিয়ে রাখলাম, তারপর এক রোববার দুপুরে দুর্গাদাসের বাড়িতে ভোজ — তোমারই জন্য, তোমারই উপলক্ষে। সুখাদ্য ছিলো প্রচুর, পানীয়েরও অভাব ছিলো না (আমি ছ-বোতল বিয়ার নিয়ে গিয়েছিলাম, বন্দনাও সদয় হ'য়ে একটু চেখেছিলো সেদিন), খুব আগ্রহ ছিলো বন্দনা আর দুর্গাদাসের দিক থেকে; কিন্তু পুনর্মিলনের ঠিক সুরটি যেন লাগলো না তবু — কোথায় যেন বাধা, অস্বস্তি। মার্কিনী শিক্ষাপদ্ধতি (যেহেতু হিমেন্দু আর তুমি দু-জনেই সে-দেশের ডিগ্রি নিয়েছো); রবীন্দ্র-সংগীত (যেহেতু সেটা বন্দনার 'লাইন'); কলকাতার পৌর সমস্যা (যেহেতু দুর্গাদাস তা নিয়ে একটা সীরিজ় লিখছে 'সুপ্রভাত'-এ); আর অবশ্য দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক হালচাল (যেহেতু আমি একজন সাংবাদিক) — ঘুরে-ফিরে এই সব কথা ভেসে উঠছে আর ডুবে যাচ্ছে, আর দুর্গাদাস মাঝে-মাঝে মাথা ঝেঁকে ব'লে উঠছে, 'এ-সব থাক — তোমার খবর বলো, আরতি!' — কিন্তু ঠিক কোন খবর সে জানতে চায় তা স্পষ্ট হচ্ছে না একবারও। আমি টের পাচ্ছিলাম মুশকিলটা কোথায়; ওরা ভুলতে পারছে না গৌতম যা সোল্লাসে শুনিয়ে গিয়েছিলো (যার বিন্দুবিসর্গ তুমি জানো না তখন), তোমার মুখে শুনতে চায় তা কতদূর সত্য, শুনতে চায় তার সব কথা মিথ্যে। আর তাছাড়া, আমি উপস্থিত — আমার সামনে খোলাখুলি কথা বলতেও ওদের সংকোচ, মাঝে-মাঝে ওদের আড়চোখের তাকানো আমি ধ'রে ফেলছি। তবু, ওরা সামলাতে পারছিলো না নিজেদের, হঠাৎ দুর্গাদাস এক ফাঁকে জিগেস ক'রে ফেললো, 'আরতি, তুমি আমেরিকায় ফ্র্যাঙ্ক মর্গ্যান নামে কাউকে চিনতে?' 'ফ্র্যাঙ্ক মর্গ্যান? ... ও, হ্যাঁ, চিনতাম একজনকে —' এটুকু ব'লেই চুপ করলে তুমি, ঐ নামটা দুর্গাদাস কী ক'রে শুনলো তাও জানতে চাইলে না। আর তারপর বন্দনা তার পক্ষে যতটা সম্ভব তির্যকভাবে বললো, 'আরতি, তুই এতকাল বিদেশে কাটালি, কেউ তোকে বিয়ে করতে চায়নি

সেখানে?' 'চেয়েছিলো—করেওছিলাম—টিকলো না।'—এমন শান্ত গলায় তক্ষুনি জবাব দিলে তুমি, এমন নির্লিপ্তভাবে, যে বন্দনার মতো ছলছলে মানুষের মুখেও আর কথা জোগালো না, আর সেই ফাঁকে বুদ্ধিমান হিমেন্দু তোমাকে জিগেস করলে (যেন আগের কথাটা সে শুনতেই পায়নি, এমনিভাবে) তুমি কখনো ভেনিসে গিয়েছিলে কিনা। মোট কথা, সেদিন দুর্গাদাসের বাড়িতে তুমি ছিলে আত্মস্থ—একটু বেশি আত্মস্থ হয়তো; বেশ গুছিয়ে কথা বলছিলে যখন যে-প্রসঙ্গ উঠছে তা-ই নিয়ে—একটু বেশি গুছিয়ে হয়তো; তোমার ব্যক্তিগত জীবন ঘেঁষে কোনো কথা উঠলে আলগোছে তা অন্য খাদে বেঁকিয়ে দিচ্ছিলে;—তোমার ভাবটা ছিলো এইরকম যেন সাধারণ অর্থে এখানকার সকলেরই বন্ধু তুমি, সব বিষয়েই মোটামুটি 'ইন্টারেস্টেড', কিন্তু কারো জন্য বা কোনো-কিছুর জন্য তোমার তেমন কোনো আগ্রহ নেই—তুমি একজন 'বাইরের লোক'। সেদিন নিরাশ হয়েছিলো দুর্গাদাস আর বন্দনা—এতদূর পর্যন্ত, যে তুমি যখন খাওয়ার পরে ভদ্রতামাফিক মিনিট কুড়ি ব্যবধান দিয়ে উঠতে চাইলে, তখন ওরা তোমাকে আর-একটু বসার জন্য পিড়াপিড়ি করলো না, 'আবার আসিস' কথাটা আবছা শোনালো বন্দনার গলায়, আর দুর্গাদাস আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমার গাড়িতে আরতিকে পৌঁছিয়ে দিতে পারবে?'

বাইরে ছিলো প্রথম শীতের ঝকঝকে দিন—রোদ্দুরে তাত, কিন্তু উত্তুরে হাওয়ায় শীতের কামড়। তুমি গাড়িতে উঠে একটা কালো চশমা প'রে নিয়েছিলে—মস্ত গোল ঠুলির মতো তার কাচ দুটো—আমি ডোভার লেন থেকে বেরোতে-বেরোতে বললাম, 'এই ফ্যাশানটা ভারি অদ্ভুত কিন্তু—চোখ ঢেকে রাখা। চোখ বাদ দিলে মুখের আর রইলো কী?' তুমি জবাব দিলে, 'সব ফ্যাশানই অদ্ভুত।' স্টোর রোডে প'ড়ে আমি বললাম, 'তোমার বোধহয় বেশি ভালো লাগলো না ওখানে?' 'ভালো কেন লাগবে না?'—যেন আরো

কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলে তুমি, একটু পরে হঠাৎ বললে, ‘অমলার খবর কিছু জানো নাকি?’ ‘অমলা? কোন অমলা?’ ‘যার সঙ্গে দুর্গাদাসের বিয়ে ঠিক ছিলো?’ ‘তাকে মনে আছে তোমার?’ ‘ছিলো না—কিন্তু মনে প’ড়ে গেলো। ও কেমন আছে জানো নাকি?’ ‘বোধহয় ভালোই। কোন স্কুলের হেডমিস্ট্রেস যেন—’ ‘বিয়ে করেনি?’ ‘কোথায় আর! ওর মা থাকলে হয়তো—কিন্তু অমলা নিজে তো তেমন—’ ‘না, অমলাকে আর যা-ই হোক “স্মার্ট” বলা যায় না।—ওর মা-ও মারা গেছেন তাহ’লে!’ আর-কিছু বললে না তুমি, শেষ পথটুকু চুপচাপ কাটলো। গাড়ি থামলো তোমার বোর্ডিংহাউসের সামনে, তুমি তোমার কালো চশমাটা খুলে নিলে, গাড়ি থেকে নামার আগে আমার দিকে ঈষৎ মুখ ফিরিয়ে বললে, ‘মুহূর্তের জন্য আসবে নাকি ওপরে?’... সেখানেই, সেখানেই আরম্ভ।

তেতলার ঘর; জানলা ঘেঁষে সোফায় আমরা ব’সে আছি; বাইরে রোদালো নীল আকাশ, খোলা জানলায় হাওয়ার শিরশিরানি। তুমি আবার অমলার কথা তুললে। ‘কেউ-কেউ যেন হেরে যাবার জন্যই জন্মায়—তা-ই না? কেউ মনে রাখে না—কেউ গণ্য করে না তাদের। আমরাও করিনি, আমরাও আমাদের নিজেদেরই কাজে দুর্গাদাসকে খাটিয়ে নিতাম, ভাবতাম না তার ওপর অমলারই দাবি সবচেয়ে বড়ো। আজ দুর্গাদাসের ওখানে ব’সে-ব’সে আমার মনে পড়ছিলো তাকে—বোকা, লাজুক, ভালোমানুষ, অসুখী অমলা। ওর জীবনটা যে এ-রকম হ’য়ে গেলো, তাতে কি আমাদেরও কিছুটা হাত ছিলো না?’ আমি চমকে উঠলাম তোমার কথা শুনে, তোমার মুখের ‘আমরা’ কথাটা আমাকে ভাবিয়ে তুললো—তাহ’লে তুমি কি [illegible] জমিতে পা ফেলছো, আরতি, ভুলে কি যাচ্ছো তা কত বিপজ্জনক? সাবধানে, হালকা সুরে আমি জবাব দিলাম, ‘অসুখী কে বা নয়—কেউ তা লুকিয়ে রাখতে পারে, কেউ পারে না, আর

অনেকে তা বোঝেই না—এইটুকু যা তফাৎ। তাছাড়া, যে যেমন মানুষ তেমনি ঘটে তার জীবনে—অন্য কেউ দায়ী নয় সেজন্য।'

'হয়তো তা-ই, হয়তো তা-ই। তবু তো আমরা জড়িয়েও যাই অন্যের জীবনের মধ্যে—মাঝে-মাঝে—ভালো নয় এই খেলা, তবু খেলতেই হয় আমাদের।' আমার বুকের মধ্যে টান পড়লো এবার, প্রায় ভয় হ'লো পাছে তুমি আরো এগিয়ে যাও, সীমা ছাড়িয়ে যাও—আমি তোমার মুখ থেকে মনের ভাব বুঝে নিতে চাইলাম, কিন্তু তুমি বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলে। তারপর আমি যখন মনে-মনে ভাবছি এবার বেশ ভদ্রভাবে উঠে পড়লে হয়, তখন বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে এনে নিচু গলায় বললে, 'জানো, একটু আগে কী মনে হচ্ছিলো আমার? যেন আজকের এই দিনটা অন্য কোনো দিন। যেন আগে একবার এই দিন—ঠিক এই মুহূর্তটি আমি কাটিয়েছিলাম। ঠিক এই রকম আকাশ—এই রকম রোদ—এমনি একটি বিকেল। ভাবছিলাম তা কবে—তা কোথায়।'

আর সেই মুহূর্তে ভেঙে গেলো আড়াল, পর্দা উঠলো অন্য এক মঞ্চে, অন্য এক দৃশ্যে, তুমি তোমার প্রচ্ছদ থেকে বেরিয়ে এলে, আমি তোমার চেহারা পর্যন্ত অন্য রকম দেখলাম। আবার সেই তেতলার ঘর তোমাদের, হাজরা রোডের গলিতে আমার ঘর, আর তার আগে, আরো আগে—যা-কিছু ছিলো, যা-কিছু আমরা হারিয়েছিলাম—কিন্তু না—হারাইনি, এই তো ফিরে পাচ্ছি সব, ফিরে পেয়েছি, খুঁজে পেয়েছি পরস্পরকে। কেমন ক'রে তা হ'তে পেরেছিলো—এই যে ধরা দিলো আমাদের মুঠোর মধ্যে এক অসম্ভব, অতি সহজে, আমাদের সুবিধের জন্য খুব ছোটো হ'য়ে যেন; বার-বার নিজেকে জিগেস করি: আমি কি যোগ্য ছিলাম? আমি কি এর যোগ্য ছিলাম? না, আরতি—প্রতিবাদ কোরো না, আমাকে বলতে দাও এ তোমারই সৃষ্টি, তুমিই একে ডাক দিয়েছিলে, জাগিয়ে তুলেছিলে, ফুটিয়ে তুলেছিলে—আমি প'ড়ে ছিলাম রাস্তায়

একটা মরচে-পড়া তামার পয়সা—তুমি তা নিচু হ'য়ে কুড়িয়ে নিলে, আরতি, নিচু হ'তে দ্বিধা করলে না, ধুলো দেখে পেছিয়ে গেলে না; আর তোমার হাতে আমি হ'য়ে উঠলাম—অন্য কিছু, অন্য একজন। আমি ভুলতে পারি না সেই মুহূর্ত, যখন এক আশ্চর্য সোনালি পাখির মতো তুমি ছিনিয়ে নিলে আমাকে—অনেক দূরে এক অন্য জগতে, দিলে চুরমার ক'রে আমার সব লজ্জা আর ভয়, তোমার সুন্দর ক্ষমার আবরণের তলায় আমাকে দিলে নিরাপত্তা, নিজে প্রথমে ভালোবেসে আমাকে ভালোবাসতে শেখালে। আমাকে মানতেই হবে ভালোবাসার শক্তিতে আমার চাইতে অনেক বড়ো তুমি।

অনেক কথা আমরা বলেছিলাম দিনের পর দিন—যত কষ্ট তুমি পেয়েছিলে, যত অত্যাচার তুমি করেছিলে নিজের ওপর—আর আমার সব প্রতারণা—নিজের সঙ্গে, অন্যদের সঙ্গে—মাঝখানকার দশ বছরের প্রতিটি পাতা যেন প'ড়ে নিয়েছিলাম দু-জনে, যেন কোনো তুচ্ছ কথা অজানা থাকলেও এই সময়ের খাদ পুরোপুরি পেরোনো যাবে না। কিন্তু, হাজার হোক, কতটুকুই বা সময় পেয়েছিলাম কথা বলার? আর বেশি বলার প্রয়োজনই বা কী ছিলো—যখন চোখে এত ভাষা, স্পর্শে এত ভাষা, আর রাত্রির হৃদয় এত উদার? আমি ব'সে-ব'সে মনে করার চেষ্টা করছি কী-কথা হয়েছিলো তোমার আর আমার মধ্যে, মনে হচ্ছে যেন যথেষ্ট বলা হয়নি। সেই যে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম তোমাকে ছেড়ে—কেন, তা কি বলেছিলাম? নিঃসাড় ছিলাম তোমার চিঠিতে, টেলিগ্রামে; নিজেকে লোপাট ক'রে দিয়েছিলাম—কেন, তা কি বলেছিলাম তোমাকে? ভয়, আরতি, স্রেফ কাপুরুষ ভয়! অসুখের ক-মাস শুয়ে-শুয়ে যেমন মৃত্যুর ভয়ে কেঁপেছিলাম, তেমনি তখন জীবনের ভয় আমাকে পেয়ে বসেছিলো। জীবনের ভয়, সুখী হবার ভয়, আমি তখন যাকে বলতাম আমার স্বাধীনতা, তা

হারাবার ভয়। অর্থাৎ, দম্ভ—আমি অসাধারণ, আমি অন্যদের মতো নই! তারই প্রতিফল—আমার বিয়ের ফাঁস, আমার চাকরির বেড়াজাল। পাকেচক্রে এমন হ'লো যে যখন এক দূর, ঠাণ্ডা দেশে তোমাকে গরম রাখছে শুধু যন্ত্রণা, আমি তখন 'সুপ্রভাত'-এ ধাপে-ধাপে উন্নতি করছি। এমন হ'লো যে তুমি যখন সাঁৎরে-সাঁৎরে কূল পাচ্ছো না কোথাও, আমি তখন হ'য়ে উঠছি কলকাতার এক বিশিষ্ট নাগরিক, আর তার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি সব সময়, মদে ভুলিয়ে রাখতে চাচ্ছি নিজেকে।—ছেলেমানুষি, বোকামি! তবু বলি: এরও প্রয়োজন ছিলো, যদি এই সব পেরিয়ে আমরা না-আসতাম, তাহ'লে কি জন্ম নিতে পারতো আমাদের মধ্যে এই অদ্ভুত ভালোবাসা—যৌবনের উচ্ছ্বাস নয়, সামাজিক চুক্তি নয়, প্রকৃতির নির্দেশ নয়—উদ্দেশ্যহীন, স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ—যেমন কেউ-কেউ হঠাৎ কখনো অবিশ্বাস্যভাবে ভগবানের দেখা পায়, তেমনি? এর পরে কী ক'রে আমি আর ঘৃণা করতে পারি নিজেকে—এর পরেও, তুমি আমার জন্য যা করলে, তার পরেও? কী ক'রে তাকে আর খারাপ ব'লে ভাবি, তুমি যাকে ভালোবেসেছো? আমার সব মনস্তাপ ধুয়ে দিলে তুমি; আমি এখন পারবো নিজেকে সহ্য করতে, পারবো সাহসী হ'য়ে বেঁচে থাকতে—সব সীমা, সব অভাব মেনে নিয়ে।

একটা কথা কখনো আমরা বলিনি—চোখে-চোখে ভেসে উঠলেও চেপে দিয়েছি—তা হ'লো: এর পর কী? এর পর আমাদের কী হবে? কিন্তু দু-জনেই মনে-মনে জেনেছি এটা স্থায়ী নয়, হ'তে পারে না; কোনো-না-কোনোদিন এর অবসান নিশ্চিত, তার বেশি দেরিও নেই। এ বড়ো বেশি আশ্চর্য, বড়ো বেশি তীব্র—মানুষের ভাগ্যে তা জুটতে পারে শুধু ক্ষণিকের জন্য, শুধু ক্ষণিকের জন্য মানুষ এটা সহ্য করতে পারে। আ—ভালোবাসা! তার ছোঁওয়ায় সবই পবিত্র হ'য়ে ওঠে, কিন্তু আর কী আছে তার মতো বেআইনি, বিদ্রোহী,

বিশৃঙ্খল, সময়ের চোর, জগতের ডাকাত, আর কী আছে যা এমনভাবে ছাড়িয়ে নেয় মানুষকে শুধু একজন ছাড়া অন্য সকলের কাছ থেকে? স্বার্থপর নয় কি, শুধু দু-জন মানুষের মধ্যে গ'ড়ে-ওঠা এই সম্পূর্ণ সুখ, এই গোপন স্বর্গ—যখন জগৎ ভ'রে এত যুদ্ধ, এত দুঃখ, এত কান্না, এত হাহাকার? এ কি অন্যায় নয় যে আমরা লুকিয়ে আছি রাত্রির কন্দরে, মাতৃগর্ভে দুই যমজ শিশুর মতো নিরাপদ, যখন সূর্যের আলোয় সংগ্রাম চলছে অবিরাম—মানুষের সঙ্গে মানুষের? যেন জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছি দুই কয়েদি, কিন্তু কোটি-কোটি মানুষ যখন বন্দী, তখন আমরাও কি ধরা পড়বো না একদিন? আমি তাই অবাক হইনি তুমি যেদিন বললে তোমার আপিশ তোমাকে বদলি করেছে তেহেরানে, সামনের মাসে যেতে হবে। শুধু জিগেস করেছিলাম, 'তুমি কি বদলি চেয়েছিলে?' 'চেয়েছিলাম।' 'আমার সঙ্গে দেখা হবার পর?' 'হ্যাঁ, তা-ই।' তারপর আমার হাত ধ'রে বলেছিলে—'এ-ই ভালো, শ্রীপতি, এই রকমই ভালো, এই রকমই সবচেয়ে ভালো।' আমি মানি তোমার কথা, আরতি, এই রকমই ভালো: আঘাত, বেদনা, জাগরণ—বছরের পর বছর ধ'রে আমি যা চেয়েছিলাম—এই বিচ্ছেদে তা সম্পূর্ণ হ'লো। কোথাও কোনো ভাঙচুর হ'লো না, কোনো বিজ্ঞাপনে মলিন হ'লো না এই ভালোবাসা; তুমি শান্তভাবে মিলিয়ে গেলে আমার দিগন্ত থেকে, আর আমি রইলাম লোকের চোখে ঠিক তেমনি, যেমন ছিলাম এতকাল। হ্যাঁ, লোকের চোখে তা-ই, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে সব বদলে গেছে, অন্য কেউ তা জানে না। কী করি আমি এখন—আমার সদ্য-পাওয়া, সদ্য-হারানো তোমাকে নিয়ে আমি কী করি, কেমন ক'রে সহ্য করি, ব্যবহার করি সেই উষ্ণতা, যা আমার সারা শরীরে দপদপ করছে এই মুহূর্তে?

ব্যবহার! কী বিশ্রী কথা—বেনেদের মতো, সুদখোরের মতো! হেসো না, আরতি, আমার একটা গোপন কথা বলি তোমাকে।

তোমার সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা হ'লো, তখন থেকে আমি ভাবছি— ভাবছিলাম—একটা লেখা ভাবছিলাম মনে-মনে। 'হঠাৎ অনেকদিন পর জয়ন্তীর সঙ্গে সুব্রতর দেখা হ'য়ে গেলো—' এই ধরনের আরম্ভ। কিন্তু হয়তো ও-রকম নয়, হয়তো আরো বেঁকিয়ে না-বললে বলা যাবে না। হয়তো আরম্ভ হবে ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ার শব্দে, কেউ একজন ভোরবেলা শুনছে শুয়ে-শুয়ে, ঘুম ভেঙে গেছে, কিন্তু জেগেও ওঠেনি, শুনছে আর ভাবছে, শুনছে আর মনে করার চেষ্টা করছে। লোকটা হয়তো লেখক—যে এখন আর লিখতে পারছে না, তবু চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে—লিখে-লিখে শুধু কেটে দিচ্ছে আর ছিঁড়ে ফেলছে, তারই স্বগতোক্তি থেকে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে আসবে তথাকথিত জয়ন্তী আর সুব্রতর গল্পটা—সেটাই হবে সেই গল্প, লেখকটি যা শেষ পর্যন্ত লিখে উঠলো, কিন্তু কোনটা লেখকের জবানবন্দি আর কোনটা তার বানানো গল্প সেই তফাৎটুকু স্পষ্ট হবে না—এমনি নানাভাবে ভাবছিলাম আমি, তোমাকে যখন প্রথম টেলিফোন করলাম, তার ঠিক আগের মুহূর্তেও, হয়তো ঐ উপায়ে নিজের অতীত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলাম। জানতাম না তখন, ভাবতে পারিনি—আমার অতীত হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর, দেবে গুঁড়িয়ে আমার সেই না-লেখা গল্পটাকে, লুটিয়ে দেবে ধুলোয় আমার তখন পর্যন্ত ভুলতে-না-পারা উচ্চাশা। হ্যাঁ— উচ্চাশা ছিলো আমার, আমি চেয়েছিলাম লেখক হ'তে, কিছু লিখেও-ছিলাম এককালে—বলতে গেলে তোমারই জন্য—কিন্তু তুমি তা পড়োনি—ভাগ্যে পড়োনি। তুমি যা দিয়েছিলে আমাকে, সেই জীবন—প্রাণহীন, ঈশ্বরহীন শূন্যের মধ্যে হঠাৎ এক হৃৎপিণ্ডের মতো জীবন—আমি এমন কী লিখতে পারি যা তার তুলনায় তুচ্ছ নয়, নয় এক ম্লান বিকল্প, পাংশু প্রতিনিধিমাত্র? না, আরতি, আমি আর লেখক হ'তে চাই না, হ'তে পারিনি ব'লে আমার আর আক্ষেপ নেই; তুমি আমাকে যেমন রেখে গেলে তেমনিভাবে বাঁচতে চাই আমি।

তেমনিভাবে—তা কী ক'রে হয়? এই যে আমার রক্তকণায় এখন ব'য়ে যাচ্ছো তুমি, আঁট হ'য়ে আছো বুকের মধ্যে যেন তোমার পক্ষে যথেষ্ট জায়গা নেই—এর রেশ আর কতদিন, কতদিন? কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস, হয়তো এক বছর: কিন্তু তারপর? তারপরেও তো বাঁচতে হবে বহুকাল—যৌবন একেবারে ফুরিয়ে যাবার পরেও, কে জানে হয়তো মরন্ত, হিম বার্ধক্য পর্যন্ত। জানি, এই চিঠির তুমি উত্তর দেবে, আমি আবার লিখবো, কিছুদিন চলবে চিঠিপত্র, তারপর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আবার স্বাভাবিক হবে, ফুরিয়ে যাবে বলার কথা; আমরা কিছুদিন পর্যন্ত আশা ক'রে থাকবো আবার দেখা হবে ব'লে, এমনকি ছোটোখাটো প্ল্যানও করবো সেজন্য, তারপর তুমি বদলি হ'য়ে যাবে ম্যানিলা কি ফিলাডেলফিয়ায়, হয়তো অবশেষে কোনো দূর উত্তর-দেশেই বাসা বাঁধবে—তখন আর দেখা হবে না। আর এই পতনের রেখা আরম্ভ হবে কাল থেকেই। কাল থেকেই আবার সাধারণ—আমার নিতান্ত গতানুগতিক অস্তিত্ব।—কিন্তু কী এসে যায়, যদি এর পরে আমাকে বাঁচতে হয় অতি সাধারণ একজন মানুষ হ'য়ে, স্ত্রী নিয়ে, সন্তান নিয়ে, চাকরি নিয়ে—বরং তা-ই তো ভালো; আমি যাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় তাদের আমি কাজে লাগতে পারবো, যে-সব ছোটোখাটো কাজে আমার কিছুটা দক্ষতা আছে তা-ই করবো মন দিয়ে—মেনে নেবো আমি সাধারণ, অসংখ্যের মধ্যে একজন মাত্র, আর সেই ধূসর নিয়মের খাঁজে ঘুরতে-ঘুরতে, প্রতিবাদ-হীন বাধ্যতার বোঝা ব'য়ে-ব'য়ে, হয়তো শেষ পর্যন্ত এটুকু সান্ত্বনা খুঁজে পাবো যে অমনি ক'রেই আমি তোমার ভালোবাসার মূল্য দিয়ে যাচ্ছি। আর তারপর যখন সেই দিন আসবে যখন আমাকে দিয়ে কারো কোনো প্রয়োজনও আর থাকবে না, যখন বার্ধক্য আমাকে মৃদু হাতে সরিয়ে দেবে জীবন থেকে, সব মানুষ অচেনা হ'য়ে যাবে, সব কথা অর্থহীন—হয়তো তখনও, কোনো মেঘলা সন্ধ্যায়, বা কোনো গ্রীষ্মের ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে বাইরের দিকে তাকিয়ে, আমার

মনে ফিরে আসবে আজকের এই রাত্রি, কুয়াশা আর জোছনায় মাখা সেই পথ—আমার পাশে তুমি; পাশে তুমি নেই, কোথাও তুমি নেই তবু আছো আমার বুকের মধ্যে, রক্তের স্রোতে—ঠিক এই মুহূর্তের অনুভূতি আবার হয়তো কাঁপিয়ে দিয়ে যাবে আমাকে। মনে-মনে বলবো, 'আশ্চর্য! এখনো ভুলিনি!' আবার বলবো, 'এর বেশি আর কী চাইবার থাকতে পারে মানুষের?'